আবু সাঈদ তুলু

ঐতিহ্যায়ন

নির্বাচিত প্রবন্ধাবলি

হাজার বছরের গৌরবান্বিত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী হবার পরও 'বাংলাদেশ' এর অধিকাংশ মানুষই ভিনদেশি রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণে ব্যাপ্ত। দীর্ঘ দুশো বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশের আগ্রাসনে এদেশের মানুষ হয়ে উঠেছে আত্মপরিচয়হীন এবং পরমুখাপেক্ষী। বর্হিবিশ্ব অনেক এগিয়ে গেলেও এদেশ এখনো নিম্ন-অনুন্নত। উন্নত করার প্রচেষ্টায় শুধু অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে মনোযোগ দিলে হবে না। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ঐতিহ্যবাহী চেতনায় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক মানস কাঠামোর বিকাশ। আবু সাঈদ তুলু একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা ও নানা আঙ্গিকে লেখালেখি করে আসছেন। তিনি আবহমান বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বৈশ্বিক মূল্যবোধের নান্দনিক জাগরণে অক্লান্ত পরিশ্রমী। দেশি-বিদেশি নানা পত্রিকা-জার্নালে প্রকাশিত আবু সাঈদ তুলুর ঐতিহ্যভিত্তিক প্রবন্ধগুলোর মধ্য থেকে নির্বাচিত ১০টি প্রবন্ধ নিয়ে এ 'ঐতিহ্যায়ন' গ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুধাবনে সাহায্য করবে।

আবু সাঈদ তুলু

ঐ তি হ্যা য় ন

নির্বাচিত প্রবন্ধাবলি

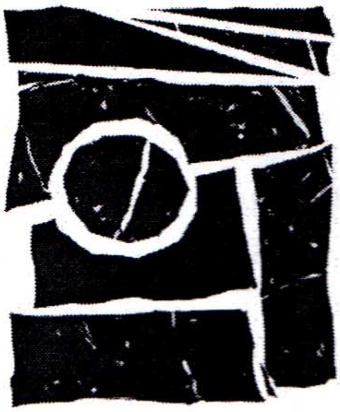

অয়ন
প্র কা শ ন

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
স্বত্ব : লেখক
প্রকাশক : মিঠু কবির
অয়ন প্রকাশন
১৬-১৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অফিস : ০২-২২৬৬৩৯৩৭২ মুঠোফোন : ০১৮১৮-০০৫২১৯
হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৯৭-৮০০৫২১৯
e-mail: ayanprokashhan@gmail.com
web: www.rokomari.com/ayanprokashhan
প্রচ্ছদের পেইন্টিং : শিল্পী মাহাদী হাসান
বর্ণবিন্যাস : অয়ন কম্পিউটার্স
পরিবেশক : *উত্তরণ* বাংলাবাজার ঢাকা
পাঠক সমাবেশ, প্রথমা, তক্ষশিলা
আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট শাহবাগ ঢাকা
প্রকৃতি কনকর্ড অ্যাম্পোরিয়াম কাটাবন ঢাকা
এটিএন মেগা স্টোর ২৯৭৬ ডানফোর্থ এভিন্যু, টরেন্টো, On M4c 1M6, কানাডা
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com **ফোন :** ১৬২৯৭
মুদ্রণ : *মা কালার প্রিন্টার্স* শিরিশ দাস লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৫০০ টাকা

ISBN-978-984-3912-28-2

Oitijjayon
by **Abu Sayed Tulu**
Published by **Ayan Prakashan**
16-17 Banglabazar, Dhaka-1100
Office : 02-226639372 **Mbl :** 01818005219
WhatsApp : 0197-8005219
e-mail: ayanprokashhan@gmail.com
web: www.rokomari.com/ayanprokashhan
Price: Tk. 500
US $ 10

উৎসর্গ

আলহাজ আব্দুর রহমান মাস্টার

ও

সারা বেগম

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা,
যারা আমাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন

ঐতিহ্যায়ন

আবু সাঈদ তুলু

বাংলা সাহিত্যরীতি : অদ্বৈত মার্গ নন্দন ০৯
বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি ২৮
কবিতার পাঠক, পাঠকের কবিতা ৪২
'রসুলবিজয়' কাব্য : অন্তরালে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস ৫০
বাংলা নাট্য : তত্ত্ব ও রীতি ৬১
বাংলার নাট্য ঐতিহ্য ৭০
উত্তরাধুনিক নাট্যতত্ত্বের পূর্বাপর ৭৯
পালা—বাংলার ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব নাট্য ১০২
ঐতিহ্যের ধারায় বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ১১৪
নাট্য সমালোচনার কথকতা ১২৬
বাংলা নাট্য পরিভাষার ভাঙাগড়া ১৪৪
বাংলা বর্ণমালা কীভাবে এলো ১৫১
প্রযুক্তির যুগে সাহিত্য ১৬৫
বিউপনিবেশায়ন : বাঙালির ভয়টা কোথায়? ১৭১
শিল্প-সাহিত্যে নন্দনভাবনা ও নৈতিকতা ১৮৫

বাংলা সাহিত্যরীতি : অদ্বৈত মার্গ নন্দন

সারসংক্ষেপ

[বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় রীতি দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিকতা কিংবা উত্তরাধুনিকতার দোহাইয়ে বাঙালির নিজস্ব বোধ-বুদ্ধি, ইতিহাস-ঐতিহ্য এতে উপেক্ষিত। এমনকি নব্য উপনিবেশের করণ-কৌশলে বাঙালি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আত্মপরিচয় দৃষ্ট হয় এমন কোনো সাহিত্যকর্ম নেই। অধিকাংশ সাহিত্যকর্মই সস্তা চটুল ও ঠুনকো আত্মপ্রচারে ব্যাপ্ত। আঙ্গিক সর্বস্ব দর্শনহীন বাতুলতা সর্বত্র। ঐতিহ্যের চর্যাপদ, ইউসুফ-জোলেখা, রসুলবিজয়, মনসামঙ্গল কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে যেমন বাঙালির রচনা বলে চিহ্নিত করা যায়। ঠিক তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর পর দু-একটা সাহিত্যকর্ম ছাড়া আর তেমনটা চিহ্নিত করা যায় না। আর সাম্প্রতিক সাহিত্যে বাঙালি মানস বা বাঙালির সাহিত্য চিহ্নিত করা তো ভীষণ কঠিন। এ গবেষণাটি বাঙালির হাজার বছরের সাহিত্যের রূপ-রীতির স্বরূপ অনুসন্ধানের গবেষণা। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যাদর্শে অখণ্ড ভাবগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেলেও প্রকাশ-আঙ্গিকে বহুমাত্রিক নানা রূপ-বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ঐতিহ্যবাহী বাংলা সাহিত্যধারায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে সমাজ-মানুষের জন্য নিবেদন। আবহমান কালের বহমান সাহিত্যরীতিকে উপলব্ধি করেই নিজস্ব অনুভব, বোধ-বুদ্ধির চর্চাই জাতিগত আত্মপরিচয় সৃষ্টি করতে পারে।]

বাঙালি গৌরবান্বিত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। সমুদ্র উপকূলবর্তী নদীমাতৃক অঞ্চল হওয়ার কারণে প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ছিল স্বতন্ত্র।[১] এ বাংলার জনমানুষকে, বাংলার সংস্কৃতিকে পশ্চিম ভারতের শাস্ত্রীয় রীতিও স্পর্শ বা প্রভাবিত করতে পারেনি।[২] বাংলায় ছিল গীতপ্রবণ লাস্য নমনীয় মানসিক

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, *পৃষ্ঠা-৪০০*

[২] গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা, ২০৬, পৃষ্ঠা-৫০৩

প্রবণতা। শূন্যতত্ত্ব, অলংকার, ন্যায়শাস্ত্র, সাংখ্যদর্শন, হস্তিবিদ্যা, জাহাজবিদ্যাসহ নানা মৌলিক জ্ঞানপ্রযুক্তির অধিকারী ছিল প্রাচীন বাঙালি। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসন এ অঞ্চলের ইতিহাসকে করেছে অবলুপ্ত। ঐতিহ্যবাহী বাংলার সাহিত্যদর্শনের যে মূল্যবোধ তা ছেদ-বিচ্ছেদ হয়ে পড়েছে উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে উপনিবেশ শাসনের শুরুতেই। প্রাচীন কালেই গৌড়-বঙ্গ অঞ্চলকেন্দ্রিক ব্যাপক সাহিত্যচর্চার পরিচয় পাওয়া গেলেও প্রচলিত ইতিহাসে তা অনুল্লেখ। প্রাচীন গৌড় অঞ্চল বোঝাত প্রাচীন বঙ্গ-গৌড়-পুণ্ড্র অঞ্চল। পরবর্তী সময়ে অখণ্ড বঙ্গের বিকাশ ঘটে। বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা হয় স্বাধীন সুলতানি আমলে। প্রাচীন গৌড়-বঙ্গ বলতে আজকের বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া, সোনারগাঁ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি নানা অঞ্চল এবং পশ্চিম বাংলার পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ ও বিহারের কিছু অংশকে বোঝায়। গৌড় থেকে বঙ্গ সাহিত্য ধারার মধ্যে যে সাহিত্যরীতি তা-ই আবহমান বাংলা অঞ্চলের স্বতন্ত্র সাহিত্যরীতি। গৌড়ীয়-বঙ্গীয় সাহিত্যরীতি এককথায় এ বাংলা ভূখণ্ডের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যাদর্শের একটি রূপ। যা ব্রিটিশ উপনিবেশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জনমানসে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু উপনিবেশ শাসন কলকাতায় রাজধানী স্থাপন, তাদের সৃষ্টি আধিপত্য ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বে এসব তথ্য বিলুপ্ত। এমনকি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহ্যবাহী বঙ্গ-গৌড়-পুণ্ড্র-সোনারগাঁর সভ্যতাকে পুরো বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার সাহিত্যচর্চার রূপ-রীতি অনুধাবন করতে হলে স্থান-কাল ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা দরকার। সম্প্রতি অনেক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ ভারতের সম্প্রসারিত অংশ নয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে মানুষের বসতি ছিল। পশ্চিম ভারতের লোকেরা এ ভূখণ্ডে কখনো স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। সে জন্য সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এ অঞ্চলের মানুষদের 'অসুর', 'দাস্য', 'পক্ষী', 'নিষাদ', 'অনার্য' বলে নিন্দা করা হতো। বঙ্গ শব্দটি মূলত 'বং' বা 'বঙ' গোষ্ঠীর নাম। এ 'বং' জাতিগোষ্ঠী কেমন ছিল তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। ঐতিরেকের 'আরণ্যক' গ্রন্থে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ নামের পরিচয়ের মধ্যই স্বতন্ত্র 'বঙ্গ' ভূসমাজ দৃষ্ট হয়। আবুল ফজলের মতে, 'বং' গোষ্ঠীর নামের 'আইল' বসে বঙ্গাল, বাঙ্গালা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'র ২২তম অধ্যায়ে (২১, ২২) বলা হয়েছে 'অসুরাণাং ভবেদ বাচা গৌড়পৌণ্ড্রোদ্ভবা

সদা'। অর্থাৎ গৌড় ও পুণ্ড্রের অধিবাসীরা 'অসুর ভাষাভাষী'। গ্রন্থে বঙ্গের ভাষাকে পূর্বী ভাষা বলা হয়েছে। সমতট ও হরিকেলের ভাষাকে ড়-কার বহুল ও অস্পষ্ট বলেছেন। বাংলা ভাষাকে একসময় গৌড়ীয় ভাষাও বলা হতো।[৩] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, এ গৌড়ী-প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব। প্রাচীন গৌড়ে প্রাকৃত-পালি-বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চাও হতো। ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বখতিয়ার খলজি গৌড় দখল করলে ধীরে ধীরে এ অঞ্চল দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুতমিশ বাংলাকে দিল্লির একটি প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে তা সফল হয়নি। ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলা প্রদেশকে তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। ভাগগুলো হলো—সোনারগাঁ (পূর্ব বাংলা), গৌড় (উত্তর বাংলা), সাতগাঁও (দক্ষিণ বাংলা)। কিন্তু তা-ও টেকেনি। ১৩৩৮ সালে এই তিন অঞ্চলে স্বাধীন সুলতানের উত্থান ঘটে। সোনারগাঁ অঞ্চলে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ, গৌড়ে আলাউদ্দিন আলী শাহ এবং সাতগাঁওয়ে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। এই স্বাধীন সুলতানি আমলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়, যা ইতিহাসে বিরল। এর ধারাবাহিকতা বজায় ছিল মোগল আমলেও। এমনই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশ লাভ করে।

অখণ্ড বাংলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭)।[৪] তিনি প্রাচীন জনপদ *গৌড়, বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট* একত্র করে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। 'বাঙালি' শব্দটি তৈরি হয়েছে তার থেকে। এ সময় থেকেই বৃহত্তর গৌড়-বঙ্গের সাহিত্যচর্চার ব্যাপক গতি বৃদ্ধি পায়। বাংলা ভাষাই গৌড়ের দরবারে প্রধান ভাষা হয়ে ওঠে।[৫] পালি-প্রাকৃত-সংস্কৃত ভাষা থেকে বের হয়ে বাংলা ভাষা পুরো বিকশিত হয়ে ওঠে এবং বাংলাই সাহিত্যচর্চার প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। বৃহত্তর গৌড় সুলতানদের পৃষ্ঠাপোষকতায় যেভাবে সাহিত্যচর্চা হয়েছে, তা ইতিহাসে খুব দেখা যায় না।

---

[৩] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, মাওলা সংস্করণ-১৯৯৮, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩১

[৪] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৯৯

[৫] ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯৯

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেছেন ‘ইউসুফ-জোলেখা’। কৃত্তিবাস বাংলায় ‘রামায়ণ’ অনুবাদ করেছেন জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহর আনুকূল্যে। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় লেখার কারণে গৌড়েশ্বর তাকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহর অনুগ্রহে জৈনুদ্দিন ‘রসুলবিজয়’ কাব্য রচনা করেন। গৌড়েশ্বর শেখ সুলতান জালালুদ্দিন ফৎহ-ই-শাহর (১৪৮১-১৪৮৭) তত্ত্বাবধানে ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ধ্রুবানন্দ মিশ্র রচনা করেন ‘মহাবংশাবলী’। এ গ্রন্থে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা সাহিত্য সাধনা সে সময় সামাজিক স্তরেও বিদ্যমান ছিল। ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালের ফুল্লশী গ্রামের কবি বিজয় গুপ্তের ‘মনসাবিজয়’ গ্রন্থের মুখবন্ধে আলাউদ্দীন হোসেন শাহর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। তার পৃষ্ঠপোষকতার কথা আছে। বাংলায় ‘ব্রজবুলি ভাষা’ নামের যে শব্দটা দেখি তা আলাউদ্দীন হোসেন শাহর তত্ত্বাবধানেই হয়েছে। শ্রীধরের ‘বিদ্যাসুন্দর কাহিনি’ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর আমলে রচিত। শ্রীখণ্ডের ‘কবিরঞ্জন’ উপাধিপ্রাপ্ত বিদ্যাপতি নসরৎ শাহর কর্মচারী ছিলেন। শের শাহ ও তদ্বংশীয়দের দ্বারা আনুকূল্য পেয়েছিল তা হচ্ছে—মুক্তারাম সেনের ‘সারদামঙ্গল’ (১৫৪৭), রামচন্দ্র খানের ‘অশ্বমেধ পর্ব’ (১৫৫০), জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ (১৫৭০), রঘুনাথ পণ্ডিতের ‘কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী’ (১৫৭০), মাধবাচার্যের ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’, ‘গঙ্গামঙ্গল’, ‘চণ্ডীমঙ্গল’ (১৫৭০ দিকে), বংশীদাসের ‘মনসা মঙ্গল’ (১৫৭৫), চন্দ্রাবতীর ‘মনসা মঙ্গল’ (১৫৭৫) প্রভৃতি। আলাউদ্দীন হোসেন শাহর রাজবংশের রাজত্বকালে সাহিত্যচর্চার আরেক কেন্দ্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। তা হলো নবদ্বীপের হিন্দু পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক। পণ্ডিত রঘুনন্দ, নৈয়ানিক রঘুনাথ শিরোমণি রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতৃত্ব দেন। শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তরের ‘তজরিহ ই ঔলিয়া’ ও মসনবী শরীফ যেমন চর্চিত হয়েছে, তেমসি রঘুবংশ, চৈতন্য ভাগবত (১৫৭৫), চৈতন্য চরিতামৃত (১৫৮৫)ও রচিত হয়েছে। জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ কাব্যের একটি শ্লোক তাৎপর্যপূর্ণ—

> ‘মসনবি আবৃত্তি করে থাকে নলবনে
> মহাপাপী জগাই মাধাই দুই জনে।’[৬]

---

[৬] উদ্ধৃত, ডক্টর এনামুল হকসহ নানাজনের গ্রন্থে এ তথ্যটি আছে; জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ কাব্যটি বাংলাদেশে দুর্লভ

প্রচলিত সাহিত্য ইতিহাসে বলা হয়ে থাকে বাংলা সাহিত্যে গদ্য ইউরোপীয়দের দান। কিন্তু গৌড়ী সাহিত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রথমত রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্যপুরাণ-এ গদ্য লক্ষ করা যায়। যা আধুনিক গদ্যের চেয়েও সাহিত্য মানে কোনো অংশে কম নয়। সে সময় সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত 'চম্পু' নামে এক কাব্যরীতি বিদ্যমান ছিল। শূন্যপুরাণেও তা-ই। এটি বাংলা ভাষায় রচিত ধর্মপূজা-বিষয়ক গ্রন্থ। কিন্তু কাব্যগুণে গ্রন্থটি অনবদ্য। গদ্যে-পদ্যে রচিত এ গ্রন্থে বিভিন্ন রাগ ও ছন্দে ধর্মীয় নানা বিষয় বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের উপস্থাপনভাগে পদ্য যেমন আছে, তেমনি আছে গদ্য। শূন্যপুরাণের অথ বারমাসি অংশে গদ্যে বর্ণনা এ রকম—

> কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মান রাসি। হে কালিন্দিজল
> বার তাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি।
> সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কন্নি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দান-
> পতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি। সন্ন্যসী গতি জাইতি গাএন বাএন
> দুআরি দুআরপাল তাণ্ডবী তাণ্ডরীপাল রাজদূর কোমি কোটাল
> পরে সুখ মুকতি এহি দেউলে পডিব ঝঅজঅকরি।[৭]

গদ্যেই বর্ণনা থাকুক কিংবা পদ্যেই থাকুক সে সময়ের সাহিত্যচর্চায় কাব্যিকতা বা কাব্যিকবোধ ছিল প্রধান। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্যে গদ্য রচনা বা পদ্য রচনার আঙ্গিক বিষয় মুখ্য নয়। দার্শনিকতাই মুখ্য। এ শূন্যপুরাণে গ্রন্থাকারের পরিচয় থেকে শুরু করে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বিভাজন করে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনা পাওয়া যায় এভাবে :

> —সুখ মুক্তি এহি দেউলে পডিব জএ জএ কার দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস—
> বার মাসে বার ফুল হইল সমতুল
> পাদুকা স্থাপিত হোইল ধর্ম্মর ফুল।
> বার আদিত্ত বার ভাই
> ধর্ম্ম দেবতার লাগ নাই পাই।[৮]

---

[৭] রামাই পণ্ডিত 'শূন্যপুরাণ' সম্পাদনায় শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৯

[৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩

আঠারো শতকে উপনিবেশ সহযোগী খ্রিষ্টান ধর্মযাজক উইলিয়াম কেরির বাংলা গদ্যের চেয়ে কয়েক শ বছর পূর্বেই শূন্যপুরাণের গদ্য ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। 'সেক শুভোদয়া' সংস্কৃত গদ্যে রচিত হলেও বাঙালির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পাণ্ডুয়ার অর্থাৎ গৌড় থেকে বারো মাইল দূরে শেখ জালালুদ্দীন তবরেজীর (মৃত্যু. ১২২৫) দরগাহে প্রাপ্ত পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের ভণিতাযুক্ত 'সেক শুভোদয়া' পাওয়া যায়। এটিও গদ্যে-পদ্যে রচিত। প্রসঙ্গত কারণে এখানে গ্রন্থের ভাষাভঙ্গির নমুনা উল্লেখ করা হলো—

ততো মন্ত্রিণমাহ রাজা—

'কিং বৃথা ভাষসে মূঢ় প্রভুতত্ত্বং ন জানতঃ।
দুর্ব্বেশশবেশমাস্থায় সাক্ষাদিন্দ্র ইহাগতঃ।।

ততো রাজা সর্ব্ববৃত্তান্তং মন্ত্রিণং কথিতবান। তদুক্তং মন্ত্রী নাভিনন্দতি।

'শৃণু রাজন্, দুর্জ্জনে সহালাপয়িতুং ন যুক্তয়তে। সব্বাং মায়ায় কৃত্বা সমায়াতঃ। যথেষ্টং গচ্ছেতু। রাজা মন্ত্রিণা সহালাপং কুর্ব্বন্নবতিষ্ঠতে। সেকোহপি পথি গচ্ছন, গাঙ্গোনটবধূ বিদ্যুৎপ্রভানাম তয়া সহ পথি সমদর্শয়ং। কুঞ্চুকং পরিধায় স্বর্ণকলসং কটিমাস্থার সমায়াতে, তামপি দৃষ্ট। তামব্রবীৎ—

'নির্বর্ত্তস্বাবলে পাপে শূন্যকুম্ভকটিস্থিতে।
আত্মনো ভদ্রতামিচ্ছেঃ গচ্ছ পাপে পুনর্গর্তম।।[৯]

কখনো কাব্য, কখনো গদ্য, কখনো বর্ণনা, কখনো সংলাপ—সবকিছুর অদ্বৈত সম্মেলনে 'সেক শুভোদয়া' কাব্যের আঙ্গিক গঠন। বাংলা অঞ্চলে সাহিত্যচর্চায় বহুমুখী বৈচিত্র্যই লক্ষ করা যায়।

কাশ্মীরি কবি সোমদেবের 'কথাসরিৎসার' রূপকথা-লোককথা গল্পের সংকলন। এটি প্রাকৃত ভাষায় লেখা। এর কিছু অংশ গদ্যে, কিছু অংশ পদ্যে বর্ণিত। কথাসরিৎসাগরের আঙ্গিক ছিল লম্বক ও তরঙ্গ বিভাজন করে। গৌড়ীয় সাহিত্যচর্চায় বিষয়বস্তু বিবেচনায় 'গাথা সপ্তশতী' বিষয় ও আঙ্গিকগত জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি সাহিত্যকর্ম। শৃঙ্গারবিষয়ক

---

[৯] হলায়ুধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া' সম্পাদনা : ড. সুকুমার সেন, আরএন সিল, কলকাতা, ১৩৩৪, পৃষ্ঠা-৪-৫

তত্ত্বকোষের গাথাজাতীয় রচনা এটি। এর ভাষা প্রাকৃত। বাংলা অঞ্চলের হাল বা শালবাহন নামে কোনো এক রাজা একটি রচনা করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি শ্রীধরদাস যে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' রচনা করেছিলেন তার প্রকাশ ও উপস্থাপন রীতিও বৈচিত্র্যময়। বিষয়কে 'প্রবাহ' নামে পাঁচটি ভাগ করেছেন। প্রতিটি প্রবাহে আবার অনেকগুলো তরঙ্গ বা বীচিতে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন অমরপ্রবাহ, শৃঙ্গারপ্রবাহ, চাতুপ্রবাহ, অপদেশপ্রবাহ, উচ্চবাচপ্রবাহ ইত্যাদি। এগুলো দার্শনিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে বিভাজিত। সে শতাব্দীতে 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' গাথা সপ্তশতীর চেয়েও প্রভাবদায়ী সাহিত্যকর্ম হিসেবে চিহ্নিত ছিল। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' সংকলন-জাতীয় রচনা। আজকে যুগে আমরা যেমন সাহিত্য সংকলন করে থাকি তেমন সংকলন। তৎকালে প্রাকৃত ভাষাই অনেকাংশে বাংলা ভাষা। তবে গৌড়ীয় নদীয়ায় যে সাহিত্যচর্চা হয়েছে তার তত্ত্বীয় গ্রন্থগুলো সংস্কৃতে। এ সম্ভবত ব্রাহ্মণবাদী লক্ষ্মণ সেনের সভায় সংস্কৃত ভাষাকেন্দ্রিক চর্চার প্রাধান্য বিস্তারের ফল। নদীয়াকেন্দ্রিক সংস্কৃত ধারার চর্চা হলেও পূর্ব বাংলার বগুড়া, রাজশাহী, সোনারগাঁ, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাহিত্যচর্চা ছিল বাংলা ভাষায়। বর্তমানে রাজশাহী জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে সুলতান মাহমুদ শাহর রাজত্বকালে ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শিলালিপি। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলা অক্ষরের চর্চাও সে সময় হয়েছে।

'চর্যাপদ' বঙ্গ অঞ্চলের মানুষ-সমাজ ও সভ্যতা, সাধনা-মননের বহিঃপ্রকাশ। বৌদ্ধ নির্বাণ পদ্ধতির রূপক মার্গপথকে নির্দেশ করলেও নদী, নৌকা, খেয়াঘাট, পাটনী প্রভৃতি বাংলার নদীমাতৃক জীবনবোধকে তুলে ধরে। ১৯২৬ সালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লন্ডনে গবেষণায় 'চর্যাপদ'কে তুলে ধরলেন বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য নিদর্শন হিসেবে। কিন্তু চর্যাপদই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন কি না, তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি। যা হোক, চর্যাপদের পরবর্তী সময়ে পয়ার ও নাচাড়ি ছন্দে লেখা হতো। এ চর্যাগুলো সাধন-ভজন জাতীয় নির্বাণবাদী মানবমুক্তিকামী তত্ত্ব হলেও এটি 'রস'জারিত করে। বাকনির্মিতির অপূর্ব কৌশলে জীবন-জগতের নতুন এক উপলব্ধিতে নিয়ে যায়। এখানে গানের আলেখ্যে ভাবদর্শনের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। এটি একদিকে সাধন ভজনতত্ত্ব, অন্যদিকে গান। রূপক-উপমা-

প্রতীক জীবন-সমাজ ও হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা হৃদয়বেদ্য অনুভবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে—

নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছোইছোই যাই সো বাহ্ম নাড়িআ।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।।[১০]

কিংবা,

উষ্ণা উষ্ণা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহারী।
তোহেরী ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী।।[১১]

পঙ্‌ক্তিগুলোর মধ্যে জীবনের জটিলতা, জীবনের অনুভূতির অনবদ্য শৈল্পিক প্রকাশ। প্রান্তিক জীবন, প্রেম, হতাশা মানবপ্রকৃতির আনন্দ-বেদনা অনবদ্যরূপে চিত্রায়িত। প্রতীকী ব্যঞ্জনায় যা-ই বোঝানো হোক না কেন চিত্রকল্পে মানবজীবনই প্রধান হয়ে উঠেছে। নগরের বাইরে কুঁড়েঘরে ডোম্বী বসবাস করে। ডোম্বী মাঝে মাঝে এসে সাধকের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। ডোম্বী আসো, আমি তোমাকে বিয়ে করব। যদি না আসো তবে বসনহীন উদাম কাপালিক হয়ে যাব। কিংবা, উঁচা উঁচা পর্বত এলাকায় শবরী বালিকা বাস করে। সে পরিধান করে ময়ূরের পালক এবং তার গলায় গুঞ্জার মালা। উন্মুক্ত শবর, পাগল শবর, দোহাই তোমার, তুমি গোলমাল কোরো না। তোমার আপন গৃহিণীই তোমার সহজ সুন্দরী। ওপরের পঙ্‌ক্তিগুলোর মধ্যে দেখা যায় মানবমনের চিরন্তন প্রেমানুভূতি চিত্রিত। ছন্দ, অলংকার, ভাব ও ভাষায় পাঠকের হৃদয়কে ব্যাকুল না করে পারে না। জীবনের গভীরতর অনবদ্য সৌন্দর্য এখানে ফুটে উঠেছে। স্বতঃস্ফূর্ত এক মানবিক আবেদন তৈরি হয়েছে। সাহিত্যের সমস্ত উপকরণই এতে লভ্য। এ চর্যাপদগুলো বিশ্লেষণে সাহিত্যরীতি হিসেবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চর্যাপদ গূঢ়তত্ত্বের হলেও কাব্য বৈশিষ্ট্যের দিক

---

[১০] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২৩, পৃষ্ঠা-৬৯

[১১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৭

থেকে তা রসপ্রধান। এটি রূপক-সাংকেতিক ব্যঞ্জনাধৃত। নির্বাণ সাধনার ভাব-চিন্তন অনবদ্য প্রতীক, উপমা, অলংকার, ছন্দের পরিমিতিতে উপস্থাপিত। বাক্‌ভঙ্গি ও মানবীয় আবেগ স্পর্শে অনবদ্য।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর (১৩৮৯-১৪১০) রাজত্বকালে শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন 'ইউসুফ-জোলেখা'।[১২] 'ইউসুফ-জোলেখা' কাহিনিকাব্য রীতির ঢং কী? জোলেখার আত্মনিবেদন বংশের বর্ণনা—

পটমঞ্জরী রাগ-পরিতাল ছন্দ
আপনার মনুরথ কহিতে লাগিলা জথ
শুনহ ইছুফ মহাসত্য।
মোর জথ বিবরণ সব আছে সোঙরণ
তোক্ষার চরণে ভাল মত।
মুঞি বড় ভাগ্যহীন নাহিক ভুবনে তিন
কথা মোর জন্ম নিজ দেশ।[১৩]

মানবীয় আখ্যান হিসেবেও 'ইউসুফ-জোলেখা' অনন্য। পরিবেশনা আঙ্গিকের মতো বন্দনা, বর্ণনা, রাজপ্রশস্তি, পুস্তক রচনার কারণসহ শিরোনামভুক্ত করে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় এক মানব-মানবীয় প্রেম প্রতীকে রেখে পৃথিবীর তাবৎ প্রেমসত্যকে উপস্থাপন করেছেন। তাত্ত্বিক ভাবনায় ইউসুফ-জোলেখা আত্মা-পরমাত্মার প্রতীক। আত্মা-পরমাত্মার জাগতিক লীলা। রাগ ও ছন্দে অনেকাংশেই গীতোপযোগী। মধ্যযুগে পুতুলনাট্য হিসেবেও 'ইউসুফ-জোলেখা' পরিবেশিত হতো বলে তথ্য পাওয়া যায়। 'ইউসুফ-জোলেখা'র ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়েও অত্যন্ত সমৃদ্ধ বাংলা। মধ্যযুগে 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কৃত একটি পুথি ছাড়া আর কোনো পুথি পাওয়া যায়নি। কিন্তু ইউসুফ-জোলেখার অসংখ্য পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এমনকি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছেই তিনটি পুথি বা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। অথচ প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'ইউসুফ-জোলেখা'কে মূলস্রোত থেকে দূরে রাখা হয়েছে। এমনকি 'ইউসুফ-জোলেখা'কে আরাকানের রোমান্টিক

---

[১২] শাহ মুহম্মদ সগীর, ইউসুফ জোলেখা, সম্পাদনা : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২২

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৮

প্রণয়োপাখ্যান ধারায় ফেলে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগীর সম্ভবত গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর সভাকবি ছিলেন এবং তারই আনুকূল্যে 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি রচনা করেছেন।[১৪] আর আজম শাহ ছিলেন গৌড়াধিপতি। অতএব আজম শাহর সভাকবি হিসেবে নিশ্চয় শাহ মুহম্মদ সগীর আরাকানে থাকতেন না। মধ্যযুগের মুসলমানদের যেকোনো সাহিত্যকর্মকেই আরাকানি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারায় ফেলে তুচ্ছ করার প্রবণতা সর্বত্র।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি শৃঙ্গার রসকে প্রধান করে এর আঙ্গিক গঠন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস গ্রামীণ স্থূল প্রেমের প্রতীকী আত্ম-পরমাত্মার লীলা উপস্থাপন করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি গীতিরস ধারার। কেউ কেউ এ কাব্যটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কিংবা নাটগীত বলেও অভিহিত করেছেন।[১৫] কাব্যিক লাবণ্য ও ভাষার তীক্ষ্ণতায় অনবদ্য এ কাব্য। সমৃদ্ধ সংলাপেও অনন্য। এর রচনারীতি গীতি-নাট্য-কাব্যের মতো। সংস্কৃতি গীতগোবিন্দর মতোই এর বাক্‌চাতুর্য। বর্ণনাকৌশল, অলংকার সন্নিবেশ, শব্দযোজনাসহ উপমা-অলংকার, প্রবাদ-প্রবচনসহ সাহিত্যগুণে অনবদ্য। অনেকে এ কাব্যকে গ্রাম্য স্থূল প্রেম বললেও কাব্যগুণে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অনন্য। *কাব্যে চরিত্রের অনুভূতিগুলো পাঠকের হৃদয়ের অতলকে স্পর্শ না করে পারে না—*

> কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
> কে না বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে
> আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
> বাশীর শবদে মো আউলাইলো রান্ধন।[১৬]

কাব্যের সর্বত্রই শৃঙ্গার রসের ধারায় উপমা, রূপক ও অলংকারের অনন্য বাক্‌ভঙ্গি। মানুষের হৃদয়বেদ্য আবেগ-অনুভূতিই এ কাব্যকে মহত্তর করে তুলেছে। বিয়োগান্ত আবেগিক মাধুর্যের মধ্য দিয়ে কাব্যটির অন্তরকাঠামো গতিশীল।

---

[১৪] বাংলা পিডিয়া, শাহ মুহম্মদ সগীর অন্তর্ভুক্তি, এশিয়াটিক সোসাইটি

[১৫] বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, সংকলন ও সম্পাদনা : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-৫২

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮০

কবি জৈনুদ্দিন গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহর (১৪৭৪-১৪৮১) সভাকবি ছিলেন। তার রচিত কাব্য 'রসুলবিজয়'। এ কাব্যটি মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। কাব্যটি কাহিনিকাব্য শ্রেণির। ইসলামের শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইরাক অধিপতির মধ্যকার দীর্ঘ যুদ্ধের বর্ণনা এতে আছে। কাব্যে মুহাম্মদ (সা.)-এর উপদেশ ও বাণী এবং যুদ্ধের নানা বর্ণনায় নবীর শৌর্যবীর্য ও ইসলামের মহত্তগাথা আছে। মধ্যযুগে 'রসুলবিজয়' কাব্যটি এতই জনপ্রিয় ছিল যে সবাই বিশ্বাস করত, 'রসুলবিজয়' মুসলমানদের ও 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' হিন্দুদের ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করে। গৌড় যুগেই হিন্দু-মুসলিম বৈচিত্র্যমুখী—চণ্ডীদাস, শ্রীকর নন্দী, শেখ কবির, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, মুজম্মিল, কবি মুহম্মদ মুকীম, সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান প্রমুখের রচনা পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্য সাহিত্যধারাটি সম্পূর্ণ পূর্ববঙ্গের সাহিত্যধারা।[১৭] *মঙ্গলকাব্য* ধারার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মনসামঙ্গল। এ কাব্য ধারাটির মধ্যে ধর্ম বিদ্যমান থাকলেও এ ধারাটি সম্পূর্ণ মানবীয় আখ্যান ধারা। অনেকেই মঙ্গলকাব্যকে বাংলার মহাকাব্য হিসেবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী ছিলেন। বন-জঙ্গলে ঘেরা এ বাঙলা অঞ্চলের মানুষ সাপের দেবী মনসা-র দংশন থেকে রক্ষা পাওয়ার কৃত্যই এ মনসামঙ্গল। মনসামঙ্গল নানা নামেও পরিচিত। যেমন—'মনসার গীত', 'পদ্মার নাচন', 'রয়ানী গান', 'পদ্মপুরাণ', 'বেহুলার নাচাড়ি', 'ভাসান যাত্রা', 'কান্দনী বিষহরির পালা' ইত্যাদি। এগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে মানবীয় জীবন সংকট। কানা হরিদত্তকে আদি কবি বা পালাকার ধরা হলেও বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ (১৪৯৪ খ্রি.) অত্যন্ত জনপ্রিয়। মাঙ্গলিক সাহিত্যগুলো অধিকাংশই পাঁচালি আঙ্গিকে পরিবেশিত হতো। এ পরিবেশনা ছিল রসপ্রধান। পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসাবিজয়'-এর অসম্ভব জনপ্রিয়তার তথ্য পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের প্রথমাব্দে নারায়ণ দেব 'পদ্মপুরাণ' এবং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কেতকা দাস ক্ষেমানন্দর 'মনসামঙ্গল'-এর জনপ্রিয়তার তথ্য পাওয়া যায়। 'বাইশ কবি মনসা' নামেও বাইশ জন কবির সংকলিত মনসামঙ্গল কাব্যের অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল উল্লেখ পাওয়া যায়। রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' এ

[১৭] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা বুক হাউজ, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃষ্ঠা-১৫০

মঞ্চস্থাপত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আবর্তিত ছিল ভাব-রসকে ঘিরে। গদ্য-গদ্য বিভেদ ছিল না। পাঁচালি এবং পালা ছিল মূলরীতি। এগুলোই বাংলার মহাকাব্য।* প্রাচীন বাংলায় ধর্মচর্চার বাইরে নির্মোহ সংস্কৃতি ছিল—পালা, কেচ্ছা প্রভৃতি। দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেন 'মালঞ্চমালা' আখ্যান সবচেয়ে প্রাচীন।[১৮] পালাগুলোতে প্রাচীন গ্রামবাংলার সমৃদ্ধ জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। 'মহুয়া', 'কাজল রেখা', 'মধুমালার কেচ্ছা', 'সখিসোনা', 'মালঞ্চকন্যার কেচ্ছা', 'শীত-বসন্ত', 'কাঞ্চনমালা', 'মালতী কুসুমমালা' বাঙলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের জনপ্রিয় শিল্প। পালাগুলোই বাংলা অঞ্চলের নিজস্ব নাট্য। পালাগুলোতে নারীর জীবন, প্রেম-ভালোবাসা, ব্যর্থতা-সার্থকতা, মানবিকতা, জীবনসংকট এমন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, যা অবিশ্বাস্য সত্য। ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, সমাজবাস্তবতা ও মানবিক মূল্যবোধের অপরূপ অদ্বৈত উদাহরণ।

উপরি-উক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, গৌড় বা বঙ্গ অঞ্চলের সাহিত্যরীতি বা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কেমন। যা দিয়ে আমরা আবহমান বাংলা সাহিত্যরীতির রূপরেখা চিহ্নিত করতে পারি। উপরি-উক্ত সাহিত্যগুলোর বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু, দার্শনিক ভিত্তি, আঙ্গিক কৌশল, কাব্যিক মাত্রাগুলো বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—ভাব-ভাষা, চিন্তন-মননশীলতা, অলংকার বৈচিত্র্য ও ছান্দসিক ব্যঞ্জনায় সাহিত্যগুণে অনন্য। প্রাচীন গৌড়ীরীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড়িয়েছিল নদীয়ার সংস্কৃত হিন্দু পণ্ডিতদের আলোচনায়। বিশেষত দণ্ডী, ভামহ, বামন, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখের তাত্ত্বিক চর্চায়। সাহিত্য মূল্যায়নে তারা আশ্রয় করেছিলেন তৎকালীন সংস্কৃত ধারার সাহিত্যগুলোকে। মধ্যযুগের মুসলমানদের সাহিত্যকর্মকে ইতিহাসে অবজ্ঞা করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা অঞ্চলে বাংলা ভাষায় প্রতিনিধিত্ব করলেও সাহিত্য ইতিহাসের মূলধারায় তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। নিচে কিছু সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মের নাম উল্লেখ করা হলো, যা ইতিহাসে প্রায় অনুল্লেখ। তার মধ্যে—সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) 'নবীবংশ', 'শব-ই-মেরাজ', 'রসুলবিজয়', 'ওফাৎ-ই-রসুল', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইবলিশনামা', 'জ্ঞানচৌতিশা', 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'মারফতী গান',

---

[১৮] দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত মৈয়মনসিংহ গীতিকা, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৩১৯

'পদাবলী'। শেখ পরান (১৫৫০-১৬১৫) 'নসীহৎনামা', 'নূরনামা'; হাজী মুহম্মদ (১৫৫০-১৬২০) 'নূর জমাল', 'সরৎনামা'; নসরুল্লাহ খাঁ (১৫৬০-১৬২৫) 'জঙ্গনামা', 'মুসার সোয়াল', 'শরীয়ৎনামা', 'হিদায়িতুল ইসলাম'; সৈয়দ মরতুজা (১৫৯০-১৬৬২) 'যোগ কালন্দর', 'পদাবলী'; সৈয়দ মুত্তালিব (১৫৯৫-১৬৬০) 'কিফায়িতু ল মুসল্লীন'; মীর মুহম্মদ শফী (১৫৫৯-১৬৩০) 'নূরনামা', 'নূর কন্দীল', 'সায়াৎনামা'; আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) 'ইউসুফ-জোলেখা', 'লালমতী-সয়ফুলমূলক', 'শিহাবুদ্দীননামা' প্রমুখ রচনা।

আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেন, 'ভাষার বহুল চর্চার প্রসূন ও সাক্ষ্য গৌড়ীরীতি যে অবশ্য আলোচনার বিষয় হয়েছিল, তা বোঝা যায় বাণভট্ট, ভামহ, দণ্ডী, বামন, বিশ্বনাথ, রাজশেখর প্রমুখ আলংকারিকের গৌড়ীশৈলীর গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ থেকেই। গৌড়ীরীতি শব্দাড়ম্বর, সমাসবাহুল্য, অনুপ্রাসাধিক্য, অতিভাষণ, ধ্বনি-কার্কশ্য ও প্রচলিত শব্দ প্রযুক্তির জন্যে নিন্দিত, কিন্তু ওজঃগুণ, কান্তি ও কবিত্বের জন্যে প্রশংসিত।'[১৯]

ইতিহাসে অষ্টম শতাব্দীর দিকে ভারতবর্ষে প্রধানত দুই ধরনের কাব্যরীতির প্রচলন ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি গৌড়ীরীতি, অন্যটি বৈদর্ভীরীতি। দণ্ডীর ভাষ্যে গৌড়ের বাসিন্দারা অতি উচ্চবাচ্য ও উচ্চকথন পছন্দ করত এবং তাদের অলংকার ও আড়ম্বর ছিল। তাই গৌড়ী সাহিত্যরীতি ছিল অলংকার, আড়ম্বরবহুল, পল্লবিত। অপর দিকে বৈদর্ভীরীতি ছিল সর্বভারতীয় বিশুদ্ধ মার্গপদ্ধতির। গৌড়ী সাহিত্যরীতিতে প্রধান হয়ে উঠেছিল অর্থ-ডম্বর, অলংকার-ডম্বর, অনুপ্রাসপ্রিয় ও বদ্ধগৌরব বা রচনার গাঢ়তা। অপর দিকে বৈদর্ভীরীতির বৈশিষ্ট্য ছিল শ্লেষ, প্রসাদ, মাধুর্য ও সৌকুমার্য ইত্যাদি। নীহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙালির ইতিহাস : আদি পর্ব' গ্রন্থে বলেন, 'বাণভট্ট, ভামহ এবং দণ্ডীর সাক্ষ্যে এ তথ্য পরিষ্কার যে, গৌড়জনেরা সপ্তম শতকের আগেই সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই রীতি সর্বভারতগ্রাহ্য বৈদর্ভীরীতিমানের পাশেই আপন আসন এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়োছিল যে, বাণভট্ট, ভামহ বা দণ্ডী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।[২০]

---

[১৯] আহমদ শরীফ, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৮,

[২০] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, পৃষ্ঠা-৫৭৫

আবহমান বাংলা অঞ্চলের সাহিত্যরীতির নন্দনভাবনায় প্রধান ছিল 'রস'। সাহিত্যিক ও পাঠক সম্পর্ক রসোপভোগের ওপর নির্ভরশীল। সংস্কৃত ঘরানায় ৯টি ভাব ও রসের উল্লেখ আছে। রসগুলো হলো—আদিরস বা শৃঙ্গার রস, হাস্যরস, করুণ রস, বীর রস, অদ্ভুত রস, ভয়ানক রস, বীভৎস রস, রৌদ্র রস ও শান্ত রস। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রস ছয়টি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, উজ্জ্বল বা মধুর।[২১] আচার্য দণ্ডীর মতে, কাব্য ত্রিবিধ—গদ্যকাব্য, পদ্যকাব্য ও মিশ্রকাব্য। দণ্ডী সাহিত্য বা কাব্যের সৌন্দর্যে অলংকারকে প্রধান করে দেখেছেন। তার 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে তিনি মনে করেন, অলংকারই হচ্ছে কাব্যের সৌন্দর্য বিধায়ক ধর্ম। তার মতে, অলংকার দুই রকমের—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। তিনি আরও মনে করতেন, অলংকারহীন, রসশূন্য কিংবা বক্রোক্রি ত্যাগ কোনো রচনা কাব্য পদবাচ্য হতে পারে না। যদিও অধিকাংশ আলংকারিকগণ মনে করেন, শব্দ, অর্থ, রস, ধ্বনি, অলংকারের মতো গুণই একটি কাব্যোপকরণ।

আচার্য ভামহের 'কাব্যালংকার' গ্রন্থটিতে কাব্য সৌন্দর্যের বিষয় হিসেবে কাব্যশরীর, অলংকৃতি, দোষ, ন্যায় নির্ণয় ও শব্দশুদ্ধিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। মোক্ষ হিসেবে শান্ত রসকেও তিনি গ্রহণ করেছেন। আচার্য বামনের 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'র গুরুত্বপূর্ণ দুটি সূত্র অন্যতম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—'অলংকারের জন্যই কাব্য উপাদেয় হয়। এবং সৌন্দর্যই অলংকার।' অনেকে রীতিকেই অনেকে কাব্যের আত্মা বলে অভিমত পোষণ করেছেন। আচার্য কুন্তক কাব্যে বক্রোক্তিবাদ তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। আচার্য বামন গৌড়ীরীতিতে ২০ রকমের গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বৈশিষ্ট্যগুলোই কাব্যে সৌন্দর্য এনে দেয়।

সনাতনীয় ধারার গৌড় বা বৈষ্ণবীয় গৌড়ে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ধারার সাহিত্যদর্শের প্রাধান্য পেলেও বৃহত্তর বঙ্গের সর্বত্র চিন্তন, বিষয় ও তার জারিত রস প্রধান হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া কথা-কথন, বিষয়ভাবনা, দার্শনিকতা, আঙ্গিকবৈচিত্র্য, পালা-পাঁচালি, বাচ্য-ছন্দ-অলংকার ও কাব্যিক নানা মাত্রাগুলো তো ছিলই।

---

[২১] রূপগোস্বামী, উজ্জ্বলনীলমনি, শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত, মুর্শিদাবাদ, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

১৭৫৭ সালে বাংলার রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটলে বাংলার সাহিত্য-শিল্পরীতি পাল্টে যেতে থাকে। ১৮০০-১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মযাজক উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যের অখণ্ডভাব রীতি ভেঙে পড়ে। ভাব-রস-অলংকারনির্ভর বাংলা সাহিত্য ব্যক্তিপ্রচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে। উইলিয়াম কেরি গোবিন্দপুর-সুতানটি-কলিকাতার অস্পৃশ্য নীচু শ্রেণির মানুষের সংলাপকে বাংলা ভাষার প্রতীক হিসেবে ইউরোপীয়দের কাছে তুলে ধরেন। উইলিয়াম কেরি তৎকালীন বঙ্গ-পুণ্ড্র-গৌড়-সোনারগাঁ-ঢাকা অঞ্চলের বাংলা ভাষা দেখেননি। তিনি খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরকরণের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে ভাষাকে ব্যবহার করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরি শুরুতেই শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড থেকে ইসলাম ধর্মাশ্রিত শব্দ-ভাষাকে পুরোপুরি বর্জন করেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদের দিয়ে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতকরণ করান। রামরাম বসুকে দিয়ে 'ইতিহাসমালা' তৈরি করেন। তৈরি করতে থাকেন ইউরোপীয় আধিপত্যনির্ভর ও হিন্দু নেতৃত্বাধীন বলয়। বাংলার আবহমানকাল ধরে বহমান সাহিত্য ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে সৃষ্টি করতে থাকেন নতুন আরেক ইতিহাস। শুরু হয় ইউরোপীয় আদলে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি নানা বিভাজনে সাহিত্যের বিভক্তিকরণ। ইউরোপীয় সাহিত্যইজম ধারার প্রবল স্রোতে বাংলার সাহিত্য হয়ে পড়তে থাকে অন্তঃসারশূন্য দ্বিধাবদ্ধ।

ডক্টর এনামুল হক বলেন, 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতে ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা গদ্যে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া গদ্যের মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। তখন পর্যন্ত পদ্যের মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টির প্রাচীন ধারা বজায় ছিল। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে বাংলায় হিন্দুগণ প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের নূতন গদ্য ধারার আগমনী গীতি গাহিয়া চলিল। এই বিষয়েও বাংলার মুসলমানেরা উক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ অবধি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন মুঘল ঐতিহ্য বহিয়া চলিলেন এবং হিন্দুরা প্রাচীন সাহিত্য ধারা পরিত্যাগ করিয়া গদ্যে পাশ্চাত্যভাব পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিলেন।'[২২]

বাংলা সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র সরে যায়। ইতিহাসকরণ হয়ে ওঠে বিভ্রান্তিকর। তাসাওফচর্চা বা সুফিচর্চা ও আত্মা-পরমাত্মার চর্চা প্রায় একই। এ ধারার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা গীতগোবিন্দ সাহিত্য আলোচনার বিষয়, কিন্তু

---

[২২] ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৭৫

মুসলমানদের বাংলা ভাষায় এসব কোনো চর্চাই সাহিত্য অভিধার মধ্যে পড়েনি। বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণ থাকলে সাহিত্য হয় কিন্তু বাংলার সঙ্গে উর্দু-ফারসি শব্দ থাকলে সাহিত্য অভিধা পায় না; দোভাষী পুথি, বটতলার পুথি হিসেবে তাচ্ছিল্যের শিকার হতে হয়। ইতিহাসকরণ এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যে, বাংলা ভাষায় কৃষ্ণের বর্ণনা সাহিত্য হয়, কিন্তু নবীর বর্ণনা সাহিত্য হয় না।

প্রাচীন বাংলায় আরবি-ফারসি-প্রাকৃতিতে লেখা প্রচলিত ইতিহাসের তথ্যগুলোকে উপেক্ষা করে জেমস মিল ব্রিটিশ ইতিহাসের অনুকরণে তৈরি করেন 'দ্য হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' (১৮১৮)। এতে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ প্রভৃতি ইউরোপীয় রাজনীতির আদলে তৈরি করেন, যা আমাদের মানদণ্ডের মধ্যে পড়ে না। ফলে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে এদেশীয় প্রকৃত ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তা-ই। রামগতি ন্যায়রত্ন যে ইতিহাস রচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা সনাতন ধর্মাশ্রিত বাংলা কিছু বইয়ের ব্যাখ্যা। সে সময় সনাতন ধর্ম আশ্রিত যেমন গ্রন্থ ছিল, তেমনি মুসলমানদের বিশ্বাস আশ্রিত বাংলা গ্রন্থও ছিল। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন জে লঙ-এর সনাতনি ধর্ম আশ্রিত চৌদ্দশত গ্রন্থের তালিকা থেকে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি করেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' শিরোনামে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ।[২৩] ফলে ইতিহাস থেকে দূরে ছিটকে পড়ে গৌড়-বঙ্গ-সোনারগাঁ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চর্চিত মুসলমানদের গ্রন্থগুলো।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শের পথে হেঁটেছেন। তিনি ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্র 'উপন্যাস' নামের বিদেশি নতুন এক আঙ্গিকের আদর্শে উপেক্ষিত হতে ওঠে ঐতিহ্যবাহী জাতকের গল্পের মতো গল্প, রামায়ণ-মহাভারত, কথাসরিৎসাগরের মতো উপাখ্যান, ইউসুফ-জোলেখা, রসুল বিজয়ের মতো আখ্যান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কিংবা মঙ্গলধারার সাহিত্যের মতো মহাকাব্যিক গতি। আর ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে সৃষ্টি করতে থাকেন পুরাণকে ভিত্তি করে হিন্দু জাতীয়তাবাদমূলক কল্পিত উপন্যাস-ইতিহাস।

---

[২৩] দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সাহিত্যরীতিকে অবলম্বন করে সমকালীনতার পথে হেঁটেছেন। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি ছিল তার অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি ছিলেন উপনিষদের দার্শনিক। তিনি বিলেতি রীতিকে অপছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যবিষয়ক চিন্তাগুলো প্রধানত 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে উঠে এসেছে। তার সাহিত্যচিন্তার প্রধানতম যে বিষয় তা হলো সাহিত্য সত্য বা শিল্পসত্য তৈরি। তিনি সাহিত্যে রসকে প্রধান করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্পসৃষ্টিকে নির্মাণ বলেননি, বলেছেন 'নির্মিতি'। জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য সম্পূর্ণই আলাদা। ক্ষণকালীন জিনিসকে চিরকালীন করে তোলাই সাহিত্যের কাজ। তার মতে, সাহিত্য শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য হলো আনন্দ। যা রস ভাবনাকেই প্রধান করে।

সেলিম আল দীনের সাহিত্য এগিয়েছে উপনিবেশের জ্ঞানতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে বাঙালির হাজার বছরের জারিত রসের পরম্পরার আদর্শে। তিনি ইউরোপীয় অন্ধ আধুনিকতাবাদ মেনে নিতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, এগুলো ছদ্মবেশে অনেকাংশেই গ্রাস করেছে আমাদের অতীত। আধুনিকতার ধোয়া তুলে অনেকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুশাসন পালনেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ ভ্রান্ত মানসিকতা পরিত্যাগ প্রয়োজন। তাই তার সাহিত্য রচনায় গদ্য-পদ্যের অভেদ। অতীত সাহিত্যরীতির একাঙ্গীকরণে ফিরে গেছেন। ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে সৃষ্টি করেছেন মহাকাব্যিক নাট্য। ইউরোপীয় বিরাম চিহ্নগুলো পরিত্যাগ করেছেন। এগিয়ে গেছেন জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পুনর্নির্মাণে।

যে জাতি তার নিজের অতীত থেকে শিক্ষা নেয় না, সে জাতি চিরকাল দাস হয়ে থাকে। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যরীতি সমৃদ্ধ। বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের পুরোনো সাহিত্য ঐতিহ্য। কিন্তু উপনিবেশের শাসন আমাদের করেছে পরমুখাপেক্ষী। পরের দিকে তাকিয়ে, পরের অন্ধ অনুকরণ করে আমরা হয়ে উঠেছি আত্মপরিচয়হীন। ইদানীং কালের নব্য উপনিবেশের বাতাসে আমরা টালমাটাল। অথচ এই বাঙালি জাতি বীরের জাতি হিসেবে পরিচিত। সুসমৃদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরবের উত্তরাধিকারী। আজকের বিশ্ববাস্তবতায় আত্মপরিচয় খুব জরুরি। ব্যক্তিক, সাহিত্যিক কিংবা জাতিগত আত্মপরিচয়ের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন অতীত নিয়ে আগামীর পথে এগিয়ে চলা। বাংলার অতীত সাহিত্যরীতিকে পর্যবেক্ষণ করে, হৃদয়ে ধারণ করে সমকালীন বন্ধুর পথে নিজস্বতায় এগিয়ে গেলেই বিশ্বে আত্মমর্যাদায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অতুল সুর, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭

২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০২

৩. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০

৪. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৯

৫. শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, অষ্টম সংস্করণ, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং

৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, নবম সং, কলকাতা, ১৯৯৮

৮. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১

৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম-৫ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বা. ১৪২১

১০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫

১১. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সারস্বত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬২

১২. *আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা বুক হাউজ, কলিকাতা*, ১৩৪৬

১৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৫৫

১৪. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও আব্দুল করিম, আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলকাতা

১৫. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৫৩

১৬. *গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা*, ২০০৬

১৭. *সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, বাংলা একাডেমি*, ১৯৯৬

১৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা

১৯. জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম' অনুবাদ ও সম্পাদনা শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্যকুটির প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৬৬

২০. *বিদ্যাপতি, পুরুষ পরীক্ষা, শিবসিংহ নরপতির আদেশকৃত বঙ্গানুবাদ, রাধানাথ দে অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা*

২১. *বাণভট্ট, হর্ষচরিত, সম্পাদনা প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা*

২২. *দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত মৈয়মনসিংহ গীতিকা, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩*

২৩. *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা, সম্পাদনা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৪*

২৪. *অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৫*

২৫. *বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', সম্পাদনা সুকুমার সেন, সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৮২, কলকাতা*

২৬. *কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' সম্পাদনায় সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৭৫*

২৭. *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত 'ধর্মমঙ্গল', সম্পাদনা অক্ষয়কুমার কয়াল, ভারবি, কলকাতা, ১৯৮৬*

২৮. আবু সাঈদ তুলু, *সেলিম আল দীনের সাহিত্য ভাবনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৭

২৯. ফয়েজ আলম, ভাষার উপনিবেশ-বাংলা ভাষা রূপান্তরের ইতিহাস, সংবেদ, ঢাকা, ২০২২

৩০. রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ', সম্পাদনায় শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা

৩১. হলায়ুধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া', সম্পাদনা ড. সুকুমার সেন, আরএন সিল, কলকাতা, ১৩৩৪

৩২. বিষ্ণুপ্রদ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

৩৩. আনন্দবর্ধন, ধন্যালোক, সম্পাদনা শ্রী বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর, ১৩৬৯

[প্রবন্ধটি 'চিহ্ন' সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত। সংখ্যা ৪৯। আগস্ট, ২০২৫। সম্পাদক-শহীদ ইকবাল।]

প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি

বাঙালি গৌরবান্বিত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী জাতি। বাঙালি কৃষিজীবী সভ্যতার অতীত পরিচয় বহন করলেও সম্প্রতি আবিষ্কৃত ওয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বাঙালির প্রাচীন নগরসভ্যতার পরিচয়কে সুদৃঢ় করে। প্রাচীন কালে বাঙালি শিল্পকুশলীও ছিল। অধুনা 'বাংলাদেশ' ভূখণ্ডের একপাশের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ সুনিবিড় পর্বত শ্রেণি। অপর প্রান্তে সুরম্য বনভূমি আর অতল সমুদ্রের লোনাজলের ঢেউ। শত শত নদীর বয়ে চলা হাজার বছরের এ উর্বর জনপদে ঘটেছে হাজারো প্রাণের সম্মিলন। প্রকৃতির নমনীয়তার সাথে জনস্রোতের মানসিকতাও যেন করুণ রসসিক্ত। বাঙালি কোমলমতি কিন্তু ভীরু কাপুরুষ নয়। সভ্যতার শুরু থেকেই বাঙালি বারবার পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকিয়ে রেখেছে আত্মপরিচয়। ২০০ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশের সাঁড়াশি আধিপত্যেও বিলুপ্ত হয়নি স্বকীয়তা। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসবমুখর এ জাতি আত্মিক সম্প্রীতির জীবন বিন্যাসে অনন্য। হাজার বছরের সমাজ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করেই বাঙালি জাতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে গতিশীল।

প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালি সংস্কৃতি যেমন ছিল সমৃদ্ধ তেমনি তার শিল্পকলাও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে প্রত্যুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন জনপদকেন্দ্রিক বাঙালি জাতির সংস্কৃতি বিকাশমান। এ ভূমিতে প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষের বসবাস

ছিল।[১] নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণে এ বাংলার আদিবাসী আদি অস্ট্রাল।[২] এরা জাতিগত পরিচয়ে অস্ট্রিক। কারও কারও মতে এদের সঙ্গে মঙ্গোলয়েড ও ভোটচীনীয়দের মিশ্রণে বাঙালি জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক বিকাশ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, বাংলার আদিবাসী হচ্ছেন অস্ট্রো-মঙ্গোলয়েড। তবে বাংলায় আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী হিসেবে অস্ট্রিক, নেগ্রিটো, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয় এই চার শাখার তথ্য পাওয়া যায়।

বঙ্গ, বঙ্গাল বা বঙ্গবাসী এ শব্দগুলো প্রাচীন বাংলা ও তার অধিবাসীকেই চিহ্নিত করে। এ নামকরণগুলো সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি পাওয়া যায়। সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনিতে বলিরাজার পাঁচ পুত্রের মধ্যে 'বঙ্গ' নামে এক পুত্র ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিংবদন্তি অনুসারে তার নামানুসারেই 'বঙ্গ' নামকরণ করা হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত নানা গ্রন্থে 'নিষাদ' জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি রামায়ণে নিষাদ জাতিকে কটাক্ষ করা হতো তার উল্লেখ আছে। বাংলার আদিবাসীই এ নিষাদ জাতি নামে পরিচিত ছিল।[৩] প্রাচীন সংস্কৃত নানা গ্রন্থে বঙ্গের লোকদের অসুরও হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে দাস, দাস্য, অসুর প্রভৃতি নামে যে জনগোষ্ঠীকে কটাক্ষ করা হয়েছে তা বঙ্গবাসী।[৪]

ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলা অঞ্চল গঠিত হয়েছিল প্রায় ১০ থেকে ২৫ লক্ষ বছর পূর্বে। প্লাইসোটিন যুগ থেকেই এ অঞ্চলে মানুষ বসবাস করত।[৫] কথিত আছে বঙ্গদেশের বঙ্গনগরে বিজয় সিংহ নামে রাজার এক পুত্র বিতাড়িত হয়ে সিংহলে যান এবং সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৬] এতে স্পষ্ট হয় যে, সিংহলের অনেক পূর্বেই সমৃদ্ধ ছিল বঙ্গদেশ। প্রাচীন কালে পশ্চিম ভারতের আর্যগণ বাংলাকে অধিকার করতে পারেননি। বাংলার সভ্যতায় তারা ঈর্ষাকাতর হয়েছিলেন। বাঙালিরা আর্যদের অনুশাসন মেনে নেননি। তাই

[১] অতুল সুর, *বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫

[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯

[৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০

[৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩

আর্যরা বাঙালিদের ধর্মশূন্য বলে ধিক্কার দিয়েছেন। এমনকি বৈদিক বা তাদের সংস্কৃত ভাষা বাঙালিরা গ্রহণ করেনি বলেও বাঙালিদের ভাষাশূন্য পাখি হিসেবে তিরস্কার করছেন।[৭] তবে অনেকে বাংলার সভ্যতার সময়কাল হিসেবে মাত্র পাঁচ হাজার বছর পূর্বের বলেও উল্লেখ করেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, বাঙালি সংস্কৃতি তিন বা চার হাজার বছর আগের।

খ্রিষ্টপর্ব পঞ্চম শতকে আজকের বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতি শাসিত বঙ্গ, পুণ্ড্র, সমতট, বরেন্দ্র, হরিকেল, গৌড় প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। 'বাঙালি' শব্দটি 'বং' জাতি, 'বঙ্গ' জনপদ বা 'বং'য়ের ভাষাকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে। 'বং'শব্দটি আঞ্চলিক। 'বং' শব্দটির সঠিক উৎপত্তি জানা না গেলেও অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় ভাষা থেকে শব্দটি উদ্ভূত। 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গাল' শব্দের ব্যুৎপত্তি 'বং' থেকে। এ জনপদগুলোর মধ্যে 'বঙ্গ' সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ।[৮] মহাভারতের যুগে 'বঙ্গ' জনপদের সমৃদ্ধি সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। ইতিহাসকার আবুল ফজলের মতে, প্রাচীন কালে এরা 'আল' বা 'আইল' নির্মাণ করত। এ থেকেই 'বাঙ্গাল' বা 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি। ইতিহাসে ধর্মপালকে বঙ্গাল দেশের রাজা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চর্যাকার ভুসুকুপা বঙালি ছিলেন বলে তার ভণিতায় উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকে মানিক রাজার গানে বঙালের ভাটি অঞ্চলে বসবাস এবং লম্বা লম্বা দাড়ির উল্লেখ আছে। প্রাচীন বঙ্গ বলতে ভারতের পূর্বাঞ্চলের একীভূত জনপদকে বোঝাত। মূল 'বঙ্গ' জনপদ ছিল আজকের খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, মুর্শিদাবাদের একাংশ ও নদীয়া জেলা নিয়ে গঠিত ভূ-ভাগ।

ঐতরেয় আরণ্যকে মগধের সাথে 'বঙ্গে'র উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'বঙ্গ'তে পণ্য উৎপাদনের তথ্য পাওয়া যায়। কালিদাসের 'রঘুবংশমে' গঙ্গার প্রধান স্রোতোধারা ভাগীরথী ও পদ্মার তীরবর্তী জনপদ বা ভূখণ্ডকে বঙ্গ বা বঙ্গীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন লেখকগণ এ অঞ্চলকে গঙ্গারিডাই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জানা যায়, বঙ্গ

---

[৭] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০২, পৃষ্ঠা-১৯

[৮] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, পৃষ্ঠা-১০৯

ভূ-ভাগটি দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৯] প্রাচীন কালে গৌড়, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি নিজস্ব জনপদকে অখণ্ড 'বঙ্গদেশ' নামে অভিহিত করা হতো। মৌর্য যুগে গৌড়কে কেন্দ্র করে এ বিস্তৃত পরিসর অঞ্চল গৌড় নামে অভিহিত হতো। রাজাগণ গৌড়েশ্বর উপাধিতে সম্মানিত হতো। ১৪ শতকের প্রথম ভাগে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বৃহত্তর বঙ্গের বিভক্ত জনপদগুলোকে একত্র করে 'বাঙ্গালা' নামটি প্রচলন করেন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহর একত্রীকরণ জনপদগুলো হচ্ছে—গৌড়, বঙ্গ, রাঢ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট ইত্যাদি। একত্র এ অঞ্চলগুলোকে লিখিত রূপে 'গৌড়' হিসেবেও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ভৌগোলিক অংশটি চতুর্দশ শতাব্দী থেকে 'বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।[১০] মুঘল আমলে বাংলার নামকরণ করা হয় 'সুবে বাঙলা'। ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসনের সময় ইংরেজি উচ্চারণে বাংলার নামকরণ হয় 'বেঙ্গল'। বং, বংগাল, বঙ্গ, বাংগালা, বাঙ্গাল, বেঙ্গল, বাঙ্গালি, বাঙালি প্রভৃতি শব্দবন্ধের ভূ-ভাগ, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির নানা পরিবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলাদেশ সুগঠিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় প্রাচীন বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এভাবে—

> বাঙলাদেশের নদ-নদী পাহাড়প্রান্তর বনজনপদ আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক কালের পূর্বেই যে সমস্ত বিভিন্ন কোম একসঙ্গে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল তাহার বন্ধনসূত্র ছিল পূর্বভারতের ভাগীরথী-করতয়া লৌহিত্য-বিধৌত বিন্ধ্য-বাহুবিধৃত ভূ-ভাগ। এই সুবিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের জল ও বায়ু এই দেশের অধিবাসীদিগকে গড়িয়াছে; ইহার ভূমির উর্বরতা কৃষিকে ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায় করিয়া রচনা করিয়াছে; ইহার অসংখ্য বৎস্যবহুল নদ-নদী, তাহাদের শাখা ও উপনদীগুলি আন্তঃবাণিজ্যের সাহায্য করিয়া ধনোৎপাদনের আর একটি উপায় সহজ ও সুগম করিয়াছে। ইহার সমুদ্রোপকূল শুধু যে বহির্বাণিজ্যের সাহায্য করিয়াছে তাহাই নয়, দেশের কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্যের স্বরূপও নির্ণয় করিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই দেশের প্রাচীন যে রাষ্ট্র ও জনপদ-

---

[৯] বাংলাপিডিয়া, সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, 'বঙ্গ' অন্তর্ভুক্তি

[১০] প্রাগুক্ত, 'বঙ্গ' অন্তর্ভুক্তি

> বিভাগ তাহাও কিছুটা নির্ণীত হইয়াছে বাঙলার নদ-নদীগুলির দ্বারা। বাঙলার এই নদ-নদীগুলি, এই বন ও প্রান্তর, ইহার জলবায়ুর উষ্ণ জলীয়তা, ইহার ঋতু-পর্যায়, ইহার বিধৌত নিম্নভূমিগুলি, বনময় সমুদ্রোপকূল সমস্তই এই দেশের সমাজবিন্যাসকে কমবেশি প্রভাবিত করিয়াছে।[১১]

প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালির ছিল স্বতন্ত্র মূল্যবোধ, আচার, রীতি-নীতি।[১২] বর্তমানে বাঙালি কারা? যারা বাংলা অঞ্চলে পরম্পরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। বাংলা ভাষায় ভাবের প্রকাশ করে। বাংলার ঐতিহ্যকে নিজের ঐতিহ্য বলে জ্ঞান করে। দেশের অর্থনীতিসহ সামাজিক কর্মে অংশগ্রহণ করে তাদেরকেই বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করতে দেখা যায়।[১৩] বাঙালি সংস্কৃতি বলতে হাজার বছরের বহমান বাঙালি জাতিসত্তায় বাঙালির আচার-আচরণ, বোধ-বিশ্বাসকে নির্দেশ করে। বাঙালির আচার-ব্যবহার, জীবন-জীবিকা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, বোধ-বিশ্বাস, সংগীত-নৃত্য-সাহিত্য-নাট্য, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির অভিব্যক্তিক রূপই বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।[১৪] গণমাধ্যম, রন্ধন, পোশাক, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বাড়ি-ঘর, ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি নানা কিছু সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

সংস্কৃতি মানে মনের বিলাস নয়, সুকুমারবৃত্তির বিকাশ। আবার সৃজনী প্রতিভা প্রকাশের জোর প্রচেষ্টাও নয়। সংস্কৃতি জীবনের প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় এবং জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য পূরণ করে। সমাজ ও জীবনযাত্রার উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে ওঠে।[১৫] ধন-স্বাচ্ছন্দ্যের ওপরও অনেকাংশে মানস সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। আজকের বাংলার সংস্কৃতির ভিত্তিমূল বৌদ্ধ, সনাতন ও ইসলাম প্রধান তিন ধর্মদর্শনের সংশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ায় সুগঠিত।

---

[১১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, পৃষ্ঠা-১৪

[১২] গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা-৫০৩

[১৩] বদরুদ্দীন ওমরের বাঙালির সংজ্ঞা, সংজ্ঞাটি সংগ্রহ করা হয়েছে আনিসুজ্জামানের 'সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিসাধক' গ্রন্থ থেকে, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৪

[১৪] গোপাল হালদার, *'সংস্কৃতির রূপান্তর'*, পুথিঘর, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা-১৯

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০

প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির রূপ বাঙালির ধর্ম-কর্মে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পকলায় নৃত্যগীতে, ব্যাবহারিক এবং সামাজিক অনুশাসন লক্ষণীয়। এই সংস্কৃতি অনেকটা ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও জাতিসত্তার পরম্পরায় গঠিত। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক বাঙালি জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির জীয়ন্তকাল। অষ্টাদশ শতকে বাংলায় ইউরোপীয় উপনিবেশের ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে হাজার বছরের বাংলার মৌল সংস্কৃতিতে কুঠারাঘাত পড়ে। নতুন ভিন্ন এক সংস্কৃতির সাথে বাঙালি পরিচিত হতে থাকে। কিন্তু নানাভাবে বাঙালির হাজার বছরের বহমান সংস্কৃতি টিকে থাকে। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে ভূগোল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ভাষাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, গ্রামীণ-নাগরিক এই জীবনছন্দ একই সুরে গাঁথা। বাংলা ভাষাটাই আজকের বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভাষিক পরিচয়েই বাঙালি বিশ্বে পরিচিত।[১৬]

প্রাচীন বাংলায় জ্ঞানচর্চার সমৃদ্ধ ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৭] প্রাচীন বাংলা ছিল আর্য সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত।[১৮] বাংলা স্থানীয়ভাবে ছিল স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। বৈদিক কিংবা সংস্কৃত সাহিত্য-কলাবিদ্যার কৌশলকে অন্ধ অনুকরণ করেনি প্রাচীন বাংলা। প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং নৃতাত্ত্বিক জীবন সংশ্লিষ্টতায় বাংলার সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হয়েছে।[১৯] প্রাচীন বঙ্গ-গৌড়ে অলংকার, অনুপ্রাস, রচনার গাঢ়তা নির্ভর গৌড়রীতি নামে স্বতন্ত্র কাব্যরীতি বিদ্যমান ছিল।[২০] প্রাচীন বাংলায় ধর্ম-দর্শন ও জ্ঞান-শিল্পের চর্চা ছিল অনবদ্য। অলংকার, চিকিৎসা, ব্যবহার বিদ্যায় বাংলার ব্যুৎপত্তি ছিল।

প্রকৃতিগতভাবেই বাঙালি মানস নমনীয়। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি সবকিছুতেই বাঙালি ছিল আত্মনির্ভরশীল। নানা দিক

---

[১৬] গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা-৫০৪

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৬, ৫৮৬

[১৮] সৈয়দ জামিল আহমদ, হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-০২

[১৯] বাংলা পিডিয়া, সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ‘বাঙালি সংস্কৃতি’ অন্তর্ভুক্তি

[২০] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, পৃষ্ঠা-৫৭৪

থেকে বাঙালি ছিল স্বতন্ত্র। প্রাচীন বাংলার নানা সম্পদের মধ্যে অন্যতম সম্পদ ছিল হস্তী। ফলে এ বাংলা অঞ্চলেই হস্তী চিকিৎসাবিদ্যা বিকাশ লাভ করেছিল।[২১] শুধু হস্তীবিদ্যা নয় নানাবিধ জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশও ঘটেছিল। সাংখ্য দর্শনকে বলা হয় ভারতীয় দর্শন ও ধর্মমতের আদি ভাবনা। আর এ সাংখ্যদর্শনের বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন বাংলায়।[২২] প্রাচীন বাঙালির মধ্যে ধর্মদর্শন চর্চার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। এ বাংলার রেশমের চাষ ও কাপড় পৃথিবীব্যাপী সুপরিচিত ছিল। মধ্য এশিয়া থেকে কাপড় আমদানি করতে বাংলায় আগমন করত। জানা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-বাদশাহদের পোশাক তৈরি হতো বাংলার বুননে। বাংলায় ছিল অত্যন্ত সুসমৃদ্ধ জাহাজ কারখানা।[২৩] সমুদ্রপথে মধ্যপ্রাচ্যের দূর বন্দরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ন্যায়শাস্ত্রের জন্ম বাংলাতেই। ন্যায়ের মতো সমতা, ন্যায়ের মতো ন্যায্যতার ধারার অঙ্কুরোদ্গমও হয়েছিল প্রাচীন বাংলায়। জ্ঞানতত্ত্বের প্রমাণ-প্রমেয় ছাড়াও যে শব্দ বা নিদর্শনের ধারণা, তা বাঙালির চিন্তায় বিকাশ ঘটেছে। প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যশিল্পও ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

সুকুমারী নানা জ্ঞানবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলায়। এমনকি প্রাচীন বাংলার জীবন ছিল মর্যাদাশীল। প্রাচীন বাংলার কোথাও ক্রীতদাস ছিল না। ক্রীতদাস কেনা-বেচাও হতো না। প্রাচীন বাংলার মানুষ ছিল স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী। এ বাংলায় ক্রীতদাস প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।[২৪] এ বাংলা অঞ্চলের অসংখ্য পণ্ডিত বিভিন্ন দেশে জ্ঞানবিস্তার ও শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। নানা বিহারে প্রধান পণ্ডিতের আসন অলংকৃত করেছিলেন। বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রগোমী ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। প্রাচীন বাংলার পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ও শিক্ষাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছেন। মধ্যযুগে সুলতানি আমলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পাঠ্য বিষয় ছিল।[২৫] নানা মাত্রিক প্রযুক্তি ও শিক্ষায় বাংলা উন্নত ছিল। নানা উপাত্তে প্রতীয়মান

---

[২১] দীনেশচন্দ্র সেন, *প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরব*, বিশ্বভারতীগ্রন্থালয়, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৫৩, পৃষ্ঠা-৩

[২২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১-১২

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩

[২৪] শ্রী রজনীকান্ত গুহ অনুবাদিত '*মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণ*', বরিশাল-১৩১৮, পৃষ্ঠা-১১২

[২৫] এমাজউদ্দীন আহমদ, হারুন অর রশীদ সম্পাদিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা 'রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি' খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৩৯

হয় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল প্রাচীন এ জনপদ। বাংলার প্রাচীন জনপদ তাম্রলিপ্তি সম্পর্কে অতুল সুরের বক্তব্য অবিশ্বাস্য রকমের। তিনি বলেন—

> তাম্রাশ্মযুগের সভ্যতার অভ্যুদয়ে তামাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মিসর বলুন, সুমেরু বলুন, সিন্ধু উপত্যকা বলুন সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তামার ব্যবহার দেখি। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোনো জায়গায় হয়েছিল, যেখানে তামা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে-সেখানে অবশ্য তামা সামান্য কিছু কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণ্য। বাংলাই ছিল সে যুগের তামার প্রধান আড়ত। তামার সবচেয়ে বৃহত্তম খনি ছিল বাংলাদেশে। বাংলার বণিকেরাই 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে, ওই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এ জন্যই বাংলার সবচেয়ে বড় বন্দর নগরের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। এই তামা সংগৃহীত হতো ধলভূমে অবস্থিত তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম তাম্রখনি হতে।[২৬]

বাঙালির মধ্যে লিপির প্রচলন ছিল প্রাচীন কাল থেকেই। জ্ঞানচর্চায় লিপি অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি উপকরণ। বৌদ্ধ 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে 'বঙ্গলিপি' নামে স্বতন্ত্র লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা বর্ণমালা পাওয়া যায় বিনায়ক পালের তাম্রফলকে। অষ্টম শতকে ধর্মপালের 'খালিশপুর' তাম্রশাসন, নবম শতকে নারায়ণ পালের 'বাদাল' স্তম্ভলিপি, দশম শতকে প্রথম মহীপালের 'বাণগড়' তাম্রশাসন, একাদশ শতকে তৃতীয় বিগ্রহপালের 'আমগাছি' তাম্রশাসনে, দ্বাদশ শতকে বিজয় সেনের 'দেওয়াপাড়া' শিলালিপিতে বাংলালিপির ব্যবহার দেখা যায়।

প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতিতে সুকুমারবৃত্তির চর্চাও ছিল সুবিদিত। শৌখিন শিল্পকলার চর্চার পরিচয়ও পাওয়া যায়। সে সময় পটচিত্র ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। এমনকি আদি মধ্যযুগেও পটচিত্র ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। নানা ধরনের পট, বিশেষত গাজীরপট, কালীঘাটের পট প্রভৃতি ছিল মানুষের জীবনযাপনেরই অংশ। ঘটচিত্র, সরার চিত্র, শখের হাঁড়ি, পুতুল, নকশিকাঁথা, আল্পনা প্রভৃতির নিত্য ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার ঘরে

[২৬] অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালী, সাহিত্যলোক, কলকাতা, বৈশাখ-১৩৫৭, পৃষ্ঠা-১৬

ঘরে এসব শৌখিন শিল্পকর্ম নিত্যদিনের ব্যবহার্য দ্রব্য ছিল। প্রাচীন বাংলায় পুতুলের বহুল জনপ্রিয়তার তথ্যও পাওয়া যায়। কখনো কখনো পরিবেশনা হিসেবেও পুতুল ব্যবহার হতো। মৃৎশিল্পে সমৃদ্ধ ছিল প্রাচীন বাংলা। বর্তমানে যেকোনো প্রত্নখননে প্রথমেই যে দ্রব্যটি পাওয়া যায় তা হলো মৃৎশিল্প। মাটির পাতিল, মাটির সরা ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। শোলাশিল্পের জনপ্রিয়তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। মাদুর-শিল্প শিকা-শিল্প প্রাচীন বাঙালির অত্যাবশ্যকীয় বিষয়রূপেই পরিগণিত হতো। বয়ন শিল্পে বাংলা অঞ্চল ছিল বিশ্বে অনন্য। বাংলার মসলিন সারা পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ পরিধান করত। সুদূর পশ্চিম থেকে হাজার হাজার মাইলের সমুদ্রপথ বেয়ে বাংলার মসলিনের জন্য ছুটে আসত। মসলিনের জনপ্রিয়তা ছিল বিশ্বে সবার ওপরে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই রপ্তানি হতো মসলিন। শবনম ও রাওয়ান মসলিনের খ্যাতি ছিল সুবিদিত।

প্রাচীন বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতি ছিল বৈচিত্র্যমণ্ডিত। ভাত-মাছ ছিল অন্যতম প্রধান খাবার। নিত্যদিনের খাবারের মধ্যে গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল, নলিতা শাক প্রভৃতি ছিল অত্যাবশ্যকীয়।[২৭] দুগ্ধজাত পণ্য ছিল প্রাচীন বাঙালির পছন্দের খাবার।[২৮] এগুলোর মধ্যে দই, পায়েস, ক্ষীর ইত্যাদি ছিল অন্যতম। এগুলো ছাড়া হরিণের মাংস খাওয়ার রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিণের মাংস ছাড়াও বিভিন্ন রকমের মাংস ছিল তাদের খাদ্যতালিকায়। শোল মাছ, ইলিশ মাছ প্রভৃতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাবার ছিল। গুড়, খই, চিড়া, মুড়ি, নারিকেল, পান খাওয়াসহ নানা খাদ্যোপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙালির কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদি ফলও পছন্দের তালিকায় ছিল।[২৯] ওই সময় আখ বা ইক্ষুর নানা ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। সংসারজীবনের সাথে সে সময় অঙ্গাঙ্গি ছিল নৃত্যগীত বা পরিবেশনা সংস্কৃতি। কৃত্য কিংবা শিক্ষা-শৌখিন নানা ভাবাদর্শেও প্রচলিত ছিল পরিবেশনা। প্রাচীন বাংলায় গান গাওয়া, নৃত্য এবং অভিনয়ে পেশাভিত্তিক জীবিকা নির্ভর করত বলে পরিচয় পাওয়া যায়।[৩০]

---

[২৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, পৃষ্ঠা-৪৪৪

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪৫

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪৭

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫০

কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বাংলায় নৃত্য এবং গীতের সাহায্যে নাট্যাভিনয়ের প্রচলনও ছিল।[৩১] প্রাচীন বাংলায় যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল নৌকা। নৌকা ছাড়াও যাতায়াতের ক্ষেত্রে হস্তীযান, অশ্বযান; পালকি কিংবা শকটের ব্যবহার লক্ষণীয়। ফুলদানি, মাটির খেলনা, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান ও ভোজনপাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকি, পুস্তকাধার ইত্যাদি নানা ব্যবহার্য দ্রব্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলায়।[৩২]

বাংলার পরিবেশনা ঐতিহ্যও অত্যন্ত সুসমৃদ্ধ। বাংলার প্রাচীন পর্বের শিল্প-সাহিত্য প্রধানত উপস্থাপনকেন্দ্রিক ব্যাপ্ত ছিল। তা ছিল স্মৃতিনির্ভর কিংবা হস্তলিখিত। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগে পাঁচালি, লীলানাট, গীতনাট, নাটগীতপালা প্রভৃতি নাট্য আঙ্গিকগুলোও মূলত মৌখিক রীতিতেই আবর্তমান ছিল।[৩৩] প্রাচীন বাংলা ছিল গীতপ্রবল। পরিবেশনা রীতিতে বাঙালি ছিল স্বতন্ত্র। ভারতীয় অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সাধারণ ঐক্য পরিলক্ষিত হলেও রূপ-রীতিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল বাংলা।[৩৪] এমনকি সহজিয়া, নাথযোগী, বাউল, ভাটিয়ালি, মুরশিদি, মাইজভাণ্ডারী ইত্যাদি নানা গীতিপ্রবণতা বাংলার নিজস্ব।

পরিবেশনা সংস্কৃতির মধ্যে নাটক অন্যতম। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাট্যবিষয়ক গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্র। আচার্য ভরতমুনি তার নাট্যশাস্ত্রে এ অঞ্চলের নাট্যরীতিকে 'ওড্রমাগধী' নামে আঞ্চলিক নাট্যরীতির হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩৫] যা মগধ তথা তৎকালীন বৃহত্তর বাংলা ভূখণ্ডের নাট্য প্রবৃত্তির পরিচয়ই শনাক্ত করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলায় নাট্যক্রিয়ার সমৃদ্ধ উপস্থিতি ছিল এবং তা আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ওড্রমাগধী রীতিটি অপ্সরা সৃজন নৃত্য থেকে উদ্ভব কৈশিকী প্রবৃত্তি ও ভারতী প্রবৃত্তির সমন্বয়ে

---

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫১

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৭

[৩৩] সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র, সম্পাদনা সাইমন জাকারিয়া, মওলা ব্রাদার্স, ২০০৯, খণ্ড-০৪, পৃষ্ঠা-৩২৬

[৩৪] গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা, ২০০৬, নবম মুদ্রণ-২০১৬, পৃষ্ঠা-৫০৩

[৩৫] সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ড.) (সম্পা.) *ভরত নাট্যশাস্ত্র* ১, বঙ্গানুবাদ-ড. সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. ছন্দা চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১১৬

গঠিত বলে ক্রিয়া ও রসের বহুনৃত্তগীতবাদ্য সংযুক্ত লাস্যময়ী অভিনয়নীতির নাটক।[৩৬] 'নৃত্ত' শব্দের ব্যবহারে প্রাচীন বাংলা ছন্দিত অভিনয়রীতিকেই তুলে ধরে। সে সময় প্রচলিত সংস্কৃত নাট্যধারার করণকৌশলকে বাংলা অঞ্চলের নাট্য অনুসরণ করেনি।[৩৭] হাজার বছরের বাংলার নাটক মানেই একধরনের বর্ণনাত্মক আখ্যান, যা নৃত্যগীত, অভিনয়-সহযোগে উপস্থাপিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীন বাংলার নাট্য সম্পর্কে বলেন—

> ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারি রকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম-আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড্রমাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে নাটকে নৃত্য গীত বাদ্য বেশি বেশি দেখিতে ভালোবাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভালোবাসিত, কিন্তু উহা চতুর মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্রমাগধী। ওড্রমাগধী যে সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ, বঙ্গদেশ হইতেই মলচ মল্ল বর্ষক ব্রহ্মোত্তর ভার্গব মার্গব প্রাগজ্যোতিষ পুলিন্দ বৈদেহ তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভালোবাসিত, ছোট ছোট নাটক ভালোবাসিত, পূর্ববঙ্গে আশীর্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভালোবাসিত, কথোপকথন ভালোবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভালোবাসিত। স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভালো লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ—এসব ভালোবাসিত না। খ্রিষ্টের দুই শত বৎসর পূর্বেও যদি বাংলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙালির কম গৌরবের কথা নয়।[৩৮]

---

[৩৬] সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র, সম্পাদনা সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯, খণ্ড-০৪, পৃষ্ঠা-৩২৪

[৩৭] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-০২

[৩৮] দীনেশচন্দ্র সেন, *প্রাচীন বাঙ্গলার গৌরব*, বিশ্বভারতীগ্রন্থালয়, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৫৩, পৃষ্ঠা-২২

প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—প্রায় সমস্ত পরিবেশনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাতে নৃত্যগীতের সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। বাংলার প্রাচীন যে তম্বুরু নাটকের উল্লেখ যাওয়া যায় তা বাংলা অঞ্চলের নৃত্যগীতের পরিচয়কেই সুদৃঢ় করে। তা ছাড়া পাল যুগে এসে যে বুদ্ধ নাটকের পরিচয় পাওয়া যায় তা নৃত্যগীতেরই আঙ্গিক। প্রাচীন বাংলার নাটক সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন—

> প্রাচীন কালে নৃত্য বা নৃত্ত ছাড়া নাটক ছিল না; কাজেই বুদ্ধ নাটকই হউক আর তুম্বুরুনাট্যই হউক, নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে বাধা নাই।[৩৯]

ওড্রমাগধী রীতিটি বাংলা ছাড়াও নানা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন গান-বাজনা-নৃত্যবহির্ভূত বৈশিষ্ট্যে প্রাগজ্যোতিষ, বিদেহ কিংবা তাম্রলিপ্তির স্থানিক ধারাকেই বোঝাতে চেয়েছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ওড্রমাগধীতে সংলাপের স্বরূপ নিয়ে তা আলাদা গবেষণা বা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত 'চর্যাপদ'। নেপালের রাজদরবারের রয়েল লাইব্রেরি থেকে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' শিরোনামে প্রকাশ করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন। এ চর্যাগুলো মূলত বৌদ্ধ সাধকের নির্বাণ সাধন প্রক্রিয়া। গূঢ় ব্যাখ্যার্থে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্ব উপস্থাপিত। আক্ষরিক চিত্রে বাঙালির জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি অনবদ্যতায় ফুটে উঠেছে। এ চর্যাগুলোর মধ্যে ১৭ সংখ্যক চর্যায় দেখা যায়—বীণা বাজছে। শূন্য তন্ত্রীর ধ্বনি বিলসিত হচ্ছে ক্ষীণ সুরে। গজবরের সমরস সন্ধি গণ্য হইল। যখন হাতে করভফল চাপা হইল তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনি সকল দিকে বেজে উঠল। তখন গান্ধি দেবী নৃত্যপর আর বুদ্ধ নাটক সম্পন্ন

---

[৩৯] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, পৃষ্ঠা-৬৪০

হচ্ছে।[৪০] এ চর্যায় নির্বাণ সাধনায় গূঢ় পন্থা নির্দেশ করলেও বস্তুগত দিকে নাট্যের পরিচয়কেই বিধৃত করে। এ সময়ের বৃহত্তর বাংলা অঞ্চলের নাট্যপ্রবণতায় দর্শকবেষ্টিত স্থানে নৃত্যগীত ও অভিনয়ের ধারায় নাটক সম্পন্ন হতো বলেই পরিচয় তুলে ধরে। এ সময় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ডমরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। আরেকটি চর্যায় উল্লেখ 'এক সো পদুমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ী, তঁহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ি'।[৪১] অর্থাৎ একটি পদ্ম তার ওপর ডোম্বী নাচছে।

প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় কাশ্মীরের কবি কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে। এটি কলহন রচিত কাশ্মীরের ইতিহাসগ্রন্থ। এর কাহিনিতে দেখা যায়, কাশ্মীরের রাজা লতিতাদিত্যের নাতি যুবরাজ জয়াপীড় (আনু. অষ্টম শতক) গৌড় রাজ্যের পৌণ্ড্রবর্ধনে অর্থাৎ বগুড়ার কাছাকাছি অঞ্চলে আগমন করেন। বগুড়ার পৌর দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়েন জয়াপীড়। নৃত্যগীত দেখার জন্য তিনি কার্তিকের মন্দিরে প্রবেশ করেন।[৪২] সেখানকার নর্তকী কমলার নৃত্যগীতে প্রেমে পড়ে যান। মন্দিরে নিজস্ব ঢঙে ভরতের শাস্ত্রীয় নৃত্যের মিশ্রণ ছিল। নৃত্য দেখতে তিনি শিলাতলে বসেন। নৃত্যগীত নাট্যের অপূর্ব মাধুর্য ছিল সেখানে। ভালোবাসার পরিণতি হিসেবে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন কমলাকে।

---

৪০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২৩, পৃষ্ঠা-৩০। চর্যাটি বীণাপার রাগপটমঞ্জরীতে—

'সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী ॥ ধ্রু
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ ধ্রু
আলি কালি বেণি সারি সুণেআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ॥ ধ্রু
জবে করহা করহক লেপি চিউ
বতিশ তান্তি ধনি সএল বিআপিউ ॥ ধ্রু
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥ ধ্রু

৪১ প্রাগুক্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃষ্ঠা-১৯

৪২ 'কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী', শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত, জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-৭১

তখন গৌড়ে সিংহের প্রচণ্ড অত্যাচার বিদ্যমান ছিল। কাশ্মীরের যুবরাজ সিংহকে দমন করলে গৌড়ের রাজার কাছে তার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে গৌড়ের রাজার কাছে আমন্ত্রিত হন। রাজ-সুসম্পর্ক তৈরিতে গৌড়ের রাজার কন্যাকেও তিনি বিয়ে করেন। অবশেষে দুই স্ত্রী নিয়ে কাশ্মীরে ফেরত যান এবং দুটি মন্দির নির্মাণ করেন। জানা যায়, এখনো কাশ্মীরে মন্দির দুটির ধ্বংসাবশেষ আছে। আরও জানা যায়, গৌড়ের এ নৃত্যপটিয়সী কমলাই কাশ্মীরের নৃত্য-নাট্যশিল্পকে অসম্ভব রকম প্রভাবিত করেছিল। এ থেকে স্পষ্ট যে, তৎকালীন বাংলা অঞ্চলে বিভিন্ন মন্দিরে নর্তকী-দেবদাসীদের নৃত্যগীত নাট্যাভিনয়ের বহুল প্রচলন ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রসহ প্রাচীন ভারতীয় নানা গ্রন্থেই দেবদাসীদের নৃত্যগীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা মন্দিরে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নৃত্যশিল্পীরূপে নিযুক্ত থাকত। সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করত দেবতার সন্তুষ্টি বিধানে। আজও ধ্বংসাবশেষে উৎকীর্ণ মাটির ফলকে দেবদাসীদের বিভিন্ন নৃত্যপ্রতিম ভঙ্গিমা দেখা যায়। এতে বাংলার প্রাচীন নৃত্যগীত-অভিনয়ের সংস্কৃতির পরিচয়ই বিধৃত হয়।

বাংলার সংস্কৃতি ছিল বহুমাত্রিক। অতীত কাল থেকেই সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। জ্ঞান-দর্শন, অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি ও জীবন সংস্কৃতিতে বাঙালি ছিল অনবদ্য। 'বারো মাসে তেরো পার্বণে'র দেশে জীবন ছিল রঙিন। পালা-পাঁচালি-জারি-যাত্রায় মাতিয়ে রাখত। আবেগ আর উচ্ছ্বাস, প্রেম আর সুন্দর এখানে এক সুরে বাঁধা। পুরাণের বেহুলা-লখিন্দর কেঁদেকেটে বারবার ফিরে আসে বাংলার ঘরে ঘরে। আর মনসা কেঁদে বেড়ায় গাংনির জলে। বাংলার অতীত গৌরবের পথ বয়ে সময়ের স্রোত রয়ে সয়ে আজও বাংলাদেশ ভাসে অনির্বাণ সুন্দরের স্রোতে। বাঙালি বীরের জাতি। বাঙালি ঝড়-জলোচ্ছ্বাসকে জয় করে যেমন বেঁচে থাকে, তেমনি বাইরের শক্তির আক্রমণকেও প্রতিহত করে টিকে থাকে। বাঙালির অতীত মানেই জ্ঞান-শাস্ত্র-বিনোদন আরও কত কী। ব্যাকরণ চর্চা, নাট্যচর্চা, উদ্ভিদবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, কামশাস্ত্র, সাহিত্য সাথে পাঁচালি-পালা-যাত্রা। হাজার বছরের নানা জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণ এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ধ্য দিয়ে পথ হাঁটলেও বাঙালি তার আত্মপরিচয় ভোলেনি। বাঙালি নিজস্ব সংস্কৃতির গতিপথ কখনো বদলায়নি। ভাষাভিত্তিক স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তার প্রমাণ।

কবিতার পাঠক, পাঠকের কবিতা

কবিতা কীভাবে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তা রীতিমতো এক রহস্যের ব্যাপার। পৃথিবীর প্রাচীন জননন্দিত এ শিল্পমাধ্যমটি যুগে যুগে কালে কালে মানুষের শিল্পতৃষ্ণা নিবারণ করে এসেছে। আদি এ মাধ্যমটি এমন কী গুণে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে! যা অনুভব করার মধ্য দিয়ে কবিতা মানুষকে প্রলুব্ধ করে। কবিতা কি কবির বেদনাদগ্ধ হৃদয়ের উপলব্ধি? শোকে মাতম হৃদয়ের অন্তর্গত অভিব্যক্তির বিমূর্ত রূপ। সৃষ্টিশীল বেদনা সৃজনের আকুতিতে রক্ত ঘাম শ্রম ও স্বপ্নে একাকার হয়ে ওঠে। কবি বাল্মীকি যখন বলে উঠেছিলেন, 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগত শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম।' তখন আমরা টের পাই কবি হৃদয়ের ব্যাকুল অনুভব। যা পাঠক হৃদয়কে করুণরসে সিক্ত করে দেয়। জীবন জগৎ সম্পর্কে মানুষের হৃদবেদ্য অনুভূতিতে পাঠক হৃদয় নড়েচড়ে ওঠে। তাহলে কি রস সৃষ্টি হলে পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায় কিংবা বাচ্য-অলংকারগুণে? ভাব-ভাষাগুলো কেন হয়ে ওঠে কবিতা? কবিতায় এক হৃদয়ের বেদনাঘন আকুতি আরেক হৃদয়ে দোলা দেয়। হয়তো তার মূলে থাকে প্রাণসংকটপূর্ণ মানবিকতা বা কবি হৃদয়ের শৈল্পিক ভাবপ্রকাশ। তাহলে প্রশ্ন আসে কবিতা কি কেবলই বেদনাঘন হৃদয়ানুভূতির শৈল্পিক ভাবপ্রকাশ? গিলগামেসে তখন উচ্চারিত হয় জীবনের অবিনশ্বর সত্য। বেঁচে থাকার আকুল তিয়াশা তখন কবি হৃদয়ের আকুতি ভিন্নরূপে ধরা দেয় ভাব-ভাষায় শৈল্পিক বিন্যাসের পরতে। স্যাফোর বাণীগুলো কাব্যিক ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রিসের স্যাফো কিংবা ডিথিরাম্ব ভাষাবিন্যাসগুলো যেন হৃদয়ের তন্ত্রীতে নাড়া নেয়। সেখানে

বিয়োগান্ত অনুভবগুলো বেশি স্পর্শ করে। কবিতা তখন দাঁড়ায় পাঠকের কাতারে। আবার পাঠক দাঁড়ায় কবিতার সামনে। দান ও গ্রহণের লীলায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে জীবন জগতের নতুন অনুভব, নতুন উপলব্ধি।

প্রাচীন গ্রিসে কবি-নাট্যকার অনুকরণে সত্যের বিভ্রম তৈরি করত বলে প্লেটো তার রিপাবলিকে আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের বিতাড়িত করতে চেয়েছেন। দেখা যায়, কবিতা একধরনের কাল্পনিক সত্য তৈরি করতে সক্ষম। যার কারণেই পাঠকরা সৃষ্ট শিল্পবাস্তবতাকে সত্য বলে ভ্রম করে থাকতে পারেন। এই কল্পনার আধিক্যে গড়া বাস্তবতা প্রকৃত সত্য থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় বলেই প্লেটো কবিদের সম্পর্কে এমন খেদোক্তি করেছেন। অ্যারিস্টটল অবশ্য জীবন, সমাজ ও সভ্যতার শৈল্পিক অনুকরণকে প্রধান মনে করতেন। কবিতা একধরনের শিল্পসত্য তৈরি করতে পারে বলেই তা পাঠকের হৃদয়ের তন্ত্রীতে নাড়া দিতে সক্ষম। যা ঘটেছে ইতিহাস তার বর্ণনা দেয় আর কবিতা বা শিল্প যা ঘটতে পারত তার অনুভব জানায়। যা ঘটতে পারত বলতে অ্যারিস্টটল অবশ্য মিথ্যা ইতিহাস তৈরির কথা বোঝাননি। বরং সত্যের ভেতরের শৃঙ্খলা, নতুন আবিষ্কার, নতুন ব্যাখ্যা, অনুভবের কাল্পনিক বাস্তবতা চেয়েছেন। অধুনা দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন মানে ইতিহাসকে বিকৃতি করা নয়ঃ মূল সত্যকে অক্ষুণ্ন তার উপকরণ নিয়ে নতুন শিল্প-কল্পনার সৌধ তৈরি করা। ডিথিরাম্ব কবিতাগুলো মানুষকে মায়ায় বাঁধত।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে একসময় মনে করা হতো অলংকারের গুণেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। 'কাব্যনং গ্রাহ্যমঙ্কারৎ'। অলংকারের নান্দনিক প্রয়োগে পাঠককে ভালো লাগার অনুভূতিতে আবদ্ধ করে। অনেকে আবার মনে করেন অলংকার ছাড়া কাব্য পদবাচ্য হতে পারে না। তারা মনে করেন কবিতার জন্য রীতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' অর্থাৎ রীতিই কাব্য। পদরচনার নানা ভঙ্গিই পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে। রীতি ছাড়া কী করে কবিতা হয়? আবার কেউ কেউ বাচ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কাব্যবস্তু বা কাব্য বিষয়ই প্রধান। তাহলে কি কবিতা ধ্বনিনির্ভর হলে কাব্য পদবাচ্য হতে পারে? ধ্বনি কিংবা ব্যঙ্গপ্রধান হলে পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে। কাব্যে বাক্যগুলো শুধু একটি কথা বলে না। বাক্যটি যখন অতিরিক্ত কিছু বলে তখনই হয়ে ওঠে কবিতা। কিংবা পূর্বে আবার ফিরে যেতে হয় কবিতা কী

তবে রসনির্ভর। বিংশ শতকের কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো অতিরিক্ত অর্থে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে—

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

কিংবা

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

ব্যঞ্জনাময় ভাবপ্রকাশে পাঠক যেমন গুরুত্বপূর্ণ। রস নিষ্পত্তির ধারাতে কবিতা যখন অন্বিষ্ট হয় তখন পাঠকই হয়ে ওঠে প্রধান। কারণ পাঠকের অনুভবই রসধারায় মুখ্য। কবির ভাব ও সৃষ্টরস জারিতের খেলায় পাঠক মন টালমাতাল। বিভাব, অনুভাব ও রস সৃষ্ট খেলায় কবি-কবিতা-পাঠক তখন একাকার। চতুর্দশ শতকের কবি বিদ্যাপতি যখন বলেন—সুখেরই লাগিয়া এ ঘরও বাঁধিনু অনলে পুড়িয়ে গেল।' তখন যেন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের প্রচ্ছন্ন আবেগে পাঠকের নিজের প্রেমোপলব্ধি বড় হয়ে ওঠে। কিংবা চণ্ডীদাস যখন বলেন 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।' তখন মানবজীবনই মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। পাঠক খুঁজে পান নিজ সত্তার পরিচয়। কবিতা তখন পাঠকের আত্ম-উপলব্ধিরই অনুভব। পাঠকের হৃদয়ের সহিত একীভূত হয়ে ওঠে কবিহৃদয়। অপর এক কবি বলেন, 'প্রেয়সী আমার হারিয়েছি কোনকালে, তবুও বেদনা জাগে হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে।' মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীর রসে গাইবো মা গীতখানি' তখন যেন পাঠক নিজেরই বীরত্বগাথার অনুভবে অধীর হয়ে ওঠেছেন। যুগে যুগে কালে কালে কবিতার হৃদয়বেদ্য ভাবের গভীরতা পাঠকের হৃদয়বৃত্তিতে আঘাত করেছে বলেই কবিতা শব্দবন্ধে রূপান্তরিত হয়ে ওঠেছে। পাঠক খুঁজে পেয়েছে জীবন ও জগতের নতুন নতুন উপলব্ধি।

বাংলার কাব্য-নন্দনে কবিতার অন্যতম কাজ সৌন্দর্য সৃষ্টি হলেও সত্য-কল্যাণ প্রধান। রোমের হোরেস সাহিত্যের গুণ হিসেবে ভাষার উৎকর্ষকে বড় করে দেখেছেন। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট সাহিত্য-শিল্পকে কলাকৈবল্যবাদী হিসেবে সমর্থন করেন। মার্কসবাদীরা মনে করেন—কবিতা-সাহিত্য-শিল্প হবে মানুষের জন্য। মানুষের কল্যাণ ও সমাজের অগ্রগতি সাধনকে সাহিত্য-শিল্পের প্রধান কাজ হিসেবে দেখেছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টল। জ্যঁ পল সার্ত্রে শিল্প আনন্দের অন্বেষণ ও সৌন্দর্যচেতনাকে জীবনের সত্য

অনুভবের পন্থা হিসেবে ভেবেছেন বলে তার কাছে জীবনসত্যই মুখ্য। সে প্রেক্ষিতের কবিতা-সাহিত্য-শিল্প জীবনের কথা বলে বলেই সাধারণ জীবনকে স্পর্শ করে থাকে।

কবি হৃদয় অর্থাৎ কবির বেদনাবিদ্ধ হৃদয় কবিতায় ধরা দেয়। পাঠক সে হৃদয়ের আকুতিকেই নিজের হৃদয়ের ভাবাবেগের স্পর্শে অনুভব করে। পাঠক ছাড়া কবিতা পূর্ণতা পায় না। রবীন্দ্রনাথ সহিত-আনন্দ-কবিকল্পনায় যে সৌধ তৈরির কথা বলেন, তাতে আরো জীবনের গভীর সত্য নিহিত। জীবনের ক্ষণ-অনুভূতিকে চিরকালীন হৃদয়বেদ্য করাই সাহিত্যের কাজ। অবশ্য রোলা বার্থ সাহিত্যের নানা ধরনের পাঠভেদের কথা তুলেছেন। কবিতায় কিংবা সাহিত্যকর্মে যে জন্য পাঠকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কবি কল্পনায় সেই কাব্যসত্য যেন ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
কবি, তব মনোভূমি,
রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

কোলরিজের মতে—অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণীবিন্যাসই কবিতা। কী সেই অপরিহার্য শব্দ, আবার কাদের অবশ্যম্ভাবী বাণী ও তার বিন্যাস। জীবনের অবিনশ্বর উপলব্ধির অনিবার্যই শব্দমালার ভেতর দিয়ে মানবিকবোধের প্রকাশ পায় কবিতায়। পাঠক জীবন-জগতের অনিবার্য সত্যের ভাবগত উপলব্ধি করেন। যিনি বাইরের জগৎকে গভীর পর্যবেক্ষণ করে আপন মনের কল্পনা-মাধুরী মিশিয়ে অবশ্যম্ভাবী শব্দবিন্যাসে ছন্দোবদ্ধ ও শিল্পসংগত ভাষিক রূপদান করেন তিনিই আসলে কবি। আর মানব মনের ভাবনা কল্পনা অনুভূতি যখন যথাচয়িত শব্দবিন্যাসে চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় গভীরতর ভাবমূলক রূপ লাভ করে তখন তাই কবিতা। পাঠকের কাছে যা ধরা দেয় নব সুরে, নব ঝংকারে, নব অনুভবে। পাবলো নেরুদা, লোরকা, বোর্হেস, সিলভিয়া প্লাথ নানাজনের কবিতা চারদিকের মানুষের জীবনেরই প্রতিধ্বনি করে। নিকোনোর পাররার প্রতিকবিতায় জীবনকেই ভিন্নভাবে দেখে।

র‍্যাঁবো-বোদলেয়ার প্রভাবিত যে কবিতার বাস্তবতা তা এ ভূখণ্ডের নৈতিক বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। উপনিবেশ শাসনে এতদ্ অঞ্চলের হাজার বছরের কাব্যধারা প্রায় উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। আধুনিকতার শিরোনামে এ দেশের কবিতা আরেক মূল্যবোধে এগিয়ে চলে। আধুনিকচর্চার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে

বিদ্যমান থাকে ইউরোপীয়করণ। টিএস এলিয়টের কবিতায় কখনো কখনো জীবনের অবক্ষয়ই বড় হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আলো-আঁধারি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কবিতার অর্থ কী তাহলে পাঠক অর্ধেক বুঝবে আর অর্ধেক বুঝবে না। জীবনানন্দ দাশের রূপময়তা, আলো-আঁধারি, চিত্রময়তা শিল্পমাধুর্যে প্রত্যুজ্জ্বল। তিনি সমস্ত কিছু দিয়েই এক অলোক আনন্দস্পর্শ ছড়িয়ে দেন। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাগুলোতে ইউরোপীয় রীতির সঙ্গে এদেশের ঐতিহ্যমূলক বিষয়ের এক মেলবন্ধন তৈরি হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কবির প্রকাশক্ষম প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন—

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক কবি বিরচন
গীতরসধারা কবি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।

কবির হৃদয়েবেদ্য ভাবনা ও কল্পনা যখন পাঠক হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলে তখনই হয়ে ওঠে কবিতা। পাঠক মুগ্ধতায় অনুভব করে কবির নিজস্ব মানসরসে সঞ্জীবিত চিত্রাত্মক ভাবকল্প। সে ক্ষেত্রে কবিত্বের প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়ায় কল্পনা। কল্পনাশক্তিকে নৈসর্গিকী ও সহজাত বলেও সংস্কৃত আলংকারিকগণ অভিহিত করে থাকেন। আর বাস্তববিবর্জিত অতিকল্পনাকে প্লেটোর মতো অনেকেই নিন্দা জানিয়েছেন। সৌন্দর্যচিন্তাকে কাব্যের প্রাধান্য দিয়েছেন। রোমানের ওভিদ, ফরাসির পল এলুয়ার, জার্মানির গুন্টার গ্রাস, স্প্যানিশ ওক্তাবিও পাস, রুশ আন্না আখমাজোভা, ইংরেজি রবার্ট ফ্রস্ট, ফিলিস্তিনি মাহমুদ দারবিশসহ নানাজনের কবিতায় ব্যক্তি অনুভবই প্রকাশ করে।

কবি অচেতন ও অবচেতন মন থেকে সজ্ঞানের চিন্ময়াবস্থা বা কনসাসনেস থেকে ভাষা নির্মাণ করেন। তার কাছে আবির্ভূত হতে থাকে অনুভব ও বাণীর ফল্গুধারা। চেতনা, ভাব ও ভাষায় তৈরি করে অপরূপ সৌন্দর্যের দ্যোতনা। গভীর জীবনবোধ তাকে তাড়িত করে। নারীরা যেমন রূপ, অবয়ব, ইঙ্গিত, সাজসজ্জা, প্রসাধনে নিজেকে অপরূপ করে তোলার প্রয়াসী হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি কবিও তার কবিতায় ভাষা, অনুভব, শব্দে, ছন্দে, উপমায়, চিত্রকল্পে অনুভূতির নিবিড়তায় অপরূপ ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। কখনোই তত্ত্ব, তথ্য, নীতিপ্রচার, রাজনীতি বা ধর্মনীতি কাব্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে না। সে জন্য আর্নল্ড মাথু মনে করেন কবিতা মূলত মানবসমাজের নতুনতর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ক্রিটিসিজম অব লাইফ বা জীবন জিজ্ঞাসা। কবিতা

গদ্য-পদ্য দু'ভাবেই হতে পারে। কবিতা ভাবকে দৃশ্যকল্পে রূপান্তর করে। পাঠক সে দৃশ্যকল্পের রসাস্বাদন করে। ছন্দই কি কবিতাকে পাঠকের অন্বিষ্ট করে? কিংবা ছন্দের কারণেই কি কবিতা পাঠকের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে? তাই কবিতায় ছন্দ কি খুব জরুরি? ছন্দ দীর্ঘকালের একটি প্রশ্ন। কবিতায় বাস্তবসত্য না থাকলেও কবিতা জীবনের অনিবার্য সত্যকে ইঙ্গিত করে। তখন কবিতা ও দর্শনের রূপভেদ অনেকটা কমে আসে।

কবিতা কবিকে কী দেয়? অর্থ-বিত্ত, সম্মান। হয়তো কিছুই না। কিন্তু ওই যে অনুকরণ, জীবনের সত্য ও উপলব্ধির প্রকাশ করার প্রবণতা মানুষের সহজাত। পাঠককে নির্মল আনন্দ, সৌন্দর্য, বোধ, সত্য উপলব্ধি ছাড়া হয়তো খুব বেশি কিছু দেয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'পুরস্কার' কবিতায় স্ত্রী আক্ষেপের স্বরে কবিকে বলেন—

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব
না মিলে শস্যকণা!

কবি কিছু না পেলেও পাঠককে কিছু জানাতে চান কবি। কবিতাকে ভালোবাসেন কবি। কবিতায় থাকে উপলব্ধির বহুমাত্রিক প্রকাশ। আবার বাক্যকে উল্টাপাল্টা লিখে ব্যায়াম করালেই কবিতা হয় না। কবিতায় থাকতে হয় কাব্যগুণ। যে বাক্যবন্ধ থেকে আক্ষরিক অর্থ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না, তা কখনো কাব্য বলে গণ্য হতে পারে না। তা পাঠককে কল্পনার স্রোতে ভাসাতে পারে না। অনেক সময় কাব্যে অশ্লীলতা থাকে। এ ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। সতর্ক থাকতে হবে ভাব-ভাষা জীবনকে ক্ষতিকর দিকে গেল কী না? তবে কবিতা জীবনের সত্যের নান্দনিক প্রকাশ দাবি করে। কিটস-শেলির কবিতার নন্দনে সত্যই সুন্দর আর সুন্দরই কবিতা। কবিতায় থাকবে উঁচুতর ভাষা। কবি নিজে নিজেরই সাথে কথা বলেন কবিতায়। পাঠক আড়াল থেকে শুনে ফেলে মাত্র।

হাজার বছরের এ ভূখণ্ডের কবিতায় ভাবের রূপকল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। পাঠক তার রস্বাদন করেছে। চর্যাপদের প্রতীকবাদী কবিতা বা কাব্যসংগীতগুলো যেন সাধকদের হৃদয়ের গভীরকে স্পর্শ করে। বৈষ্ণব পদাবলির কবিতাগুলো আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেদনার অপরূপ সুখানুভূতির

সৃষ্টি করে। কিংবা ইসলামের মর্সিয়াগুলো শোকাতুর সৌন্দর্যকল্পিত ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। ইউরোপীয় অনুশাসনে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ধারায় ছেদ পড়ে। বিংশ শতকের শুরু থেকেই ইউরোপীয় র‍্যাঁবো-বোদলেয়ার কিংবা মালার্মে নানামুখী প্রতীকবাদী ইউরোপীয় ধারায় প্রত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভারতীয় যে নন্দন তা যেন বিস্মৃত হতে থাকে। তবু জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম, মলয় রায়চৌধুরী, সুবোধ সরকার নানাজনের সংশ্লেষাত্মক অভিব্যক্তিতে কবিতায় জীবন নতুনভাবে উঠে আসে। আর কবিতা হয়ে ওঠে ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র পরিবর্তনের অনস্বীকার্য অনুষঙ্গ। হাজার বছরের বাংলায় কবিতা পাঠককে নতুন চিন্তা উদ্দীপনা ও ভালো লাগার বন্ধনে বেঁধেছে। একদিকে ঐতিহ্য, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সাথে নতুন স্থান-কালের প্রেক্ষিতে কবিতা তখন জীবনেরই আরেক প্রতিভূ। সমাজের নানা অসংগতি, জীবনের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ব্যক্তিমানসের চাওয়া-পাওয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কবিতা। কবিতা একাধারে ভাবের বিষয়ও নয়; আবার আন্দোলনের স্লোগানও নয়। কবিতা অনুভব-অনুভূতির বিষয়; যার অতল স্পর্শ পাঠক হৃদয়কে আন্দোলিত করে। পাঠক আত্ম-আনন্দ আর জীবনমুক্তির অনিবার্য সত্য হিসেবে কবিতাকে গ্রহণ করতে থাকেন অনায়াসে। তাই কবি ও পাঠক কবিতার পাঠসূত্রের ধারায় হয়ে ওঠেন একীভূত। বাংলার ইতিহাসে প্রতি যুগে কবিতা হয়ে উঠেছিল বাঙালির মুক্তির শক্তি। এ আলোচনার পরিশেষে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দিয়ে অনুভব করা যেতে পারে কবিতার শক্তি—

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম কৃতদাস থেকে যাবে। ...
সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২. শীশচন্দ্র দাস, সাহিত্য সন্দর্শন, সুচয়নী পাবলিসার্স, ঢাকা।
৩. ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থমেলা, কলকাতা।
৪. প্লেটোর 'রিপাবলিক', অনুবাদ সরদার ফজলুল করিম, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৫. *আরিস্টটলের কাব্য নির্মাণকলা*, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত পোয়েটিক্সের অনুবাদ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
৬. *হোরেসের কাব্যতত্ত্ব*, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৭৯।
৭. *লুঙ্গিনুসের সাহিত্যতত্ত্ব*, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৭।
৮. *এবারক্রম্বির সাহিত্য সমালোচনা*, আবু তাহের মজুমদার অনূদিত বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭।
৯. ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব, সুধীরকুমার নন্দী অনূদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬
১০. রাশিদ আসকারী, *উত্তরাধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনা তত্ত্ব*, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ফ্রেন্ডস বুক কর্নার, ২০০৩।
১১. চিরঞ্জীব সুর সংকলিত *'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা'* আলোচনা চক্র, কলকাতা
১২. আফজালুল বাসা অনুবাদিত *'বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব'* বাংলা একাডেমি, ঢাকা
১৩. মোস্তফা আহাদ সম্পাদিত *'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি'* ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা।
১৪. Alexander Pope, *An Eassy on criticism* (1711), Oxford University Press. London
১৫. Matthew arnold, *`Essays in Criticism' (1865),* Internet Archieve, Ebook.
১৬. T Y Northrop Frye, *Anatomy of Criticism*, Princeton, New Jersey, 1973

[প্রবন্ধটি 'প্রতিধ্বনি' সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত। সম্পাদক-শাখাওয়াত টিপু।]

‘রসুলবিজয়’ কাব্য
অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এক ইতিহাস

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাংলা সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রভূমি ছিল গৌড়-বঙ্গ। যে তথ্য প্রচলিত ইতিহাসে নেই। গৌড়ের রাজধানী বলতে আজকের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার ফিরোজপুর ও তার পার্শ্ববতী অঞ্চলকে বুঝায়। আজকেও সে ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ দারাজ বাড়ি মাদ্রাসা, দারাস বাড়ি মসজিদ, খানিয়া মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, কোতয়ালী দরজা, তাহা খানা প্রভৃতি স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। এ অঞ্চলে আনুমানিক ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি কবি জৈনন্দিন রচনা করেছিলেন ‘রসুলবিজয়’। কাব্যটি সেসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং মুসলমানদের ঘরে ঘরে পঠিত হতো। ‘রসুলবিজয়’ কাব্যের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, একই চেতনায় পরবর্তী সময়ে শেখ চাঁদ, সৈয়দ সুলতান, শাহ বারিদ খান প্রমুখ কবিগণও ‘রসুলবিজয়’ নামে স্বতন্ত্র কাব্য রচনা করেছেন। সনাতন ধর্মীয়দের মধ্যেও বিজয় ধারা নামে সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। বিজয়ধারার কাব্যগুলো হলো—মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চূড়ামনি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়, কবি মুকুন্দের জগন্নাথবিজয়, ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় বা সত্যপীরবিজয়, শেখরের গোপালবিজয়, বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পাণ্ডববিজয় ইত্যাদি। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আদি মধ্যযুগের প্রতিনিধিত্বশীল এ ‘রসুলবিজয়’ কাব্যটির কোনো ছাপা বই বাজারে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন বাংলায় জ্ঞানচর্চার মাধ্যম ছিল হাতে লেখা পুথি (পুস্তক)। এ অঞ্চলে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা, সংস্কৃত বা আরবি-ফারসি সব গ্রন্থই হাতে লেখা হতো। এ গ্রন্থগুলো দিয়েই শিক্ষা-দর্শন-জ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা হতো। আজকের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির মতোই শিক্ষক-ছাত্র-চিকিৎসক-ব্যবসায়ী প্রায় প্রত্যেক ভদ্রঘরেই পুথির সংগ্রহ থাকত। প্রাচীনকালে পুথি নকল করা পেশা হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ ছিল। অনেক গৃহিনী নারীও পুথি লেখার ব্যবসা করে জীবনধারণ করত। এমনকি পুথি নকলের ব্যবসা এত জমজমাট ছিলো যে অনেক অশিক্ষিত লোকও শুধু হস্তাক্ষরের জোরে পুথি নকলের ব্যবসা করত। উপনিবেশ যুগে মুসলমানদের পুথিকে চরমভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে। (ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-৪৪) মুসলমানদের পুথিগুলো সাধারণত কোনো ছাপাখানায় স্থান পায়নি। উনবিংশ শতকে যুদ্ধবিষয়ক কিছু পুথি ছাপার সুযোগ পেলেও সেগুলো 'বটতলার পুথি' 'দোভাষী পুথি' বলে তাচ্ছিল্যের স্বীকার হতে হয়েছে। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সংগ্রহের নামে মুসলমানদের পুথি নিয়ে ধ্বংস করে দিতো বলেও এমন নানা কথা শোনা যায়।

আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রায় ১৭০০টি পুথি (পুস্তক) সংগ্রহ করেছিলেন। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ যদি মুসলমানদের লেখা পুথিগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ না করতেন তাহলে অতীত বাংলাদেশে মুসলমানরা যে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করত তার ইতিহাসই থাকতো না। জৈনুদ্দিন রচিত 'রসুলবিজয়' কাব্যটির তথ্য প্রথম পাওয়া যায় আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'প্রাচীন পুথির পরিচয়' গ্রন্থে। সেখানে তিনি লেখেন—'ইহা নবীবংশসম্বন্ধীয় একখানি সুন্দর গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। কেবল নবম হইতে ৬৩ পত্রগুলির অস্তিত্ব আছে। অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহির আকারে বৃহৎ পুথি। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতিলিপির তারিখাদি অজ্ঞাত (প্রাচীন পুথির পরিচয়, পৃষ্ঠা-১০৬)। এ 'রসুলবিজয়' কাব্যের একটি মাত্র পাণ্ডুলিপিই পাওয়া গেছে।

১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র শীত সংখ্যায় আহমদ শরীফ এ 'রসুলবিজয়' নিয়ে সম্পাদনামূলক একটি লেখা প্রকাশ করেন। সবেধন নীলমনি এইটুকুই। সে পত্রিকার পাঠ অনুসরণে বই আকারে কেউ কেউ প্রকাশের উদ্যোগ নিলেও তা বেশিদূর এগোয়নি।

পুথিটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে। তা দেখাও অনুমতি সাপেক্ষ এবং তার যথাযথ সম্পাদিত কোনো বইও বাজারে নেই।

কাব্যটি বুঝতে বিভিন্নজনের প্রবন্ধের আশ্রয় নিতে হয়। আহমদ শরীফ মন্তব্য করেন পুথিটির হাতের লেখা এতো বিশ্রী যে তা অবিশ্বাস্য রকমের দুষ্পাঠ্য। লিপিকাল বা লিপিকরের নাম না থাকলেও হস্তাক্ষর হিসেবে তা পেশাদার লিপিকর কালিদাস নন্দীর লেখা। (প্রাগুক্ত সাহিত্য পত্রিকা, পৃষ্ঠা-১১৫)। অথচ এই পুথিটি গবেষণার মধ্যে সম্ভাবনা হয়েছে তৎকালীন সাহিত্যচর্চা, ইতিহাসের বাস্তবতা, সাহিত্যধারায় তার গুরুত্ব কিংবা ইতিহাসের নতুন সত্য উদ্ঘাটনের নানামুখী সম্ভাবনা। ডক্টর এনামুল হকসহ ছোট্ট পরিসরে যে দু-একজন কথা বলেছেন তা আহমদ শরীফের পাঠ ও ব্যাখ্যা ধরেই।

'রসুলবিজয়' কাব্যের রচিয়তা কে এই জৈনদ্দিন? কাব্যে রচিয়তার ভণিতায়—জনুদ্দিন, জএনুদ্দিন, জয়দ্দিন, জএনুলদ্দিন ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। ভণিতায় নিজেকে আবার হীন, মুর্খ, শিশু বলে সরলতা প্রকাশ করেছেন। কবি জৈনুদ্দিনের বাড়ির সম্ভবত গৌড় অর্থাৎ বর্তমান চাপাইনবাবগঞ্জে ছিল। তার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম—পদ্মাপাড়ের প্রকৃতি তার কাব্যে অনবদ্যভাবে প্রাণ পেয়েছে। জাউলা বা জেলের বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কেউ এমন ভাবে দিতে সাধারণত সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়ত তার ভণিতায় উল্লেখ অনুসারে তিনি শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের আদেশে 'রসুলবিজয়' কাব্যটি রচনা করেছেন।

হীন জএনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালির ছন্দ
শুনি গুণীজন মনে ঝরে মকবৃন্দ।
দানে ধর্মে হরিশচন্দ্র মান্যগুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুক্ত ইছুপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলু পাঞ্চালি সন্ধান।

এই 'ইছুপ খান' ইতিহাসে পুরো নাম শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ। তিনি ছিলেন সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহের পুত্র ও উত্তরসুরি। শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ১৪৭৪-৮২ পর্যন্ত গৌড়ের শাসনকর্তা ছিলেন। সে অনুসারে

তিনি নিশ্চয় গৌড়ের রাজদরবারে বসবাস করতেন। যা আজকের চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার ফিরোজপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে নির্দেশ করে। শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহর সময়ে প্রতিষ্ঠিত দারাস বাড়ি মাদ্রাসার ভগ্নাবশেষ এখনো বর্তমান আছে। শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। ইসলামী শিক্ষা-সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাছাড়াও তার কাব্যভাষায় কিছু প্রাচীন বঙ্গ-চট্টগ্রামের শব্দ আছে—হমাইতে, উয়াস, থু, থোন, ধাবাম, বুড়তি, আতাক্ষ্যা, পোলাদি ইত্যাদি।

ওয়াকিল আহমদের তথ্যমতে, জৈনদ্দিনের পিতার নাম ছিল মৈনুদ্দীন। তিনি ও তার পিতা ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকর সিদ্দিকীর বংশধর বলে দাবি করতেন। (বাংলাপিডিয়া)। সেসময়ে সাহিত্যচর্চার তথ্য হিসেবে 'সফরনামা' নামের এক কাব্য সংকলনের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সংকলনের রচিয়তা ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী জইনউদ্দীনকে 'মালেকুল শোয়ারা' বা রাজকবি বলে উল্লেখ করেছেন। (উদ্ধৃত, আহমদ শরীফ। সাহিত্য পত্রিকা, পৃষ্ঠা-১২২) সম্ভবত সে কারণেই তিনি গৌড়ের রাজ দরবারের শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহর সভাকবি ছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়।

সেসময় আরবীয় দেশগুলো থেকে বাংলায় এসে অনেকেই বাংলা শিখে বাংলায় কাব্য রচনা করতেন। কিন্তু কবির কাব্যভাষা দেখে অনুমান করা যায় তিনি মহাভারত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনার সঙ্গে 'রসুলবিজয়' কাব্যের যুদ্ধবর্ণনার বৈচিত্র্যগত সাদৃশ্য মহাভারতের প্রচ্ছন্ন প্রভাবকেই স্বীকার করে। কবির কাব্যভাষায় নানা প্রতীক ও প্রতীকী শব্দ এদেশীয় চিত্রকল্পকে তুলে ধরে। তাছাড়া জৈনদ্দিন যদি ভিনদেশি হতেন তাহলে তার ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ বেশি থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কাব্যটিতে তা নেই। যেহেতু কাব্যটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় এবং ভারতীয় পুরাণ ঐতিহ্য ঘেঁষা, সেজন্য তিনি জন্মগত ভাবে এদেশীয় ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রাপ্ত পুথিটি খণ্ডিত বলে পুথির প্রকৃত নাম কী তা জানা যায় না। তবে লেখকের বিভিন্ন ভণিতায় 'রসুলবিজয়' শব্দদ্বয় দেখে আব্দুল করিম সাহিত্য

বিশারদ নাম হিসেবে ধরে নিয়েছেন 'রসুলবিজয়'। (প্রাচীন পুথির পরিচয়, পৃষ্ঠা-১০৬)। ভণিতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

রসুলবিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
মনে প্রীতি বাসিল সভান।
বা,
রসুলবিজয় বাণী সুধারস ধার
শুনি গুণিজন মন আনন্দ অপার।

আহমদ শরীফ অনুমান করেন জৈনুদ্দিনের এ 'রসুলবিজয়' কাব্যের রচনাকাল ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ। (সাহিত্য পত্রিকা, পৃষ্ঠা-১০৬)। এর পরে ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা সমাপ্ত হয়েছিল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কাব্যে ব্যবহৃত ইউসুফ শাহকে নিয়ে ভণিতা, ভাষার রূপ, শব্দ, অলংকার ও লেখকের ভণিতা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। কী আছে 'রসুলবিজয়' কাব্যগ্রন্থে। এ কাব্য মূলত হযরত মুহাম্মদ (স) এর যুদ্ধজয়ের ঘটনা। যদিও কাব্যের বর্ণনায় যুদ্ধগুলি ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধ ও তার সন তারিখ স্পষ্ট করে তুলে না।

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে অধ্যায় বিভাজন এমন—প্রথম অধ্যায়ে 'রসুল পক্ষীয়দের রণসজ্জা' পরের অধ্যায়ে 'জএকুমের রাজ্যে রসুলের প্রবেশ', উভয়পক্ষে পুনঃ যুদ্ধায়োজন, তারপরে যমক ছন্দে যুদ্ধ বর্ণনা বিবৃত হয়েছে। প্রথম যুদ্ধ যমক ছন্দে, দ্বিতীয় যুদ্ধ দীর্ঘছন্দে, তৃতীয় যুদ্ধ খর্বছন্দে, চতুর্থ যুদ্ধ আবার জমক ছন্দে বর্ণিত হয়েছে। তারপরের অধ্যায় 'জএকুম রাজার পরিখা যুদ্ধের উদ্যোগ'। এরপরে 'আলির উদ্ধার সাধন।' এ পর্বটিও জমক ছন্দে রাগভূপালিতে বর্ণিত। এ পর্বে জএকুম রাজা ধৃত হন এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তারপরে 'পুনরায় আলির যুদ্ধারম্ভ' শুরু হয়। তবে শেষ পর্ব বা অধ্যায়টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে অনুভূত হয়। কখনো কখনো কারবালার যুদ্ধের ঘটনা সঙ্গে সদৃশ বলেও মনে হয়। এরপর পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত। যুদ্ধ বর্ণনাই যেন কাব্যের মূল চেতনা। কাব্যের পঙ্‌ক্তিগুলো এরকম—

কহিতে এ যুদ্ধ হএ পুস্তক বিস্তার
তেকারণে না লেখিল সে সব কথন
কিঞ্চিত সংক্ষেপে কহি গুণ গুণিগণ। (প্রথম যুদ্ধ)
বা,
পুস্তক বিশাল দেখি না লেখিল আন
শেল শূল ভাঙ্গি গেল লইল কৃপাণ। (তৃতীয় যুদ্ধ)

'রসুলবিজয়' কাব্যে হযরত মুহাম্মদ (স) পক্ষীয়রা যে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ তার নাম জয়কুম রাজা। এ 'জয়কুম' বা 'জএকুম' আসলে কে? প্রকৃত অর্থে ইতিহাসে জয়কুম নামে কোনো রাজার নাম পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত কাব্যটির পাঠে অনুভব করা যায় কবি যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নবীজী বা ইসলাম ধর্মের যুদ্ধ-গৌরবগাথাকে তুলে ধরতেই প্রয়াসী ছিলেন। সে হিসেবে জয়কুম একটি কাব্যিক নাম মাত্র। কিন্তু কাব্যের বর্ণনার সঙ্গে নবীজীর তাবুক যুদ্ধের অনেকটা মিল আছে। ফলে কবি হয়ত সেই তাবুক যুদ্ধের কথাই বলেছেন। তাবুক যুদ্ধ হয়েছিল বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে। কাব্যে যেখানে খোরাসান, এরান প্রভৃতি শব্দ আছে। কিংবা, এও হতে পারে যেহেতু পাণ্ডুলিপিটির লেখার বয়স ২০০ বছরের পুরোনা নয় এবং লিপির ভাষাও দুষ্পাঠ্য (আহমদ শরীফের মতে)। তাই অনুলিপিতে লিপিকর কী অন্য কোনো নামকে জয়কুম বলে অভিহিত করেছেন কি না? যেখানে লিপিকর কাব্যের লেখকের নামকেই ৬/৭ রকম করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে লিখেছেন। অনেক সময় দেখা যায় জনপ্রিয় রচনার ভাষা লিপিকর পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়েও ভিন্ন রূপ হয়ে গেছে। যেমন—বৈষ্ণব পদাবলী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ। এসব নানা কারণেই স্পষ্ট হয়ে উঠে লিপিকরের বিভ্রান্তি থাকাটাও স্বাভাবিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত পুথিটি দেখা প্রায় অসম্ভব। শত চেষ্টা করেও অনুমতি মেলে না। সেজন্য এখন পর্যন্ত কাব্যটি পাঠের আশ্রয় নিতে হয় আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের পুথিপরিচিতি ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত আহমদ শরীফের সম্পাদনা পাঠ ও পাণ্ডুলিপিতে। এছাড়া কিছু ইতিহাস গ্রন্থেও নানামুখী তথ্য আছে।

আহমদ শরীফ অবশ্য জয়কুম রাজাকে ইতিহাস সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তা হলো—king of Armenia। যা খ্রিষ্টান রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এর সময়কাল নিয়েও নানা গণ্ডগোল আছে। মধ্যযুগের আরেক কবি সৈয়দ সুলতান 'জয়কুম রাজার লড়াই' নামে একটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থও লিখেছেন।

'রসুলবিজয়' কাব্যটি খণ্ডিত। সেক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে মূল অংশে হয়ত জয়কুমের প্রকৃত পরিচয় ছিল। কাব্যটিতে জয়কুমের সঙ্গে যুদ্ধে

জয়লাভের পরপরই হঠাৎ করেই মনে হয় কারবালার মতো ভিন্ন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এতে বুঝা যায় যুদ্ধের বা রাজার নাম মূখ্য নয়। যুদ্ধজয়ী মুসলিম বিজয়ী শক্তি বিষয়টি বুঝানোই মূখ্য। কারণ পরবর্তী সময়ে বিজয়ধারার সাহিত্যগুলোতে যুদ্ধভিত্তিক কাব্য রচনায় শোর্যবীর্য দেখানোই মূখ্য বলে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল। কাব্যটি পাঠে এও মনে হয়েছে যে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি যেভাবে বাংলাকে দখল করেছিল বা মুসলমানরা ভারত যেভাবে জয় করেছে তারই একটি প্রচ্ছন্ন চিত্রই এ 'রসুলবিজয়' কাব্য। আরো প্রমাণ গাঢ়তর হয় যখন কাব্যে নানা প্রতীক—নৌকা, জালিয়া, গদা ইত্যাদিতে মুসলমানদের জয়ের কথা ঘোষিত হয়। মুসলিম সংস্কৃতির নানা বিষয় যেমন—পীরমাহাত্ম, নানা আচরণসহ হালুয়া রুটির কথাও উল্লেখ আছে। তবে হিন্দুবোধের দৃষ্টিভঙ্গিতে কাব্যছাপ স্পষ্ট। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উল্লেখ আছে এভাবে—

একেত গোপত হএ গোপত প্রচার
তুহ্মি সব হেরি রহ নিচিন্ত হইয়া
মোর নিজ সখা পরে দরুদ রাখিয়া।
শুনিয়া ফিরিস্তা সব এথকে কথন
ছজিদা করিয়া সব ভাবে নিরঞ্জন।
হীন জএনুলদ্দিনে কহে ভাবি একেশ্বর
কে বুঝিতে পারে তার অনন্ত মহিমার। (আলির পরিখায় পতন)

অন্য আরেক পঙ্‌ক্তিতে—

মুমীন আইল দেশে দীনের নাগরা বাজে
দুন্দুমির শব্দ গেল দূরে। (জয়কুম রাজার যুদ্ধ উদ্যোগ)

কাব্যের প্রায় শেষাংশে জএকুমের পরাজয় ও ইসলামের প্রচার ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা দেখানো হয়েছে।

মুসলমান হৈবা কিবা যাইবা যমপুর
নবীর বচন শুনি নিজ মনে শুনি
ভ্রুকুটি করিয়া সবে কহে পুনি পুনি
কাতর বচন কহে কর পরিত্রাণ
না মারহ মহাশয় আনিমু ইমান। (আলির উদ্ধার সাধন)

যা হোক, ঐতিহাসিক বীরগাথা বা যুদ্ধকাব্য হিসেবে 'রসুলবিজয়' অনবদ্য। যদিও যুদ্ধজাতীয় বা জঙ্গকাব্যে কবির কাব্যিক প্রকাশ মাত্রার চেয়ে যুদ্ধের ভয়াবহ আবহের বাস্তবতা বেশি প্রাধান্য পায়। কিন্তু কবি জৈনদ্দিনের 'রসুলবিজয়' এ কাব্যিক সুষমা লক্ষ্য করা যায়। নানাভাবে নানা চিত্রকল্প যুদ্ধের ভয়াবহতাকে নিরূপন করেছেন। যুদ্ধের বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ও কাব্যিক। যেমন—

১) সিংহ ব্যাঘ্র চমকিত ধাএ কর্ণ তুলি।

২) তা দেখিয়া বীরবরে খেদিয়া খেদিয়া মারে
যেন সব বরাহের গতি।

৩) আছিল লক্ষ লক্ষ গজ তার কলেবর
কুম্ভকর্ণ সম দৈত্য মূর্তি ভয়ঙ্কর।

৪) শুনিয়া জএকুম চিত্র হইলেক বিষাদিত
বোলে ডাক মোর পুত্রগণ।

৫) বিষম আরবগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া মন
যথ সৈন্য করিলা সংহার।

কাব্যে ভক্তি ও জীবনবোধ অনবদ্য। নানা উপমা লক্ষ্য করা যায়—

ক) গরুড় সদৃশ শর বিদ্যুৎ সঞ্চার।

খ) সিংহের সৌরভে যেন পলাএ কুরঙ্গ।

গ) দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প ধরেত আনিলা

ঘ) সৃষ্টি নষ্ট হৈল রক্তমান কৈল ক্ষিতি। ইত্যাদি

কখনো ছন্দের কৃত্রিমতাও লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অসমান পয়ার রয়েছে। ত্রিপদীর ক্ষেত্রেও অসমতা লক্ষ করা যায়। যেমন—

অশ্বের উপরে সোর নবী তুলি বান্ধে জীন
তুরিতে চালায় রথ চলে দিন দিন। (অসমান পয়ার)
কিংবা
জএকুমের সৈন্য যবে জঙ্গ দিলা দেখি তবে
আইলেন্ত নবীর গোচর। (অসমান ত্রিপদী)

কবি জৈনদ্দিন 'রসুলবিজয়' কাব্যটিকে রচনারীতির দিক থেকে পাঞ্চালি রীতি বলে ভণিতায় বারবার উল্লেখ করেছেন। পঞ্চালি রীতিটি কী? এটা কি

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলায় পাঁচালি নামে যে সাহিত্য পরিবেশনা রীতি পাওয়া যায় তার পূর্ব নাম? কিন্তু পাঁচালি রীতির গঠনগত পদ—বোলাম-দিশা প্রভৃতি 'রসুলবিজয়' কাব্য দেখা যায় না। কাব্যভাষায় উল্লেখ—

শ্রীযুক্ত ইছপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলুম পাঞ্চালি সন্ধান।
বা
তান পদ রেণু লৈয়া নয়ানে কাজল দিয়া
জয়দ্দিনে রচিল পএয়ার। (উভয়পক্ষে পুনঃ যুদ্ধায়োজন)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ১টি মাত্র পুথির আবিষ্কার বাংলা সাহিত্য ইতিহাসকে যেভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে। সে তুলনায় 'রসুলবিজয়' কাব্যের পুথির তথ্যই ইতিহাসে নেই। সেজন্য ইতিহাসকরণ প্রক্রিয়া আলোচনা জরুরি। ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসনের শুরুতে ১৮১৭ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জেমস মিল 'দ্য ব্রিফ হিস্টি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' নামে যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন তাই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ইতিহাসচর্চার আদর্শ। এ গ্রন্থটি ব্রিটেনের ইতিহাসের অন্ধ অনুকরণ। ইউরোপীয় ফরমেটে এদেশীয় ঘটনাবিন্যাসকে প্রাচীন যুগ, অন্ধকারযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে বিভাজন করেছেন। এ গ্রন্থে বিবৃত যুগবিভাজন, সময় ও বিষয় বিন্যাস এদেশীয় সমাজ-বাস্তবতা ও রাজনীতি অনুসারে কতটা যৌক্তিক তা কেউ কখনো প্রশ্ন তুলেনি। ইতিহাসকরণে তথ্যগত জায়গা থেকে উপেক্ষা করা হয়েছে পূর্বতন ইতিহাসবিদ-সদরউদ্দীন হাসান নিজামী, মিনহাজ-ই-সিরাজ, জিয়াউদ্দিন বারানী, খাজা নিজামুদ্দিন, মুহাম্মদ কাসিম প্রমুখের গ্রন্থকে। সেময় সনাতন শিক্ষিতমহলে ইতিহাসকরণ নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আফসোস করতেন এই বলে যে, 'এ দেশের ইতিহাস নাই, ইতিহাস লিখিতে হইবে'। অনেকেই ধুয়া তুলতেন 'মুসলমানের লেখা ইতিহাস যে মানিবে সে বাঙালি না।' কিন্তু আন্দোলনের ফলে যে ইতিহাস লেখা হলো তা কেমন? তা মূলত হিন্দু পুরাণবাদী ঐতিহ্যের জাগরণমুখী ইতিহাস।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব রয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্নের সনাতনধর্মী বাংলা বইয়ের বিবৃতিমূলক গ্রন্থকে অনুসরণ করে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি

করেন। দীনেশচন্দ্র সেন তার ইতিহাস গ্রন্থ রচনার জন্য যে তথ্য-উপাত্ত নিয়েছেন তা ওই সময়ের খ্রিষ্টান ধর্মযাজক জে লঙ-এর লিস্ট থেকে। যে লিস্টটি ছিল সেসময়ের সনাতন ধর্ম আশ্রিত বইয়ের তালিকা। সেসময় মুসলমানদের বইয়ের তালিকাও ছিল। কিন্তু তিনি তা নেননি। ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমানদের গ্রন্থ পুরো বাদ পড়ে যায়। উপনিবেশকালে সাহিত্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অনেকেই দীনেশচন্দ্র সেনকে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। দীনেশচন্দ্র সেন পরবর্তী সময়ে আলাওলের 'পদ্মাবতী' নামটি যোগ করেছিলেন। যদিও পরে 'মুসলমানি সাহিত্য' নামে আলাদা একটি গ্রন্থ রচনা করে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের বিবরণে সে সনাতনী ১৪০০ বইয়ের তালিকার ঘরানায়ই রয়ে গেছে। এমনকি রোমান্টিক প্রণোয়োপাখ্যান শিরোনামে আরাকান বা চট্টগ্রামে ধারায় মুসলমানদের সাহিত্যচর্চাকে তথ্যবদ্ধ করে ইতিহাসের মূল স্রোত থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। যেমন—শাহ মুহম্মদ সগীর তার 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্যটি গৌড়াধিপতি সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) তত্ত্বাবধানে রচনা করেন। তিনি ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সভাকবি। আর গৌড়ের সুলতানের সভাকবি হিসেবে তিনি খুব সম্ভবত আরাকানে বসবাস করতেন না। অর্থাৎ ইতিহাসে তাকে আরাকানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টা যেন এমন—এ বাংলা অঞ্চলে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুধু সনাতন ধর্মেই হয়েছে। অথচ সত্য যে, গৌড়ের সুলতানরা শাসকরাই সবচেয়ে বেশি সনাতনদের সাহিত্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যা হোক, প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যচর্চায় মুসলমানদের গৌরবময় অবদানের কথা। কিন্তু সাহিত্য ইতিহাসে তা উপেক্ষিত। উপনিবেশযুগে মুসলমানদের সাহিত্য বলতে শুধু আরবি-ফারসি শব্দাশ্রিত লেখাগুলোকে চিহ্নিত করার প্রবণতা ছিল এবং দোভাষী পুথি নামকরণে তাচ্ছিল্যও করা হতো। সনাতনধর্মীরা বাংলায় সংস্কৃতচর্চাকে প্রাধান্য দিতো। তারপরও কৃতিত্ব পায় সনাতনধর্মী সাহিত্যকর্মগুলোই। মুসলমানরা যে বিশুদ্ধ বাংলা শব্দে, বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন তারই উল্লেখযোগ্য নমুনা জৈনুদ্দিনের 'রসুলবিজয়' কাব্য। এখনো রাজশাহী জেলার চাপাইনবাবগঞ্জের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সুলতানী আমলের ধ্বংসাবশেষ।

সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ প্রথম বাংলার জনপদগুলোকে একত্র করে অখণ্ড 'সুবে বাঙলা' নামে রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিই হয়েছিল সেসময়। বাংলা ভাষা রাজকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি সামাজিক স্তরেও বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা বিদ্যমান ছিল। বাংলা বর্ণমালা নিয়েও নানা নিরীক্ষা হয়েছিল। তবু তা যেন ইতিহাসে উপেক্ষিত। যা হোক, ভবিষ্যতে সুলতানী আমলের 'রসুলবিজয়' কাব্য, কিংবা দারাস বাড়ি মাদ্রাসা বা গৌড়-বঙ্গ কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা-শিক্ষার স্বরূপ অন্বেষার গবেষণায় আবিষ্কার হতে পারে ইতিহাসের নতুন সত্য।

[প্রবন্ধটি 'শিল্পস্বর' আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।]

বাংলা নাট্য : তত্ত্ব ও রীতি

বাংলা নাটক বলতে বুঝি বাংলা ভাষায় বাঙালির সংস্কৃতিনির্ভর নাট্য। বাংলা অঞ্চলের নাটক প্রাচীনকাল থেকেই ছিল স্বতন্ত্র। সমুদ্র উপকূলবর্তী নদী-নালা বেষ্টিত ভূ-ভাগের ফলে পশ্চিম ভারতের শাস্ত্রীয় ধারা বাংলা অঞ্চলের নাট্য সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। নানা নামে নানা রূপে বহমান ছিল নাট্য সংস্কৃতি। উপনিবেশের দীর্ঘ শাসনের জাঁতাকলেও এদেশীয় ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়নি। সে সংস্কৃতি প্রান্তিক পর্যায়ে ধিকিধিকি প্রাণসঞ্চারে বেঁচে ছিল। গত দুই যুগ ধরে গবেষণায় উঠে আসতে শুরু করেছে বাংলার অতীত নাট্যচর্চার নানা তথ্য। পরিভাষাসহ নানা জটিলতা পেরিয়ে বাংলা নাট্যের তত্ত্ববদ্ধ রূপ পরিপুষ্ট হয়ে ওঠেছে। ইউরোপীয় শাসনে হারিয়ে যাওয়া অতীতের গৌরবান্বিত ঐতিহ্যের ইতিহাস নতুন করে জেগে ওঠেছে।

বাংলা নাটকের তাত্ত্বিক রূপ আলোচনার প্রথমেই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন তত্ত্ব কী? 'তত্ত্ব' শব্দের মূলে রয়েছে—সংস্কৃত তৎ+ত্ব=তত্ত্ব। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধারণাকে বোঝায়। ইংরেজি Theory শব্দটি গ্রিক শব্দ Theoria শব্দ থেকে উদ্ভূত। Theorein বলতে বোঝায় মনোযোগ দিয়ে দেখা, লক্ষ করা, অবলোকন করা, গভীরভাবে চিন্তা করা। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করাকে বোঝায়। অর্থাৎ Theory বা তত্ত্ব বলতে বিচার, তুলনা, পৃথকীকরণ, সমালোচনা ও উপযোগিতা নির্ধারণমূলক তথ্যাদি বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়—তত্ত্ব হলো সুসংগত, সুশৃঙ্খল ও পরিপূর্ণ সমালোচনামূলক ধারণা-কাঠামো যা কোনো

বিষয়ের স্পষ্টতর, ব্যাপকতর বা পর্যাপ্ততর বোধগম্যতা প্রদান করে। তাই নাটককে জানা-বোঝা, সংজ্ঞায়ন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন-তুলনা করার অনুসৃত পদ্ধতি নাট্যতত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

প্রাচীন ভারতে আজকের নাটক পাওয়া যায় রূপক শ্রেণির শিল্প হিসেবে। যা একসঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য। অভিনেতা বা নট অন্যের রূপ ধারণ করে দর্শকের সামনে কাহিনি বা বিষয় উপস্থাপন করেন। রূপক ১০ রকমের—ভান, ব্যায়োগ, ঈহামৃগ, ডিম, সমবকার, নাটক, প্রকরণ, বীথি ও অঙ্ক। এ ভেদগুলো মূলত বস্তু, নেতা বা চরিত্র ও রসের ওপর নির্ভরশীল। অনেকে মনে করে থাকেন নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত যে 'ওড্রমাগধী' নাট্যরীতির কথা উল্লেখ আছে তা বৃহত্তর প্রাচীন বাংলা অঞ্চলের। এ 'ওড্রমাগধী' রীতিটি কেমন ছিল তা নিয়ে নানা কৌতুহল—নানা ব্যাখ্যা আছে। অনেক নাট্যতাত্ত্বিক এ রীতিকে ক্রিয়া ও রসের বহুনৃত্যগীতবাদ্য সংযুক্ত লাস্যময়ী অভিনয়রীতির নাটক বলে অভিহিত করে থাকেন। আবার কেউ কেউ সংলাপের কথাও বলেছেন। প্রাচীন সে সময়ের বাংলায় তম্বরু-এ নাটকের তথ্য পাওয়া যায় তা ছিল গীত-নৃত্য-অভিনয়নির্ভর। প্রাচীন বাংলায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড নানা বাদ্যযন্ত্রগুলো ব্যবহৃত হতো। এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রাচীন বাংলার নাট্যরীতি ছিল গীত-নৃত্য-অভিনয়-বাদ্যনির্ভর পরিবেশনা। সম্ভবত নদীমাত্রিক ভূ-ভাগের ফলেই গীতপ্রবণ ধারার প্রাধান্য ছিল। তাহলে দেখা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় দর্শক-আসর-নৃত্য-গীত-অভিনয় সংবলিত গায়েন-দোহার কর্তৃক পরিবেশিত আখ্যানই বাংলা নাট্য হিসেবে বিবেচ্য।

প্রাচীন বাংলার নাট্য পরিবেশনাগুলো কেমন ছিল তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে বুদ্ধনাটকগুলো উপস্থাপনা পর্যালোচনায়। চন্দ্রগোমীর 'লোকানন্দ' নাটকটি নৃত্য-গীত সহযোগে বিভিন্ন বিহার কিংবা বিহারের বাইরে উপস্থাপিত হতো। চর্যাপদের ১৭ সংখ্যক চর্চায় উল্লেখ আছে—'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী, বুদ্ধ নাটকও বিষমা হই' অর্থাৎ গান্তি দেবী নৃত্য করছেন আর বুদ্ধ নাটক সম্পন্ন হচ্ছে। সে সময়টাকে শুধু বুদ্ধ নাটক নয়। নানা স্থানে নানা উৎসব নানা কৃত্যে নাটক পরিবেশিত হতো। এগুলোর কোনোটি বর্ণনানির্ভর, কোনোটি উক্তি-প্রত্যুক্তি, কোনোটি নৃত্য-গীতনির্ভর। চর্যাপদে ডমরু ব্যবহার কিংবা পেশাদার অভিনয়রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এখনো নেপালে উন্মুক্ত স্থানে চারদিকে দর্শকবেষ্টিত মঞ্চে চর্যা বা চারিয়া পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এতে বাংলা অঞ্চলের নাট্যরীতির রূপ কিছুটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলা অঞ্চলে মধ্যযুগের নাট্যরীতি ছিল—পাঁচালি, কীর্তন, কথা, কথকতা, পালা, লীলা, হাস্তর প্রভৃতি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল পাঁচালি। পাঁচালি রীতিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী আয়তনে নৃত্য-গীত-অভিনয়নির্ভর নাট্য পরিবেশিত হতো। পাঁচালি নামকরণ সম্পর্কে অনেকে বলেন—পাঁচজন গায়েন-দোহার নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করত বলে পাঁচালি। কেউ বলেন পাঁচ ধরনের পরিবেশনার সন্নিবেশিত কাহিনি বা আখ্যান থাকত বলে পাঁচালি। সেগুলো হচ্ছে—পা-চালী, ভাবকালি, নাচাড়ি, বৈঠকী, দাঁড়া কবি ইত্যাদি। পাঁচালি পরিবেশনের গঠনগত পাঁচটি পারিভাষিক শব্দও আছে—কথা, বোলাম, দিশা, পদ ও নাচাড়ি। আবার সংগীতের পরিভাষা হিসেবে ছিল—ধুয়া, পয়ার, ত্রিপদী বা নাচাড়ি, শিকলি। মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য পাঁচালি হচ্ছে—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল। পাঁচালি সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে—কৃত্য পাঁচালি ও প্রণয় পাঁচালি। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসমূহ কৃত্য পাঁচালির আঙ্গিকে পরিবেশিত হতো। মানবিক প্রেম-আখ্যান বর্ণিত হতো প্রণয় পাঁচালিতে।

সুলতানি-মোগল শাসন যুগে পাঁচালিই ছিল জনপ্রিয় নাট্য আঙ্গিক। পাঁচালি একধরনের পালাভিনয়। আসর কেন্দ্রিক ছিল তার উপস্থাপনা। মূল গায়েন দুই হাতে দুই চামর দুলিয়ে রসভারে অভিনয় করতেন। সংগীত ছিল দ্রুত, উত্তেজিত নৃত্য, অঙ্গভঙ্গি সহকারে উপস্থাপন হতো। এতে কাহিনির বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করার জন্য গায়েন বা দোহার বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতিও ছিল এখানে। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পরিবেশনাগুলো পাঁচালির আঙ্গিকেই উপস্থাপিত হতো। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিও ছিল পাঁচালির নাট্যমূলক পরিবেশনা। মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যধারা ছাড়াও প্রণয়মূলক ও পীরমাহাত্ম্য পাঁচালি নাট্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। যেমন—ইউসুফ জোলেখা, বিদ্যাসুন্দর, লাইলী মজনু, পদ্মাবতী, খোয়াজখিজিরের জারি, মাদারপীরের জারি উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের জনপ্রিয় নাট্য পরিবেশনা ছিল—পাঁচালি ও পালা। পালা গীত-অভিনয়-নৃত্য-কাহিনি বর্ণনানির্ভর পরিবেশিত নাট্য। মধ্যযুগের শেষ পাদে খণ্ড কাহিনি অবলম্বন করে পাঁচালি গড়ে উঠত। এগুলো বর্ণনা-নৃত্য-গীত-অভিনয়-উক্তি-প্রত্যুক্তির সমন্বয়ে পরিবেশিত হতো।

মধ্যযুগে কীর্তন ও লীলা নামেও নাট্য পরিবেশিত হতো। কীর্তন ছিল একধরনের বন্দনাগীতি। কখনো কখনো কীর্তনের সঙ্গে লীলা শব্দও প্রযুক্ত হতো। এ লীলাকীর্তনে গীত, সংলাপ, বর্ণনা প্রভৃতি নাট্যগুণে উজ্জ্বল। কীর্তন পরিবেশনে পাঁচটি অংশ থাকে—কথা, তুক, ছুট, ঝুমুর ও আখর। মধ্যযুগের পরিবেশনা নাট্যের আরেকটি বিষয়ভাগ হলো লীলানাট্য। অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা বা দেবতা-দেবতাকল্প মানুষের কাহিনিমূলক নাট্য। যেমন; কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি। লীলানাট্য এক চরিত্রবিশিষ্ট বা একাধিক চরিত্রবিশিষ্ট হয়ে থাকে। লীলানাট্যের পরিবেশন কখনো মঞ্চকেন্দ্রিক বা কখনো পরিবেশকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। যেমনঃ ডঙ্ক নাট্য, কালিয়দমন নাট্য—এগুলো এক চরিত্রবিশিষ্ট। অনুরূপ গীতগোবিন্দ মঞ্চকেন্দ্রিক লীলানাট্য। এ লীলানাট্য থেকেই যাত্রা নামের নাট্যাঙ্গিকের সৃষ্টি।

মধ্যযুগের কথকতারীতিতে অভিব্যক্তি-ভঙ্গিমা থাকত এবং গীত-সুরে পরিবেশিত হতো। অনেকে মনে করেন, পাঁচালির পদ ও পয়ারের ওপর ভিত্তি করেই উত্তর সময়ে এ কথকতা রীতির সৃষ্টি হয়েছে। আর পালা চারপাশে দর্শকবেষ্টিত খোলা মঞ্চে অভিনীত হতো। কখনো কখনো কৃত্রিম মঞ্চও স্থাপিত হতো। পালাগানে একজন মূল গায়েন বা বয়াতি থাকেন। পালার সংগীতকাহিনি ও নাট্যিক উপস্থাপনে দোহারগণ সাহায্য করে থাকেন। 'মালঞ্চমালা', 'মহুয়া', 'কাজল রেখা', 'মধুমালার কেচ্ছা', 'সখিসোনা', 'মালঞ্চকন্যার কেচ্ছা', 'কাঞ্চনমালা', 'মালতীকুসুমমালা' প্রভৃতি নানা পালার নাম পাওয়া যায়। বিংশ শতকেও মহুয়া, মলুয়া, কাঞ্চন কন্যা, দেওয়ানা মদিনা ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে বাংলার নিজস্ব নন্দনভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিগ্রহ লাভ করে।

মধ্যযুগে নাট্য পরিবেশনা ছিল আসরভিত্তিক। চারদিকে দর্শক বসত এবং মাঝখানে উপস্থাপিত হতো নাটক। কৃত্যনাট্যে কখনো কখনো মঞ্চ বানিয়ে নাট্য উপস্থাপন করা হতো। ভূমি সমতল বৃত্তমঞ্চ, চৌকোণ খোলা মঞ্চ বা চৌপথ খোলা মঞ্চ, গৃহাঙ্গন প্রভৃতি স্থায়ী বা অস্থায়ী মঞ্চ ব্যবহৃত হতো বলে তথ্য পাওয়া যায়। অভিনয়রীতির ক্ষেত্রে ছিল বর্ণনাধর্মী। গায়েন বা কথক ঘটনার বর্ণনা করেন এবং একই সঙ্গে চরিত্ররূপ অভিনয় করতেন। পাশ্চাত্যের চরিত্রাভিনয়ের মতো একই চরিত্রমোহে আবদ্ধ না থেকে আসরে উপস্থিত দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় করেন। বর্ণনাত্মক অভিনয়ের তিনটি প্রধান দিক লক্ষণীয়—গায়েনের বিশুদ্ধ

বর্ণনারীতি, যা জারি, হাস্তর গান প্রভৃতিতে দেখা যায়। কখনো অভিনয়ে গায়েন কাহিনির অন্তর্গত চরিত্রগুলোকে নানা ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলেন এবং কখনো চরিত্রাভিনয়ের মতো অভিনয়। আবহমান বাংলার নাট্যরীতিতে একজন অভিনেতা একই পরিবেশনায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। পাশ্চাত্যের সংলাপের মতো সংলাপনির্ভরতা ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকে নেই। এখানে কাহিনি বা ঘটনা বর্ণনা, উক্তি-প্রত্যুক্তিই প্রধান। গায়েন বা বর্ণনাকারী কখনো সরাসরি চরিত্রের সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তি করেন, আবার কখনো দোহার বা সহযোগীর সঙ্গেও উক্তি-প্রত্যুক্তি করেন। কাহিনিবিন্যাস বা বৃত্তরীতিতে নানা রকমের বৃত্ত দেখা যায়। এতে প্রথমে বন্দনা থাকে, পরে নৃত্য-গীত সহযোগে কাহিনি উপস্থাপিত হয়। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। একই সঙ্গে বর্ণনা, গান, নৃত্য, অভিনয়, কথা সবকিছুই এ নাট্যে একীভূত অদ্বৈত। অতএব স্পষ্ট যে, বাংলা নাট্য একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন রূপ ও আঙ্গিকের মধ্য দিয়েই বাংলা নাট্য বহমান। সে জন্য বাংলা নাট্য বলতে কোনো একটি আঙ্গিককে নির্দিষ্ট করে না।

ঔপনিবেশিক শাসনে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির ব্যাপক প্রভাব পড়ে বাংলায়। ১৭৯৫ সালে লেবেদেফের ডিসগাইজ বা কাল্পনিক সংবদল ও লাভ ইস দ্য বেস্ট ডক্টর নাটক অনুবাদ ও মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে যে ধারার শুরু হলো তা গ্রাস করল দেশের গ্রামে গঞ্জে গান, পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, জারি, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি জনপ্রিয় নাট্য আঙ্গিক। ইউরোপীয় 'থিয়েটার' ধারাটি বাংলায় দুর্দান্ত প্রতাপে এগিয়ে চললো।

ইউরোপীয় শাসনে নাটকের মূল্যবোধ হয়ে ওঠে দ্বন্দ্বনির্ভর কাহিনি ও চরিত্রাভিনয় তত্ত্বে। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলায় যে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করল তা নতুন তাত্ত্বিকভিত্তিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পূর্ববঙ্গেও একই আদলে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি (১৮৬৫), ক্রাউন থিয়েটার (১৮৯০-৯২), ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার (১৮৯৭) মঞ্চ স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে প্রতিভাবান নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, মীর মশাররফ হোসেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত প্রমুখের স্পর্শে নতুন আরেক গতি লাভ করে নাট্যচর্চা। বিংশ শতকের শুরুতে দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত কিছু

পালা নিয়ে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশ করলে ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা রীতি ব্যালেড শিরোনামে দেশে-বিদেশে ব্যাপক পরিচিত হয়ে ওঠে।

নাট্যের আঙ্গিকের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্যভাবনার বিরোধী ছিলেন। তিনি বাংলার 'যাত্রা' আঙ্গিককে পছন্দ করতেন। ইউরোপী রীতির দৃশ্যসজ্জায় অত্যন্ত বিরক্ত প্রকাশ করতেন। মুকুন্দ দাস স্বদেশি যাত্রার ব্যাপক প্রচলন করেন। ১৯৪২ সালে সংস্কৃতিকর্মী সোমেন চন্দর নিহত হলে নতুন এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। মার্কসবাদী চেতনায় কলকাতা কেন্দ্রিক 'গণনাট্য' নামে নতুন এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' নাটকগুলো জনপ্রিয়তা পায়।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশমুক্ত হয় দেশ। পূর্ব বাংলায় সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, মুনীর চৌধুরী, সাঈদ আহমেদ, শওকত ওসমান, জিয়া হায়দার, আসকার ইবনে শাইখ, নূরুল মোমেন প্রমুখের লেখনীর স্পর্শে বাংলা নাটক হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের বিভিন্ন শহরে নতুন নতুন নাট্যদল প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। এর মধ্যে ঢাকা থিয়েটার বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতিকে আধুনিক চিন্তনে এগিয়ে নিয়ে চলে। ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম নাট্যকার ছিলেন সেলিম আল দীন। সেলিম আল দীন ঐতিহ্যবাহী মধ্যযুগের বাংলার পাঁচালি ও কথকতার ধারায় সমকালীন আধুনিক নাটক রচনা করেন। তার অধিকাংশ নাটকগুলো প্রযোজনা করে ঢাকা থিয়েটার। ঢাকা থিয়েটার তাদের 'চাকা' নাটকেই প্রথম ইউরোপীয় সংলাপ ও দ্বন্দ্বরীতিকে পরিহার করেন। মধ্যযুগের বাংলা নাট্য শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে সেলিম আল দীন বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতির রূপরেখা তুলে ধরেন। সে গ্রন্থে তিনি আরো বলেন, 'আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো ন্যারেটিভ ও রিচুয়্যাল থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান—পাঁচালি—লীলা—গীত—গাজীর গান ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। বাংলা নাট্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক ও অভিনয়ের বর্ণনাধর্মীতা।'

ঢাকা থিয়েটারের 'বনপাংশুল' মধ্যযুগের পাঁচালি ধারায় রচিত। নির্দেশনায় নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু। এ নাটক উপস্থাপনেও বাংলার ঐতিহ্য-বিকাশী ধারায় চারদিকের দর্শক পরিবেষ্টিত মধ্যমঞ্চে উপস্থাপন হয়েছে। বন্দনা, বর্ণনা, উক্তি-প্রত্যুক্তি, নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ

সমকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে অত্যন্ত শিল্পকুশলতায় ফুটে ওঠেছে। অথচ উপস্থাপনায় আধুনিক নাট্য উপকরণের সমস্তটাই প্রয়োগ করেছেন। 'ধাবমান' নাট্যটি উপস্থাপনেও মঞ্চবিন্যাস ছাড়া ঐতিহ্যের ধারায় বহমান বাংলা নাট্য অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজনা 'বেহুলার ভাসান' আধুনিক নাটকের মাইলফলক। এ নাটকে বিষয়বস্তুর পৌরাণিক বেহুলাকে যেমন নিরীক্ষা করেছেন ঠিক তেমনি ঐতিহ্যবাহী উপস্থাপনারীতি নিয়েও নিরীক্ষা করেছেন। নৃত্য-গীত-বর্ণনা-উক্তি-প্রত্যুক্তিনির্ভর চারদিকের দর্শক পরিবেষ্টিত মঞ্চে তার আধুনিক উপস্থাপনা। নির্দেশনায় ছিলেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। বটতলা নাট্যদল দার্শনিক নারী 'খনা'র জীবন নিয়ে আধুনিক নাটক উপস্থাপন করেছেন। যে দার্শনিক ক্ষমতা ও আধিপত্যের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছেন। রচনা সামিনা লুৎফা নিত্রা ও নির্দেশনায়-মোহাম্মদ আলী হায়দার। এ নাটকের উপস্থাপনে বন্দনা, বর্ণনা, নৃত্য-গীত-উক্তি-প্রত্যুক্তিসহ চারদিকের দর্শক পরিবেষ্টিত মধ্যমঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলার সাধক শাহ আব্দুল করিমের জীবন ও দর্শন নিয়ে সুবচন নাট্য সংসদ মঞ্চায়ন করে 'মহাজনের নাও' নাটক। আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী রীতিতে সংগীতনির্ভর তার পরিবেশনা নাট্যাঙ্গনে দীর্ঘদিন আলোচনার তুঙ্গে বিরাজমান ছিল। নাট্যটি রচনা করেছেন শাকুর মজিদ এবং নির্দেশনায় সুদীপ চক্রবর্তী। এতেও বাংলার ঐতিহ্যবাহী এরিনা বা চারদিকের খোলা মঞ্চ ব্যবহৃত হয়েছে। এ নাটক যেন আধুনিক 'পালা'। স্বপ্নদলের প্রযোজনা করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক। রচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবহমান রীতি অনুসারে চারপাশে দর্শক; মাঝখানে বন্দনা, বর্ণনা, সংলাপ, অভিনয়-নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে নাটকটি উপস্থাপিত। নির্দেশনায় জাহিদ রিপন। নাগরিক নাট্যাঙ্গনের 'গহর বাদশা ও বানেছা পরী'ও ঐতিহ্যবাহী ধারার আধুনিক মঞ্চ উপস্থাপনা। প্রচলিত একটি গাথাকে সমকালীন বৈশ্বিক প্রযুক্তি সহযোগে উপস্থাপন করেছেন। বোধন থিয়েটারের চন্দ্রাবতী পালা, ভোলা থিয়েটারের গ্রন্থিকগণ কহে, অন্বেষা থিয়েটারের ভানু সুন্দরীর পালা, বঙ্গলোকের রূপচান সুন্দরীর পালা, থিয়েটার আর্ট ইউনিটের 'মাধব মালঞ্চী' এক নতুন মাত্রা তৈরি করেছে। কিছু প্রযোজনায় নির্দেশকের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার বিকাশমূলক সচেতন প্রচেষ্টা না থাকলেও অবচেতনভাবেই ঐতিহ্যের ধারার বাংলা নাট্যের বৈশিষ্ট্যে প্রত্যুজ্জ্বল হয়ে

উঠেছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের নাটকের এত দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকলেও ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা নাট্য উপস্থাপনের জন্য কোনো স্থায়ী নাট্যমঞ্চ বাংলাদেশে স্থাপিত হয়নি। আজকের স্থাপত্য ও প্রযুক্তিনির্ভরতার যুগে এসেও বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে বা গ্রামে-গঞ্জে শত শত পালা-জারি-যাত্রা চারদিকের দর্শকবেষ্টিত অস্থায়ী মধ্যমঞ্চেই পরিবেশিত হয়ে চলেছে। অথচ রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐতিহ্যবাহী ধারার মঞ্চ প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অনেকে আধুনিকতা শব্দবন্ধে ফেলে বাংলার অতীত ঐতিহ্যিক রীতিকে অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতা শব্দের গভীরে প্রচ্ছন্ন ইউরোপীয়করণের প্রবণতা আছে। যা আমরা অনেকেই টের পাই না।

বাংলা নাট্য মূলত বাংলাভাষীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস দীর্ঘদিনের হলেও ঔপনিবেশিক শিল্প-সাহিত্য তত্ত্ব বাঙালিকে স্বকীয় না রেখে পাশ্চাত্যমুখী করেছে। হাজার বছরের বাংলা নাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনারীতি। বর্ণনা, বর্ণনা ও উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রধান। অদ্বৈতবাদী শিল্পচেতনা এ নাট্যধারার মূল। বাংলা নাটকের অভিনয়রীতিও পাশ্চাত্যের চরিত্রাভিনয় রীতির মতো নয়। বর্ণনা, সাত্ত্বিকতা ও উক্তি-প্রত্যুক্তির অদ্বৈত অভিনয় ক্রিয়ায় তা বিদ্যমান ছিল। বাংলার নাট্য উপস্থাপনে আসর কেন্দ্রিক রীতি প্রচলন ছিল। সমকালে ইউরোপীয় নাট্যরীতি ধারায় নাট্যচর্চার মূল স্রোত প্রভাবিত হলেও ঐতিহ্যের ধারাবাহী বাংলা নাট্যরীতিও অধিকতর সচল। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র। একটি জাতিরাষ্ট্রের আত্মপরিচয়ে তার সাংস্কৃতিক পরিচয় খুব জরুরি। ঐতিহ্যবাহী বাংলার নাট্যের আধুনিক চর্চিত ধারাই দিতে পারে সে আত্মপরিচয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০
২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০২
৩. সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ড.) (সম্পা.) *ভরত নাট্যশাস্ত্র* ১, বঙ্গানুবাদ-ড. সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. ছন্দা চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা
৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২৩
৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরব*, বিশ্বভারতীগ্রন্থালয়, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৫৩
৬. সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাংলা নাট্য, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬
৭. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ৫০৩
৮. সুকুমার সেনের, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-৪র্থ খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা
৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা বুক হাউজ, কলিকাতা, ১৩৪৬
১০. অজিতকুমার ঘোষ, নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৭
১১. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষা 'পরিবেশনা শিল্পকলা' খণ্ড, সম্পাদনা ড. ইসরাফিল শাহিন এবং বাংলাপিডিয়া-এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
১২. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলার লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি
১৩. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের বাংলা নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
১৪. আবু সাঈদ তুলু, *নাট্য ঐতিহ্য ও বাংলাদেশের নাটক*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২০

[প্রবন্ধটি 'দ্য রিপোর্টার' অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত।]

বাংলার নাট্য ঐতিহ্য

হাজার বছরের বাংলার নাট্য ঐতিহ্য কেমন ছিল সে প্রশ্নই চালিত করেছে এ অধ্যয়ন। বাংলার অতীত নাট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া দুরূহ হলেও ইতিহাসের প্রতিনিধিত্বশীল নানা নিদর্শনে বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত তথ্যগুলো ভিত্তি করে আমরা রূপরেখামূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। এ প্রবন্ধে আমরা বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস ও প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্য নিদর্শনকে ভিত্তি করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব আবহমান বাংলার নাট্য ঐতিহ্য ও নাট্যরীতির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য।

নদীমাত্রিক ভূভাগের ফলে প্রাচীন বাঙলার স্বতন্ত্রতার সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীন সময়ে।[১] বৈদিকযুগে সমস্ত ভারত যখন শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিল তখন বাংলা অঞ্চল ছিল গীতপ্রবল। সংস্কৃত সাহিত্য-কলাবিদ্যার কৌশলকেও অন্ধ অনুকরণ করেনি প্রাচীন বাংলা। বাংলার প্রাচীনকালেই নৃত্য এবং গীতের সাহায্যে নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। পরিবেশনায় কাঁশর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড নানা নামের পরিচয় পাওয়া যায়। ভরতমুণি তার নাট্যশাস্ত্রে এ অঞ্চলের নাট্য প্রবৃত্তিকে 'ওড্রমাগধী' নামে আঞ্চলিক রীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২] ওড্রমাগধী রীতিটি অপ্সরা সৃজন নৃত্য থেকে

---

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, পৃষ্ঠা-৪০০

[২] সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ড.) (সম্পা) *ভরত নাট্যশাস্ত্র* ১, বঙ্গানুবাদ—ড. সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. ছন্দা চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১১৬

উদ্ভব কৈশিকী প্রবৃত্তি ও ভারতী প্রবৃত্তির সমন্বয়ে গঠিত বলে ক্রিয়া ও রসের বহুনৃত্তগীতবাদ্য সংযুক্ত লাস্যময়ী অভিনয়রীতির নাটক। 'দীনেশচন্দ্র সেন 'ওড্রমাগধী রীতি'তে সংলাপের প্রাধান্যের প্রসঙ্গ টেনেছেন।[৩] বাংলার প্রাচীন যে তম্বুরু নাটক-এর উল্লেখ যাওয়া যায় তা বাংলা অঞ্চলের নৃত্যগীতের পরিচয়কেই সুদৃঢ় করে।।[৪] নীহাররঞ্জন রায় বলেন—'প্রাচীনকালে নৃত্য বা নৃত্ত ছাড়া নাটক ছিল না; কাজেই বুদ্ধনাটকই হউক আর তুম্বুরুনাট্যই হউক, নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে বাধা নাই।'[৫]

সমুদ্র উপকূলবর্তী নদ-নদী বেষ্টিত এ অঞ্চলের মানসিক গঠনে এক ধরনের কোমনীয়তা বিদ্যমান। যার প্রভাব সাংস্কৃতিক নানা আচরণের মধ্য লক্ষ্যণীয়। গীতপ্রবণতা এ অঞ্চলের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যরীতি বাঙলায় প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এ অঞ্চলে 'গৌড়ীয় সাহিত্যরীতি' নামে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধারা হিসেবে চিহ্নিত হত। এতে অলংকার, অনুপ্রাস, রচনার গাঢ়তা বিদ্যমান থাকত।[৬] চন্দ্রগোমী 'লোকানন্দ' প্রাচীন বাঙলার অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। পালযুগের নাটকের অস্তিত্ব নানাভাবেই পাওয়া যায়। তারমধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নির্দশন হিসেবে পরিচিত 'চর্যাপদ'-এ সমকালীন বৃহত্তর বঙ্গ সংস্কৃতিতে নাট্য পরিবেশনার তথ্য বিবৃত আছে।[৭] চর্যাপদকালীন নট, নটপেড়া প্রভৃতি তথ্যে পেশাদারী

---

[৩] দীনেশচন্দ্র সেন, *প্রাচীন বাংলার গৌরব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৫৩, পৃষ্ঠা-২২

[৪] নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০,পৃষ্ঠা-৬৩৮

[৫] প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা-৬৪০

[৬] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, পৃষ্ঠা-৫৭৪

[৭] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২৩, পৃষ্ঠা-৩০। চর্যাটি বীণাপার রাগপটমঞ্জরীতে—

'সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী।।ধ্রু
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা।।ধ্রু
আলি কালি বেণি সারি সুণেআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।।ধ্রু
জবে করহা করহক লেপি চিউ

নাট্যকর্মের পরিচয় বিধৃত করে। প্রাচীন বাঙলার নাটকে পেশাদারী অভিনেতা-অভিনেত্রীও ছিল। গায়েন কর্তৃক দর্শকের সামনে আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনাই মূলত নাটক। প্রাচীন বাঙলায় 'শূন্যপুরাণ' 'সেক শুভোদয়া', 'হর্ষচরিত', 'নাথগীতিকা' প্রভৃতি ছিল নাট্যমূলক পরিবেশনা। যা নৃত্য-গীত-অভিনয় সহযোগে উপস্থাপিত হতো। এগুলোতে গানের ধূয়া থাকত এবং আজকের পালাগানের মতো ছিল পরিবেশনা আঙ্গিক। ঢাক, ঢোল, নাকাড়া, শিঙ্গা নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হতো।

মধ্যযুগ ছিল বাঙলা সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। নানা নাট্য আঙ্গিক, নানা বিষয়ে, নানা বৈচিত্র্যে মধ্যযুগের বাংলা নাট্যসংস্কৃতি প্রবহমান ছিল। নৃত্য-গীত ও অভিনয়সহ অদ্বৈত মাধুর্যে উপস্থাপিত হতো। সেলিম আল দীন তার *বাঙলা নাট্যকোষ* গ্রন্থে বাঙালির প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাট্যসংস্কৃতির প্রায় ছয় শ-এর অধিক অন্তর্ভুক্তি তুলে ধরেছেন। এগুলো স্থায়ী, অস্থায়ী বা কৃত্রিম মঞ্চে উপস্থাপিত হতো। 'রামকীর্তন' 'রায়মঙ্গল' 'রামলীলা' 'কুশান গান' নানা নামে পরিচিত রামায়ণী গান পাঁচালি আঙ্গিকে পরিবেশিত হতো। পাঁচালি মূলত একধরনের পালাভিনয়। আসর কেন্দ্রিক ছিল রামায়ণের উপস্থাপনা। মূল গায়েন দুই হাতে দুই চামর দুলিয়ে রসভারে অভিনয় করতেন। সংগীত দ্রুত, উত্তেজিত নৃত্য, অঙ্গভঙ্গি সহকারে উপস্থাপন হতে দেখা যেত। এতে কাহিনির বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করার জন্য গায়েন বা দোহার বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে। বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির হিসেবে বিবেচিত। পাঁচালি ও পালা নাট্য মধ্যযুগের বাঙালি নাট্য পরিবেশনারীতি। মুসলিম শাসনের কারণে 'ইউসুফ জুলেখা' 'রসুলবিজয়' প্রভৃতিও পাঁচালি আঙ্গিকে পরিবেশিত হতো। কারবালার কাহিনি নিয়ে 'মুকতুল হোসাইন' 'কাসেমের লাড্ডি' 'কারবালা' 'জঙ্গনামা'; পীরের মাহাত্ম নিয়ে 'খোয়াজ খিজির' 'মাদার' 'মাদার গাজী' 'মাদার পীরের জারি' 'খোয়াজ খিজিরের জারি' 'সত্যপীর' 'গাজীর গান' 'মানিক পীর' ইত্যাদি পরিবেশনা বিদ্যমান ছিল। মধ্যযুগে ইসলামী বিশ্বে ইসলামি সংস্কৃতির জনপ্রিয় নাট্য আঙ্গিক ছিল পুতুল নাট্য বা পাপেট থিয়েটার। ছায়া নাট্যও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বতিশ তান্তি ধনি সএল বিআপিউ।।ধ্রু
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।ধ্রু

পাঁচালি আঙ্গিকে মহাভারত পরিবেশিত হতো। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি পরিবেশিত হলো কীর্তন, পদাবলি কীর্তন, নটপালা, নৌকাবিলাস, রাখালনৃত্য, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি নামে। সতের শতকে এ ধারা 'অষ্টকগান', 'রাসলীলা' হিসেবেও বিকশিত হয়। বৈষ্ণবধর্মগুরু শ্রীচৈতন্য ও তার অনুসারীদের জীবন মাহাত্ম প্রকাশ পেতো কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণযাত্রা কিংবা কখনো কখনো পদাবলি যাত্রা হিসেবে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গায়েন-দোহার কেন্দ্রিক নাট্যাভিনয়। বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন গায়েন। নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের অদ্বৈতনিক মাধ্যমে এ পরিবেশিত হতো। উক্তি-প্রত্যুক্তি ছাড়াও মাঝে মাঝে বর্ণনা থাকতো। কখনো এ পরিবেশনায় এক চরিত্রই সবগুলো চরিত্রের অভিনয় করতো। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অষ্টক গান, অষ্টগান, নৌকাবিলাস, পদাবলি কীর্তন, মণিপুরী নটপালা, রাখালনৃত্য ও গোষ্ঠ, রাসলীলা প্রভৃতি নানা নামে পালা পরিচিত। সেলিম আল দীন '*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*'-এর পরিবেশনরীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন—'এ ছিল মূলত গায়েন কেন্দ্রিক নাট্যাভিনয়।'[৮]

বৃন্দাবন দাসের '*চৈতন্য ভাগবত*' এ চৈতন্য ও তার শিষ্যদের নাচ-গান ও অভিনয় সমন্বিত পরিবেশনার পরিচয় পাওয়া যায়।[৯] ড. সুকুমার সেনের মতে বাংলা নাটকের পরিপূর্ণ স্পষ্ট রূপ 'চৈতন্য ভাগবত'তেই পাওয়া যায়। এটি দর্শক বেষ্টিত মধ্যমঞ্চে উপস্থাপিত হতো। পাশে সাজঘরও থাকতো। কখনো কখনো অভিনয়ের স্থানও পরিবর্তন হতো নাট্যমধ্যে। মধ্যযুগের বাঙলায় শিবের গীতে দেখা যায়—একজন অভিনেতাই নাচতো, গাইতো এবং অভিনয় করতো। একই সাথে ডমরু বাজাতো। বাড়ির দহলা/আঙ্গিনা কিংবা পাশের কোনো খোলা জায়গায় পরিবেশিত হতো এ বর্ণনাত্মক রীতির নাট্য।[১০] মধ্যযুগের জনপ্রিয় নাট্য ছিল মঙ্গলনাট্য। নানা প্রকারের

---

[৮] সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র, খণ্ড-০৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৭০

[৯] বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', সম্পাদনা সুকুমার সেন, সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৮২, কলকাতা, পৃষ্ঠা-০৮

[১০] **প্রাগুক্ত, চৈতন্য ভাগবত', মধ্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়ে উল্লেখ—**

একদিন আসি এক শিবের গায়ন
ডম্বরু বাজায়ে গায় শিবের কথন।।
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গল ছিল সবচেয়ে প্রাচীন। মনসামঙ্গল 'মনসার গীত' 'পদ্মার নাচন' 'রয়ানী গান' 'পদ্মপুরাণ' 'বেহুলার নাচাড়ি' 'ভাসান যাত্রা' 'কান্দনী বিষহরির পালা' নানা নামেও সমকালে পরিচিত। মনসামঙ্গল 'পদ্মপুরাণ' যে গায়েন উপস্থাপন করতো তা বিজয় গুপ্তের ভণিতা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নৃত্য-গীত-অভিনয়ের মাধ্যমে গায়েন-দোহার মিলে পরিবেশনা ছিল পদ্মপুরাণ।[১১] এতে নৃত্যশালার উল্লেখও আছে। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে পালাকার নিজেই অভিনয় করতেন।[১২] সাথে ছিল অভিনয়কর্মী বা নাটুয়া এবং সুশিক্ষিত বাদকদল ছিল। রূপরাম

গাহয়ে শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে।।
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর
হইলা শঙ্করমূর্ত্তি দিব্য জটাধর
এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর
হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে শঙ্কর।।
সেহ দেখে জটা শিঙ্গা ডম্বুর বাজায়
সে মহাপুরুষে যত শিবগুণ গাই
পরিপূর্ণ ফল তার একত্রে পাইল
সেই সে গাইল গীত নির অপরাধ
গৌরচন্দ্র আরোহন কৈল যার কান্ধে
বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর।।

[১১] ভণিতায় উল্লেখ–
বিজয়গুপ্ত বলে গায়েন হও সাবহিত
পয়ার ছাড়িয়া বল লাচাড়ির গীত।...
গায়েক হয়ে তাল ধরে জন্মে না জাতি
বিজয়গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দাও মতি। ইত্যাদি

[১২] কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' সম্পাদনায় সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-২৭। কাব্যের নানা ভণিতায় মুকুন্দরামের পালাকারের অপূর্ব সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন সংস্কৃতির পরিচয়ও বিধৃত হয়–
ফুল্লরা বীরের তরে করিছে রন্ধন
পাঁচালি করিল গীত শ্রীকবিকঙ্কন।—কালকেতুর মৃগয়া পর্ব,
মহাবীর আইলা যথা বণিকের ঘর
গাইলেন পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর।—বণিককে স্বপ্ন প্রদান পর্ব
স্নান করি নীলাম্বর/ ধরে পূর্ব্ব কলেবর
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।। –নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ

চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' এ মঞ্চস্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৩] মধ্যযুগের শেষ পাদে মক্তুল হোসেন, জঙ্গনামা, কাশিমের লড়াই, শহীদ-ই কারবালা, সখিনার বিলাপ ইত্যাদি জারি মর্সিয়া এবং গাজীর গান, মানিকপিরের গান, একদিল পির প্রভৃতি জনপ্রিয় ছিল। ঘাটু গানে ছোকরার দল নারী-রূপ স্বভাব নকল করে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে উপস্থাপন করতো।

হঠাৎ করেই ১৭৫৭ সালে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘটে এক নাটকীয় পরিবর্তন। পলাশীর প্রান্তরে নাটকীয় যুদ্ধের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের দাস বা গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে ভারতবাসী। মুখ থুবড়ে পড়ে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি। এসময় ইউরোপীয় আদলে তৈরি হতে থাকে নতুন ইতিহাস। 'থিয়েটার' নামের ইউরোপীয় তত্ত্বের আড়ালে হারিয়ে যেতে থাকে আমার ইতিহাস ঐতিহ্যের সবকিছু।

প্লে হাউজ নামে ফোর্ড উইলিয়ামে যে নাট্যশালার সন্ধান পাওয়া যায় তা ছিল ইউরোপীয় আদলে প্রথম প্রসেনিয়াম মঞ্চ। তারা নাটকের ক্ষেত্রে মঞ্চস্থাপত্যটাকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করতো। গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ কলকাতায় 'কাল্পনিক সংবদল' অনুবাদ মঞ্চায়ন করলে বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় ধারার নাট্যচর্চার প্রচলন বেগবান হয়ে উঠে। অথচ সেসময়ে বাংলার আনাচে কানাচে পরিবেশিত হতো নানা পালা-জারি। বেহুলা লখিন্দরের পালা, কারবালার কেচ্ছা, সয়ফুল-মুলুকের সাত দরিয়ার কেচ্ছা, দেওয়ানা মদিনা, কাজলরেখা সহ শত শত পালা-হাস্তর মঞ্চস্থ হয়ে চলছিল। সেসময় ইউরোপীয় আদর্শে কলকাতায় নির্মিত হয় নানা থিয়েটার। গ্রাম গঞ্জে নানাভাবে টিকে থাকে পাঁচালি, কবিগান, কৃষ্ণযাত্রা, পালা ইত্যাদি। এদেশীয় বাঙালিদের দ্বারা ইউরোপীয় স্টাইলে প্রথম নাট্যশালা স্থাপিত ১৮৩১ সালে। বাঙালিদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ থিয়েটার

---

[১৩] রূপরাম চক্রবর্তী বিরজিত 'ধর্মমঙ্গল', সম্পাদনা- অক্ষয়কুমার কয়াল, ভারবি, কলকাতা, ১৯৮৬ পৃষ্ঠা- ৪৪। উল্লেখ আছে—

নাট্যশালা তুল্যা দিল বসিবার ঘর
সুবর্ণ পতাকা উড়ে তাহার উপর।
সেইখানে গোরাচান্দ বার দেন আসি
কত ভাগবান দেখে সেই মুখশশী।
হরি হরি বল সভে কৃষ্ণের ভাবনা
গান দ্বিজ রূপরাম চৈতন্য বন্দনা।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮)। যার সঙ্গে মধুসূদনের নাট্যরচনার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

ধীরে ধীরে ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম রীতিই জয়জয়কার হয়ে উঠে। নাট্যমূল্যায়ন হয়ে ওঠে দ্বন্দ্বনির্ভর কাহিনি ও চরিত্রাভিনয়ের খেলায়। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা পায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পূর্ববঙ্গেও একই আদলে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি (১৮৬৫), ক্রাউন থিয়েটার (১৮৯০-৯২), ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার (১৮৯৭) মঞ্চ স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে শতক ধরে প্রতিভাবান নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, মীর মশাররফ হোসেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত প্রমুখের স্পর্শে নতুন আরেক গতি লাভ করে নাট্যচর্চা। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের সেসময় পূর্ববঙ্গে পালা নাট্যের অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল। বিংশ শতকের শুরুতে দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত কিছু পালা নিয়ে 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা' প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের আধুনিক প্রতিভু। অসংখ্য নাটক নির্মাণে প্রাচীন ভারতীয় রীতির অনুপ্রবেশকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। রথীন চক্রবর্তী 'নাট্যকথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থটির সম্পাদনায় বলেছেন, 'নাট্যের আঙ্গিকের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যভাবনার বিরোধী ছিলেন, লোক আঙ্গিক 'যাত্রা' ধারায় তিনি পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন নাটককে, বিরক্তি প্রকাশ করেছেন মঞ্চসজ্জায়। লিখিতরূপই তাঁর অভিব্যক্তির প্রমাণ।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যান্য মঞ্চবিন্যাসের মধ্যে খোলা মঞ্চ ও দৃশ্য সজ্জার অনাড়ম্বরকে পছন্দ করতেন যা তার 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রবন্ধে বলেন—'যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য, আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন। তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসেন নাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপসের সম্বন্ধ।...ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।'

মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রার প্রদর্শক। ১৯৪২ সালে সংস্কৃতিকর্মী সোমেন চন্দর নিহত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন তৈরি

হয়। মার্কসবাদী চেতনায় কলকাতা কেন্দ্রিক 'গণনাট্য' নামে নতুন এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। শুরু হয় কলকতায় গ্রুপ থিয়েটারচর্চা। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায় এ সময়। ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ববাংলায় সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, মুনীর চৌধুরী, সাঈদ আহমেদ, শওকত ওসমান, জিয়া হায়দার, আসকার ইবনে শাইখ, নূরুল মোমেন প্রমুখের লেখনীর স্পর্শে বাংলা নাটক হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য।

স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্যপরিবেশনা শহর পর্যায়ের মূলস্রোত প্রধানত ইউরোপীয়রীতি দ্বারাই তাড়িত হলেও গত নব্বই দশক থেকে ঐতিহ্য বিকাশী প্রবণতা বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। শিল্পকলা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চা, পথ নাট্যচর্চা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঙ্গনের নাট্যচর্চা এবং বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের নাট্যচর্চা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত। আবার এ নাটকগুলো ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম, দর্শকমধ্যমঞ্চে উপস্থাপন, খোলাস্থানে উপস্থাপন নানা বৈশিষ্ট্যমুখী। সমকালীন বাংলাদেশের নাট্য পরিবেশনারীতি আবার দুটো পর্যায় কেন্দ্রিক ক্রিয়াশীল। একটি শহর পর্যায়ে। শহর পর্যায়ে উপস্থাপন মাধ্যম প্রসেনিয়াম ধারা। আরেকটি গ্রামীণ পর্যায়ে যার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠে আবহমান ঐতিহ্যবাহী ধারা। গ্রামে পালা জারি যাত্রা ইত্যাদি প্রায় সমস্ত পরিবেশনাই চারদিকে দর্শকবেষ্টিত আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনারীতিতে উপস্থাপিত। এখনো বাংলাদেশের আনাচে কানাচে পালা, যাত্রা, ঢপযাত্রা, রায়কীর্তন, রামলীলা, কুশানগান, নটপালা, কালীকাচ, পদ্মপুরাণ গান, ভাসান যাত্রা, কান্দনী বিষহরির পালা, ইমামযাত্রা, জারিগান, গাজী পীর, মানিক পীর, গান, জারিগান, কিচ্ছা গান, বিচ্ছেদী গান, আলকাপ, গম্ভীরা, সঙযাত্রা, কবিগান ও বিচারগান, পুতুল নাচ, মহররমের জারি ইত্যাদির চর্চা দুর্দান্ত প্রতাপে বিদ্যমান।

নব্বইয়ের দশক থেকে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার ব্যাপক বিকাশ ঘটে। সেলিম আল দীন তার নাট্যে উপনিবেশের জ্ঞান ও করণকৌশলকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেন। নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর নেতৃত্বাধীন 'ঢাকা থিয়েটার' মধ্যযুগের বাংলা সংস্কৃতির পাঁচালি কথকতা বর্ণনার ধারায় বর্ণনাত্মক নাট্যকৌশলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তবে কিছু কিছু উপস্থাপনায় প্রসেনিয়াম মাধ্যমকেই আশ্রয় করেছেন। সৈয়দ জামিল আহমেদ নির্দেশিত 'বিষাদ সিন্ধু' 'কমলারানীর সাগরদিঘি' 'বেহুলার ভাসান' 'সং ভং চং' 'রিজওয়ান' প্রভৃতি নাটকে ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম ধারাকে ভেঙে দিয়েছেন। 'বেহুলার ভাসান'

উপস্থাপনায় ফিরে গেছেন গ্রামীণ আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনায়। আবহমান বাংলার নাট্যরীতিতে অর্ধশতাধিক প্রযোজনা এখনো শহর পর্যায়ে নিয়মিত মঞ্চায়ন হয়ে যাচ্ছে। নানা দলের নানা নাটকেই নানাভাবে নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়।

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যিক নাট্যরীতি মূলত নৃত্য-গীত-কাহিনি-অভিনয় ও দৃশ্যকল্পের অদ্বৈত বিন্যাস। চারদিক দর্শকবেষ্টিত মধ্যমঞ্চে তার প্রধানতম উপস্থাপন কৌশল। এখনও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে পালা-জারি-যাত্রাগুলো চারদিকের দর্শকবেষ্টিত অস্থায়ী মধ্যমঞ্চে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, হাজার বছরের গৌরবান্বিত নাট্য-ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙালি হলেও বাংলাদেশে এখনো ঐতিহ্যের ধারায় চারদিকে দর্শকবেষ্টিত মধ্যমঞ্চ স্থাপিত হয়নি। 'জাতীয় নাট্যশালা' শিরোনামে স্থাপিত মঞ্চ ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম এবং তাতে ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতাই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। অথচ ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যরীতির রয়েছে উঁচুতর দার্শনিক ভিত্তি। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ হয়ে সমকালীন পর্যায়ে বহমান বাঙালির পরিবেশনা ঐতিহ্যে নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের এমন অদ্বৈত সুসমৃদ্ধ শিল্পরূপ অন্যকোনো জাতিসত্তায় পাওয়া দুরূহ। বন্দনা, বর্ণনা ও কথন, উক্তি-প্রত্যুক্তিসহ নানা শিল্পসম্মিলনে সৌন্দর্যবোধের অনন্যতায় বাংলা নাট্য। যা দর্শকবেষ্টিত স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী মঞ্চে পরিবেশিত হতো এবং হয়। এগুলো বিষয় বৈচিত্র্যে যেমন অনন্য, তেমনি পরিবেশনারীতিতেও বহুমাত্রিক। হাজার বছরের বাংলা নাট্য সংস্কৃতি পাশ্চাত্য কিংবা সংস্কৃত থেকেও পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলার নিজস্ব ধারার নাট্যরীতির অধুনা বিশ্বমূল্যের চর্চা জাতিগত শিল্প সাহিত্যের সমৃদ্ধি এনে দিতে পারে। হাজার বছরের নাট্যরীতির আলেখ্যে বাংলাদেশের নিজস্বতার বিকাশ ঘটুক তা আমাদের প্রত্যাশা।

[প্রবন্ধটি মহাকাল নাট্যসম্প্রদায় আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক বাংলা নাট্য উৎসব'-এর সেমিনারে পঠিত।]

উত্তর-আধুনিক নাট্যতত্ত্বের পূর্বাপর

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে নাট্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় নানাকৃত্যের মধ্যে নাট্যিক নানা উপাদান থাকলেও প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীস কেন্দ্রিক 'নাট্য' শিল্পের পরিচয় বিধৃত হয়। পরিবেশনা শিল্পগুলোর মধ্যে 'নাট্য' প্রধান। নাট্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে থিয়েটার (theatre, theater) শব্দটি ব্যবহৃত। তদরূপ নাট্যের পূর্বলিখিত পাণ্ডুলিপি বা টেকস্টকে নাটক, ড্রামা, প্লে বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের ভরতমুণি রচিত 'নাট্যশাস্ত্র', পাশ্চাত্যের এরিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' থেকে নাট্যসংক্রান্ত নানা তত্ত্ব ও তথ্য এ শিল্পবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বৃহত্তর বৃটেনের 'আধুনিক' ধারণা প্রচলনের পূর্বে নাট্যতত্ত্ব আলাদা কোনো স্থান পায়নি। সর্বত্রই কাব্যতত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতে নাট্যকে 'দৃশ্যকাব্য'; তদরূপ গ্রীসেও নাট্য 'কাব্য' হিসেবে উল্লেখ্য। সাহিত্য-শিল্প মানেই 'কাব্য' এবং সাহিত্যিক-শিল্পী মানেই 'কবি'। এর ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছে নানা মত ও মতাদর্শের। সম্প্রতিকালে হাজার বছরের সৃষ্ট ও ব্যবহৃত প্রায়োগিক তত্ত্ব, তথ্য সম্ভারই নাট্যতত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত।

নাট্যের উৎপত্তি সম্পর্কে ধর্মীয় কৃত্যকেই প্রধান মনে করা হয়। এ শিল্পধারা সৃষ্টির শুরুতে ধর্মীয় কৃত্যমূলক নৃত্য, ঘটন ও অঙ্গভঙ্গি উপস্থাপনা থেকে নাট্যের উৎপত্তি। ধীরে ধীরে কৃত্যানুষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে যুক্ত হয় মুখোশ ব্যবহারের। এভাবেই সামাজিক জীবনের স্তর থেকেই

নাট্যের উৎপত্তি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করা হয়। প্রাচীন সভ্যতায় সাধারণত কৃত্যানুষ্ঠানগুলো জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য বিশেষ সম্মেলনকে উপলক্ষ করে অনুষ্ঠিত হতো। সামাজিক জীবনে যাতে কল্যাণ সাধিত হয় সে প্রেক্ষিতেই এসব কৃত্যানুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করা হতো। অনুকরণ, পোশাক, মুখোশ, অঙ্গভঙ্গি, সংগীত, নির্বাকাভিনয় ইত্যাদি নানা রকমের নাট্যীয় উপাদান সে কৃত্যানুষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান ছিল। এসব কৃত্যানুষ্ঠানগুলো কবে, কখন থেকে শুরু হয়েছে তা বলা দুষ্কর। কিন্তু এসব ধর্মীয় কৃত্যমূলক নাট্যানুষ্ঠানের সন্ধান খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন ভারত ও গ্রীসে পাওয়া যায়।

পরিকল্পনা, উপস্থাপনীয় অনুশীলন ও দর্শকের সামনে নির্দিষ্ট পরিসরে উপস্থাপিত শিল্পাঙ্গিকই নাট্য। সম্প্রতি অনেকে নাট্যকে লিভিং আর্ট বা জীবন্তশিল্প বলে থাকেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম ও জনপ্রিয় পরিবেশনা শিল্প এটি। যে শিল্পে জীবন্ত দর্শকের সামনে দর্শনযোগ্য মঞ্চে জীবন্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা উপস্থাপন করে। এ অভিনয়যোগ্য মঞ্চ বা নাট্যস্থান কখনো স্থায়ীমঞ্চ হয় আবার কখনো বা অস্থায়ী মঞ্চ হয়ে থাকে। নাট্যকর্মের জন্য তিনটি মৌলিক উপাদানকে বাধ্যতামূলক বলে তত্ত্ববেত্তারা মনে করেন। প্রথমত, মঞ্চ বা নির্দিষ্ট স্থান, দ্বিতীয়ত, অভিনয় শিল্পীকৃত উপস্থাপনীয় বিন্যাস বা বিষয় বা ভাবনা, তৃতীয়ত, দর্শক। তাছাড়াও অন্যান্য উপাদান হলো হচ্ছে—দৃশ্য সজ্জা, পোশাক, উপকরণ, সৃজনশীল অন্যান্য উপস্থাপনীয় বিষয়। বর্তমান প্রেক্ষিতে স্থান, কাল, বিষয়, রস, উপস্থাপন, স্টাইল, আঙ্গিক, সংগীত, শিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নানা বৈশিষ্ট্যের নাট্যশিল্প বিদ্যমান। যেমন—ইম্প্রোভাইজেশনাল থিয়েটার, পাপেট থিয়েটার, থার্ড থিয়েটার, মিউজিক্যাল থিয়েটার, বাংলা নাট্য, ইমেজ থিয়েটার, ইনভিজিবল থিয়েটার, প্রসেনিয়াম থিয়েটার, নো থিয়েটার, কাবুকি থিয়েটার, এনভারমেন্টাল থিয়েটার, পথ নাটক, থেরাপি থিয়েটার ইত্যাদি।

সাধারণত কোনো স্থানিক আয়তনে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কোনো বিষয়বিন্যাস দর্শনকে থিয়েটার হিসেবে অভিহিত করা হয়। থিয়েটার শব্দটি গ্রিক শব্দ *theatron* থেকে উদ্ভূত। থিয়েট্রন বলতে সাধারণ কোনো স্থানিক দেখাকে বুঝায়। ইংরেজিতে থিয়েট্রন বলতে বুঝায়—seeing place. পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিবেশনা শিল্পকলায় অভিনয় শুধুমাত্র একটি

গণ্ডিতেই বা মঞ্চকেন্দ্রিকই আবদ্ধ থাকেনি, তা উন্মুক্তস্থান, ধর্মীয় স্থান, হাট-বাজারে কৃত্রিম মঞ্চ, রাস্তা-ঘাটে, পার্কে, স্কুল-কলেজে, ক্লাব ইত্যাদিসহ প্রচলিত নাট্যমঞ্চেও প্রদর্শিত হয়। সাধারণত কোনো স্থানে দর্শকের সামনে যদি অভিনয় ক্রিয়া সংগঠিত হয় তাই নাট্য বা থিয়েটার। থিয়েটার বা নাট্যের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয় জড়িত থাকে সেগুলো হলো—কাহিনি বিন্যাস, এটি লিখিত বা অলিখিত দুটোই হতে পারে, পোশাক, দৃশ্যসজ্জা, আলো, আবহসংগীত এবং চরিত্র বা নাট্য ক্রিয়ার ব্যবহার্য দ্রব্যাদি। একাধিক সৃজনশীল কর্মী একটি লক্ষ্যকে উদ্দিষ্ট করে নাট্যক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।

সাধারণ অর্থে নাট্য ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহের চিন্তাজাত বোধ বা ধারণাকেই নাট্যতত্ত্ব বলা যেতে পারে। নাট্যতত্ত্ব মূলত বিশেষ জ্ঞান যা নাট্যের স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝতে সহায়তা করে। উনবিংশ শতাব্দির দিকে নাট্যের তত্ত্বাকার বা তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়। ইতোপূর্বে নাট্যের বিভিন্ন উপাদান, উপকরণ, কৌশলসমূহ আলাদাভাবে তত্ত্বাকারে উপস্থাপিত হয়নি। নাট্য একই সাথে কলাবিদ্যা এবং শিল্পবৈশিষ্ট্যে যৌথ শিল্প। এ বিদ্যার সাথে যুক্ত থাকে বিভিন্ন বিষয়িক জ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মনোবিদ্যা, কলাবিদ্যা প্রভৃতি। নাট্যের সামগ্রিক উপাদান-উপকরণের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে নানা মত, নানা ধারণা এবং কৌশলগত নানা ভাবনা। এ বিভিন্ন ধারণা, বিভিন্ন বিতর্ক, বিভিন্ন মতাদর্শ নাট্যতত্ত্ব হিসেবে সমসাময়িক বিশ্বনাট্যধারায় স্বীকৃত। নাট্যে সমসাময়িক জীবনচিন্তা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সময় বা কালের প্রেক্ষিতে নানা তত্ত্ব গড়ে উঠলেও কিছু মৌল প্রবণতা একই। প্রাচীন সভ্যতায় নাট্য সম্পর্কিত ভাবনা বা নাট্যতত্ত্ব আজকের উত্তর আধুনিক বাস্তবতায়ও উপযোগিতা হারায় না। বরং সেগুলোর ভিত্তিতেই সংযোজন-বিয়োজন, সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ায় এ স্তরে পৌঁছেছে। তাই দেখা যায়, মৌল উপাদান অক্ষুণ্ন বা একই অবস্থানে থেকে যুগে যুগে পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন ও ভিন্নমাত্রিক রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু নাট্যের মৌলিক উপাদানসমূহ প্রায় একই রয়ে গেছে।

নাট্যতত্ত্বের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতীয় সিন্ধু-নদ কেন্দ্রিক বিকাশমান সভ্যতায় সুসমৃদ্ধ নাট্যের তত্ত্বমূলক শাস্ত্রের পরিচয় দৃষ্ট হয়। তথাকথিক আর্য ও অনার্য জীবন মিথস্ক্রিয়ায় সংস্কারকৃত সনাতনী চিন্তায় পঞ্চমবেদ হিসেবে প্রথম নাট্যতত্ত্বের

সন্ধান মেলে। কিংবদন্তি এরকম যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্লান্তিকর জীবন থেকে মুক্তির জন্য ব্রহ্মার শরণাগত হন। ব্রহ্মার নির্দেশে ভরত শতপুত্রের সহযোগিতায় ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্যবস্তু বা বিষয়, যজুর্বেদ থেকে অভিনয়, সামবেদ থেকে গান বা সংগীত ও অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে পঞ্চমবেদ হিসেবে নাট্যবেদ সৃষ্টি করেন। প্রথম নাট্যানুষ্ঠান ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে অভিনীত হয়। সে অনুষ্ঠানে দৈত্যগণ বিঘ্নের সৃষ্টি করলে দেবরাজ 'জর্জর' নামক ধ্বজা দিয়ে প্রতিহত করেন। সেখান থেকে 'জর্জর' সনাতনী রঙ্গপূজার বিষয় হিসেবে দাঁড়ায়। ধর্মীয় ভূমিকায় প্রথম উপস্থাপিত নাট্য 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরাদাহ'। সে সময়েই ব্রহ্মার আদেশে ভরত মুণি নাট্যের সূত্রগুলি বা তত্ত্ব সন্নিবেশিত করেন। যা বর্তমানে নাট্যকলা বিদ্যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্র নামে পরিচিত। ভারতীয় নাট্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ শাস্ত্রে উল্লেখ—'ন তজ জ্ঞানং ন তচ্ছিলং ন সা বিদ্যা ন সা কলা, ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেহস্মিন যন্ন দৃশ্যতে' অর্থাৎ এমন কোনো জ্ঞান, শিল্প বা কলা, বিদ্যা, যোগ বা কর্ম নেই যা এ দৃশ্যকাব্যে বা নাট্যে দৃষ্ট হয় না।

সেরূপ প্রাচীন গ্রীসেও আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ দিকে একই ভাবে ধর্মীয় কৃত্যকে ঘিরেই নাট্যকলার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসবাসী দেবতা ডায়ানোসিসের সন্তুষ্টির জন্য কাব্য, নৃত্য-গীত সহযোগে সন্মানার্থ কৃত্যাৎসব করতো। এ উৎসব ৫ বা ৬ দিন স্থায়ী হতো। পাহাড়ের পাদদেশে উৎসবের অনুষ্ঠান আয়োজনের শুরুর দিকে শুধুমাত্র দেবতার উদ্দেশ্যে বলি ও সমবেত গীত থাকতো। ক্রমেই উৎসব অনুষ্ঠানের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে নৃত্য-গীতের সমন্বয় ঘটে এবং কোরাসের মাত্রাও বাড়তে থাকে। ছাগবলি কেন্দ্রিক যে আর্তস্বর প্রাচীন গ্রীসবাসী তাকে 'ট্র্যাগোজ' বলতো। পরবর্তীতে প্রতিযোগিতার আয়োজনের কলেবরও বৃদ্ধি পায়। তখন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে পুরস্কৃত করা হতো। সম্ভবত পুরস্কার দেওয়া হতো ছাগশিশু। যা হোক উৎসবের শোকার্ত আবহ থেকে ট্র্যাজেডি নাটকের উদ্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। আনন্দমুখর শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে শুরু হতো ডায়োনিসাসের উৎসব। ডিথিরাম্ব কোরাস ও নৃত্যগীত থাকতো দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয়দিন কমেডি নাট্য। শেষের ২/৩ দিন থাকতো ট্র্যাজেডি প্রতিযোগিতা। খোলা আকাশের নিচে পাহাড়ের পাদদেশে অভিনীত হতো নাট্যগুলো। পাশ্চাত্য নাট্যকলার ইতিহাসে গ্রীকনাট্যকে ভিত্তিমূল হিসেবে ধরা

হয়ে থাকে। গ্রীক নাট্যকলায় প্রথম সার্থক নাট্যকার হিসেবে স্কাইলাসকে মনে করা হয়। যিনি প্রথম ট্র্যাজেডি রচনা করেন। স্কাইলাসের উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে—'প্রমিথিউস বাউন্ড', 'আগামেমনন' ইত্যাদি। তারপর সার্থক ট্র্যাজেডি-নাট্যকার হিসেবে সফোক্লিসকে চিহ্নিত করা হয়। সফোক্লিস অনেকগুলো নাটক লিখলেও মাত্র তার ৭টি নাটক পাওয়া যায়। তার উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে—ইডিপাস, মিড়িয়া, ইলেক্ট্রা ইত্যাদি। তারপর সার্থক নাট্যকার ইউরিপিডিস। তিনি কমেডি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনা—ফ্রগস্। গ্রীক সভ্যতার ধ্বংস ও রোম কর্তৃক প্রাচীন গ্রীস দখল হলে রোম কর্তৃক সভ্যতা ও শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। প্রাচীন রোমের শিল্প-সাহিত্য তাত্ত্বিক হিসেবে হোরেস, লুঙিনুস, সিসিরো প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন এ্যাংলো স্যাক্সন যুগে রোম কেন্দ্রিক বিকাশমান শিল্প-সাহিত্যচেতনা প্রায় সমস্ত ইউরোপেরই শিল্প-সাহিত্যে সে প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে এ নাট্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বৃটেনের শেক্সপীয়রের হাতে ট্র্যাজেডি নতুন মাত্রা নেয়। শেক্সপীয়রের বিন্যাসে পঞ্চসন্ধির উল্লেখ পায়। গ্রীক দেবতা বা নিয়তি-ভাগ্য নির্ধারিত ট্র্যাজেডির স্থলে যুক্ত হয় মানবী ট্র্যাজেডি। শেক্সপীয়র রচনার মধ্যদিয়ে তুলে ধরেন—মানুষের কর্মের ভুলের প্রেক্ষিতেই মানুষের জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে আসে। শেক্সপীয়রের পরবর্তী পর্যায়ে ট্র্যাজেডি অন্যদিকে মোড় নেয়। সৃষ্টি হয় নিউ ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি। পাশ্চাত্য নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—স্থানিস্লাভস্কি, মেয়রহোল্ড, গ্রোটস্কি, বেখ্‌ক্ট প্রমুখ। বর্তমান ইউরোপীয় নাট্যধারায় সৃষ্টি হয়েছে নানা বৈশিষ্ট্যমূলক নাট্যকলাবিদ্যা। শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবেও এ নাট্য ধারাকে ব্যবহার করছেন।

নাট্যের তাত্ত্বিক শাস্ত্রের মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র সবচেয়ে প্রাচীন। এ শাস্ত্রের পরিধি বা পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তর। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যতত্ত্বচিন্তার প্রথম ও প্রধান পথিকৃৎ মণিষী ভরত মুণি। ভরত মুণির রচিত নাট্যশাস্ত্র খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ১০০০-১৫০০ দিকে রচিত বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। শাস্ত্রে উল্লেখ—'পূর্বনং কৃতযুগে বি প্রাঃ বৃত্তে স্বায়ম্ভুবেহস্তরে; ত্রেতাযুগে হথ সংপ্রাপ্তে মনোবৈবস্তুবেহন্তরে।' অর্থাৎ পূরাকালে স্বায়ম্ভুর মন্বন্তরে যখন সত্যযুগ অতিক্রান্ত হল এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হয়। এবং

মানুষগণ ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে যায় তখন ব্রহ্মার আদেশে এ শাস্ত্রের সৃষ্টি। সনাতনী সংস্কার মতে তা খ্রিস্ট পূর্বাঙ্গ ১০০০-২০০০ মধ্যে হবে।

ভরতমুণি নাট্যের জন্য নাট্য উদ্দেশ্য বা নাট্যলক্ষণে অত্যন্ত জোরদার ছিলেন। কারণ নাট্যও বেদধারার একটি অঙ্গ। তিনি বলেন—ধর্মোহধর্ম প্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্, নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিতীতানাং দমক্রিয়া, ক্লীবানাং ধাষ্ট্রকরণমুৎসাহঃ শূর মানিনাম্, অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যাং বিদুষামপি। অর্থাৎ যারা অধর্মে প্রবৃত্ত তাদেরকে ধর্ম, যারা কামাসক্ত, যারা উদ্ধত তাদেরকে শাসন, যারা বিনীত তাদের মধ্যে আত্মসংযম, নিস্তেজ ব্যক্তিকে সাহস, বীর ও মানী ব্যক্তিকে উৎসাহ, মুর্খদের জ্ঞান এবং পণ্ডিতদের প্রজ্ঞা দেওয়াই হবে নাট্যের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে আরো উল্লেখ—সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিলাস, দুঃখার্তদের স্থৈর্য, অর্থোপজীবীদের অর্থ এবং উদ্বিগ্ন চিত্ত ব্যক্তিদেরকে ধৈর্য সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া নাট্যের কাজ। নাট্য হবে বিবিধ ভাবযুক্ত, নানা অবস্থার ও মানুষের কর্মের অনুকৃতিমূলক, উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকের কর্মাশ্রিত, মঙ্গলকরণ, উপদেশাত্মক। পরিবেশিত থাকবে ধৈর্য, ক্রীড়া ও সুখাদিকারক।

ভরতিমুণি নাট্য বা এ দৃশ্যকাব্যকে 'রূপক' হিসেবে অভিহিত করেছেন। যা একসঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য। অভিনেতা বা নট অন্যের রূপ ধারণ করে দর্শকের সামনে কাহিনি বা বিষয় উপস্থাপন করে বলে এ পরিবেশনা শিল্পকে ভরত মুণি রূপক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রূপককে দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ভরত মুণি। রূপক দশটি হচ্ছে—ভাণ, ব্যায়োগ, ঈহামৃগ, ডিম, সমবকার, নাটক, প্রকরণ, বীথি ও অঙ্ক। এ ভেদগুলো মূলত বস্তু, নেতা বা চরিত্র ও রসের উপর নির্ভরশীল। রূপকগুলোর প্রকারভেদ সংস্কৃত নাট্যপ্রবহে আরও বেশি গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। অলঙ্কার চাতুর্যকে শিল্পকুশলার পরিচয়বাহী ও রস সৃষ্টি করাকেও একটি অপরিহার্য শিল্পপ্রেষণ-কাব্যপ্রেষণ মনে করা হতো।

নাটকের সংজ্ঞায় ভরত মুণি বিখ্যাত ঘটনা আশ্রিত ও ধীরোদাত্ত নায়কের আবশ্যিকতা উল্লেখ করেছেন। নাটক শ্রেণীর নাট্য বা রূপকে ঋষি, রাজা প্রভৃতি উঁচু বর্ণের, উঁচু ভাবজাত ক্রিয়া-কলাপ বা সুখ-দুঃখ বর্ণিত থাকবে। এ হিসেবে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির রাম, কৃষ্ণ, দুষ্যন্ত প্রভৃতি চরিত্র নায়কের দাবী রাখে। প্রকরণ নাট্যে ইতিহাস সত্যের চেয়ে কল্পনার আশ্রয় প্রতিফলিত হবে। এ নাট্যে পুরোহিত রাজা, ব্রাহ্মণ, বণিক, ধূর্ত, শট, দাস,

বিট, গণিকা প্রভৃতি সব শ্রেণির চরিত্রের সমাগত ঘটবে। এর বিষয় কবিকল্পিত ও সামাজিক জীবন আশ্রিত। প্রকরণের অঙ্ক সংখ্যা হবে ৫ থেকে ১০। অঙ্গী রস হবে শৃঙ্গার। এ ধারার উল্লেখযোগ প্রকরণ হচ্ছে—শুদ্রকের মৃচ্ছকটিকম। সমবকার শ্রেণির নাট্যে নাট্যবস্তু হবে দেবসুর বিষয়ক। নায়ক থাকবে প্রখ্যাত, ধীরোদাত্ত। এর অঙ্ক সংখ্যা হবে ৩টি এবং ৩ প্রকার বিদ্রব থাকবে। ৩ প্রকার শৃঙ্গার থাকবে। কিন্তু প্রধান রস হবে বীররস। যেমন—সমুদ্রমন্থনম। ঈহামৃগ শ্রেণির নাট্যের নায়িকা হবে উঁচুজাত। নায়ক দেবতা বা মানুষ যে কোনটাই হতে পারে। দিব্যা বা অলভ্য নায়িকাকে পাবার জন্য নানাবিধ যুদ্ধ বা কৌশল থাকবে। অবশ্য তা বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। অঙ্কসংখ্যা হবে ৪টি। যেমন—কুসুমশেখর বিজয়াদি। ডিম নাট্যের নায়ক হবে ধীরোদাত্ত। প্রখ্যাত বিষয় আশ্রিত থাকবে। রৌদ্র রস থাকবে অঙ্গী রস হিসেবে। অন্যান্য রসও থাকবে। অঙ্ক সংখ্যা হবে ৪টি। যেমন—ত্রিপুরদাহ। ব্যায়োগ শ্রেণির নাট্য একদিনের সম্পন্ন হবে। এর নায়ক হবে ভিত্তি স্বরূপ। একটি চরিত্রের বিকাশকেন্দ্রিক এ নাট্য। একাধিক স্ত্রী চরিত্র থাকবে নায়ক ধীরোদাত্ত এবং স্ত্রীলোকের জন্য যুদ্ধ সংগঠিত হবে। যেমন—সৌগন্ধিকাহরণ। অঙ্ক শ্রেণির নাট্যে প্রখ্যাত বা অপ্রখ্যাত ঘটনা দু-ই থাকতে পারে। তবে এতে স্ত্রীলোকের বিলাপ, নির্বেদ, ব্যাকুলতা প্রভৃতি থাকবে। এটি এক অঙ্ক বিশিষ্ট থাকবে। যেমন—শর্মিষ্ঠাযযাতি। প্রহসন শ্রেণির রূপককে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ভরত মুণি। একটি শুদ্ধ ও অন্যটি সংকীর্ণ। ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উঁচুবর্ণের হাস্য, পরিহাস, উপহাস, আচার-আচরণ ব্যাপ্ত থাকলে তা শুদ্ধ প্রকরণ। গণিকা, চেট, বিট, ধূর্ত, নপুংসক প্রভৃতি লোকের বেশ-ভূষা, আচার-আচরণ, কলহ-পরিহাস প্রভৃতি থাকলে তা সংকীর্ণ প্রহসন। প্রহসনও একাঙ্ক। যেমন—হাস্যার্ণব, ধূর্তসমাগম প্রভৃতি। ভাণ-আত্মকথন ও অপর সম্পর্কে কথন। অনেকটা একক অভিনয় ও স্বগোক্তির মতো। একটি ধূর্ত ও বিটের দ্বারা প্রযুক্ত থাকে। এক অঙ্ক বিশিষ্ট। বহুমুখী কার্যকলাপ সমন্বিত। সংস্কৃত নাট্যলক্ষণ রত্নকোষে এটিকে একক অভিনয় হিসেবে উল্লেখ করছেন। যেমন—লীলামধুকর। বীথী—১টি চরিত্র বা ২টি চরিত্রের দ্বারা এ নাট্যটি সম্পন্ন হবে। উত্তম, মধ্যম ও অধম এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের চরিত্র থাকবে। এ নাট্যে উক্তি-প্রত্যুক্তিই প্রধান। শৃঙ্গার রস হবে অঙ্গীরস এবং ২টি সন্ধি থাকে।

নাট্য ক্রিয়ার উপস্থাপন স্বরূপ প্রসঙ্গে ভরত মুণি বলেন—ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎ ক্রীড়া, ক্বচিদর্থঃ ক্বচিচ্ছমঃ, ক্বচিদ্ধাস্যং ক্বচিদ যুদ্ধং ক্বচিৎ কামঃ ক্বচিদ্ধধঃ। অর্থাৎ কখনো ধর্ম, কখনো খেলাধূলা, কখনো অর্থ, কখনও শান্তি, কখনও হাসি, কখনও যুদ্ধ, কখনো কাম এবং কখনো হত্যা থাকবে। ভরতমুণি নাট্য ২টি নাট্যবৃত্তের উল্লেখ করেছেন—একটি পতাকা ও অন্যটি প্রকরী। নাট্যের ঘটনাবলির পাঁচ অবস্থা—আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি, ফলাগম। অর্থ প্রকৃতি অনুসারে অঙ্গগুলি হচ্ছে—বীজ, বিন্দু, পতাকা, কার্য এবং অবস্থা ও অর্থপ্রকৃতি অনুসারে-মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি। এ নাট্যদেহ বিভাজন সংস্কৃত নাট্যধারায় পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে।

প্রথম নাট্যানুষ্ঠানের বিঘ্নতার প্রতিবিধায়ক হিসেবে দেবগণকে ব্রহ্মা নাট্যের শুরুতে যথাবিধি বলিদান, হোমাদিসহও সোপাচার পূজা করতে আদেশ করেন। রঙ্গপূজা ছাড়া নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা অনুচিত। মর্তের নাট্যের যাতে রঙ্গপূজা সম্পন্ন হয় সেজন্য ব্রহ্মা ভরতমুণিকে আদেশ দেন। ভরতমুণি রঙ্গালয়কে নানা শাব্দিক নাম্বান্তিত করেছেন। সেগুলো হলো—নাট্যবেশ্ম, নাট্যগৃহ, নাট্যমণ্ডপ, রঙ্গশালা, রঙ্গভূমি, রঙ্গমণ্ডপ, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি। মঞ্চ স্থাপত্যে—বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্যস্র নামে তিন প্রকারের উল্লেখ করেছেন ভরত মুণি। আয়তনের দিক থেকে মঞ্চ হবে তিন রকমের—জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর। ভরতমুণি মঞ্চের মাপও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এদের দৈর্ঘ্য, হাত ও দণ্ড অনুসারে ১০৮, ৬৪ ও ৩২। একটি শুধুমাত্র দেবতা, রাজা ও সামন্তদের জন্য প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষদের রঙ্গালয় হবে ৬৪/৩২ হাত। অতি বৃহৎ রঙ্গালয়ে যদি ভাবব্যঞ্জক অভিনয় সম্পন্ন হতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে মধ্যম রঙ্গালয় ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন ভরত। রঙ্গালয়ের ভূমি হবে সমতল, দৃঢ়, সাদা ভিন্ন অন্য রঙের অথবা কালো। নির্বাচিত ভূমিকে আবার দুভাগ করে সম্মুখ ভাগে নির্মিত করতে হবে রঙ্গশীর্ষ এবং পেছনে নেপথ্য গৃহ। এগুলো নির্মাণীয় কৌশল ও পরিমাপও ভরতমুণি উল্লেখ করেছেন। নক্ষত্রের শুভতার উপর নির্ভর করে ভিত্তিস্থাপন, সোপকরণ, দেবপূজা অবশ্য করণীয়। এ শুভ অনুষ্ঠানে কলা-কুশলী ও অতিথি বা রাজা-ব্রাহ্মণের ভোজন করানোরও তাগিদ দিয়েছেন ভরত। রঙ্গমঞ্চের প্রতি পার্শ্বে নির্মিত হবে রঙ্গমঞ্চের ন্যায় দীর্ঘ এবং সার্ধহস্ত উচ্চ মত্তবারণী। এতে আবার ৪টি

স্তম্ভ থাকবে। আর রঙ্গমণ্ডপ হবে দুটি মত্তবারণীর সমান উচ্চ। এভাবে ভরতমুণি রঙ্গালয় সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন।

ভরতমুণি রঙ্গালয় ও রঙ্গপীঠের অধিকারী নাট্যাচার্যকে জিতেন্দ্রিয় ও শুচি হবার নির্দেশ প্রদান করেছেন। নাট্যের শুরুতে যথারীতি পূজা সম্পন্ন করে হোম সমাপনান্তে নাট্যাচার্য স্থাপিত ঘট ভাঙবেন। এরপর নাট্যাচার্য রঙ্গালয় আলোকিত করবেন। সাথে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি থাকবে। তারপর শুরু করতে হবে পূর্বরঙ্গ।

পূর্বরঙ্গ বিধানে ভরতমুণি বেশ কিছু উপাচারের উল্লেখ করেছেন। তারমধ্যে অন্তর্যবণিকা পর্যায়ে—প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্রপাণি, পরিঘট্টনা, সংঘোটনা, মার্গাসারিত, আসারিত প্রভৃতি কর্মক্রিয়া থাকবে। বর্হিযবণিকা পর্যায়ে—গীতবিধি, উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী, শুস্কারবৃষ্ঠা (অবকৃষ্ঠা ধ্রুবা), রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত অর্থাৎ বিদূষক, সূত্রধার ও পারিপার্শ্বকের বাক্য বিনিময় এবং প্ররোচনা—অর্থাৎ সূত্রধার কর্তৃক প্রেক্ষকগণের প্রতিভাষণ দিয়ে নাট্যের শুরু হবে। ভরতমুণি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশেরও নিয়ম-নীতির উল্লেখ করেছেন। যেমন—বিদূষক প্রবেশ করবেন মঞ্চের সামনে থেকে। পূর্বরঙ্গ সমাপ্ত হবার পর উক্ত নাট্যের নাট্যকারের নামকীর্তন করণীয়। তারপর নাট্যের বস্তু নির্দেশক প্রস্তাবনা দিয়ে নাট্যের আরম্ভ করতে হবে বলে ভরতমুণি জানিয়েছেন।

নাট্যের বিষয়বর্ণনার ৪টি ভাবের উল্লেখ করেছেন—কৈশিকী বা ললিত, সাত্ত্বতী বা চমৎকার, আরভটী বা প্রচণ্ড ও ভারতী বা বাঙ্ময়। অভিনয়কে ভরতমুণিকে ৪টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—বাচিক, আঙ্গিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য। অভিনয় সহায়ক ৩টি উপকরণের কথা নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ—সন্ধিম, ব্যাজিম ও বেষ্টিত। ভরতমুণি নাট্যশাস্ত্রে পোশাক ব্যবহারেও নির্দেশ প্রদান করেছেন। সেগুলো হচ্ছে—শ্বেত, বিচিত্র ও মলিন। শ্বেত পোশাক সাধারণত শুভ বুঝাতে ব্যবহৃত হবে। পুরোহিত, জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী প্রভৃতিদের জন্য শ্বেত বস্ত্র ব্যবহার হবে। আর বিচিত্র পোশাক ব্যবহৃত হতো রাজা, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, বিলাসী প্রভৃতির ক্ষেত্রে এবং মলিন পোশাক ব্যবহৃত হতো মাতাল, পাগল, অসুস্থ, জ্বরাগ্রস্থ, যন্ত্রণাগ্রস্থ প্রভৃতিরর ক্ষেত্রে। ধ্রুবাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা— ১) প্রাবেশিকী ২) আক্ষেপিকী ৩) নৈষ্ক্রমিকী

৪) প্রাসাদিকী ৫) অন্তরা ইত্যাদি। ভরত মুণি নেপথ্যবিধি ৪ রকমের বলে ব্যক্ত করেছেন। যেমন—পুস্ত, অলংকার, সংজীব ও অঙ্গ-রচনা।

৮টি ভাব-রতি, হাস্, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ইত্যাদি ও ৮টি রসের শৃঙ্গার (সম্ভোগ ও বিপ্রলব্দ), হাস্য রস, করুণ রস, বীর রস, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভূত ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। সাত্ত্বিক ভাব ৮টি যথা—স্তম্ভ বা অবশভাব, স্বেদ বা ঘর্ম, রোমাঞ্চ, স্বরসাদ বা স্বরভঙ্গ, বেপথু বা কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয় বা মূর্ছা ইত্যাদি। ব্যভিচারী ভাব ৩৩টি। বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব ও স্থায়ী ভাবের সম্মিলনেই রসের সৃষ্টি হয়। ভরতমুণি ৪টি প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। যথা—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, ওড্রমাগধী, পাঞ্চালীমধ্যমা ইত্যাদি। ধর্মী ২ প্রকারের—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। সিদ্ধি ২ প্রকারের—দৈবী ও মানুষী। বিভিন্ন রসভিত্তিক বর্ণ বা রঙের উল্লেখ করেছেন—শৃঙ্গার-শ্যামবর্ণ, হাস্য-সাদা, করুণ-কপোতবর্ণ (ধূসর), রৌদ্র-লাল, বীর-গৌর, ভয়ানক-কালো, বীভৎস-নীল, অদ্ভুত-হলুদ ইত্যাদি। ভরতমুণি আঙ্গিক অভিনয়ে ৩০টি শির/মস্তককর্ম, ১৩টি সংযুক্ত, ২৪টি অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা, ১২ প্রকার বাহুভঙ্গি, ৫ প্রকার বক্ষ, ৫ প্রকার পার্শ্বক্রিয়া, ৫ প্রকার কটি, ৩ প্রকার উদর, ৫ প্রকার উরু, ৫ প্রকার জংঘা, ৫ প্রকার পদদ্বয়, ৩২টি চারী, রসভেদে গতি প্রভৃতির ক্রিয়াদির উল্লেখ করেছেন। বাচিকাভিনয়ে—নাম, আখ্যাত, নিপাত, উপসর্গ, সমাস, সন্ধি ও বিভক্তিযুক্ত, আলঙ্কারিক বচন আবশ্যিক বলে উল্লেখ করেছেন। সেপ্রেক্ষিতে বর্ণ, উচ্চারণ স্থান, নানাবিধ ছন্দ, অলংকার, ভাষাবিজ্ঞান, সংগীত, তাল, লয়, বাদ্য, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেছেন। শব্দকে ৩টি ভাগে ভাগ করেছেন—যথা : সমান, বিভ্রট ও দেশি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে ভাষাবিজ্ঞান, অলংকার বিজ্ঞান ও ছন্দবিজ্ঞানের পরিচয়ও বিধৃত হয়। নাট্যে ৩ রকমের চরিত্র, ৪ প্রকার নায়ক—ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ৪ প্রকার নায়িকা—ধীরা, ললিতা, উদাত্তা, নিভৃতা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। আবার বিভিন্ন চরিত্রের ভাষাবৈশিষ্ট্যের দিকেও ভরতমুণি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। নাট্যের শেষে দর্শকদের মঙ্গলকামনা করাকে গুরুত্ব প্রদান বা আবশ্যিক করেছেন। যা ভরতবাক্য নামে পরিচিত।

ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ভরতের নাট্যশাস্ত্র ৩৬টি অধ্যায়ে বিবৃত। মূলত ভরতের নাট্যশাস্ত্র ৩৮টি অধ্যায় সংযুক্ত। ৩৬টি অধ্যায় হচ্ছে—নাট্যাৎপত্তি, মণ্ডপবিধান, রঙ্গদৈবত পূজাবিধান, তাণ্ডবলক্ষণ, পূর্বরঙ্গ বিধান, রসাধ্যায় বা রসবিকল্প, ভাবব্যঞ্জন, উপাঙ্গাভিনয়, অঙ্গাভিনয়, চারীবিধান, মণ্ডকল্পন, গতিপ্রচার, করযুক্তি ধর্মব্যঞ্জক, ছন্দোবিধান, ছন্দোবৃত্তনিধি, অলংকার লক্ষণ, কাকুস্বরবিধান, দশরূপক লক্ষণ, সন্ধ্যঙ্গ বিকল্প, বৃত্তি বিকল্প, আহার্যাভিনয়, সামান্যাভিনয়, বৈশিক, বাহ্যোপচার, চিত্রাভিনয়, প্রকৃতি বিকল্পনা, সিদ্ধিব্যঞ্জক, জাতিলক্ষণ, আতোদ্য জাতিবিধান, তালবিধান, ধ্রুবাধ্যায়, গুণাধ্যায়, পুস্করাবাদ্ধ, ভূমি বিকল্প, নটশাপ, গুহ্যবিকল্প ইত্যাদি। 'আদি নাট্যশাস্ত্র' বিষয় নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলে, রাঘব ভট্টকৃত অর্থদ্যোতনিকা'র টীকায় 'আদি ভরত' শাস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাপ্ত একটি পাণ্ডুলিপি মহিশুরের ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়। যার ১৯টি উদ্ধৃতির মধ্যে ১২টি ভরত নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায় বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত পোষণ করেন। এটি নৃত্ত বিষয়ক। বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ের নাট্যশাস্ত্র সংস্কৃতের সঙ্গে এমনভাবেই মিশে গিয়েছিল যে নাট্যশাস্ত্র ও সংস্কৃত নাট্যচিন্তাকে আলাদা করে দেখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈদিক ভারত থেকে নব্য ভারতের নাট্যচর্চায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে নানা তত্ত্ব ও তথ্য যোগ ও টীকা সৃষ্টি হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সময়কাল নিয়ে দীর্ঘ মতভেদ-মতবিরোধ রয়েছে। বেশিরভাগ ইউরোপীয়ান পণ্ডিতগণ রচনাকাল খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ২০০ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ভরত নাট্যশাস্ত্রের পরিধি, চিন্তন, বিশ্লেষণ, তত্ত্ব ও দার্শনিক ভিত্তি এরিস্টটলের পোয়েটিক্সের তুলনা অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত ও প্রাচীন; যা সহজেই অনুমেয়। ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রকে একসাথে স্থাপত্যকলা, নৃত্যকলা, নাট্যকলা, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, চিত্রকলা প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের উৎসমূল আকর গ্রন্থ হিসেবে ধরা যায়।

নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত সময়কাল অনুসরণে ভরতের নাট্যশাস্ত্রটি বৈদিক যুগের সম্ভবত শেষ পর্যায়ে রচিত। ভরতের পরেও অনেক নাট্যশাস্ত্রকারদের পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যভাষ্যকারগণ হলেন—কোহল, দত্তিল, শালিকর্ণ, বাদরায়ণ বা বাদরি, নখকুট্ট, অশ্মকুট, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য। এধারার শেষ

পর্যায়েও যেসব জনপ্রিয় নাট্যভাষ্যকারদের পরিচয় মেলে তারা হলেন—নন্দী বা নন্দীকেশ্বর, তুম্বুরু, বিশাখিল, চারায়ণ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

নব্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে 'সংস্কৃত' কেন্দ্রিক সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ইত্যাদি নানাবিধ নাট্য-সংস্কৃতি এগিয়ে চলে। এ সংস্কৃতি নাট্যচিন্তা মূলত ভরত মুণি নাট্যশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। সংস্কৃত নাট্য স্বরূপ ভরতমুণির হলেও টীকা ভাষ্যকার হিসেবে নন্দী বা নন্দীকেশ্বর উল্লেখযোগ্য। এ সংস্কৃত ঘরানায় যেসব শাস্ত্রকারদের পরিচয় পাওয়া যায় তারা হলেন—সদাশিব, পদ্মভু, দ্রৌহিনী, ব্যাস, কাত্যায়ন, রাহুল, গর্গ, শকালিগর্ভ, ঘণ্টক, বার্তিকরার, হর্ষ, মাতৃগুপ্ত, সুবন্ধ প্রমুখ। সংস্কৃত নাট্যচর্চার যুগ ছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৬০০ শতকের দিকে। এ সংস্কৃত নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য নাট্য—কালীদাসের 'শকুন্তলা' 'কুমারসম্ভাব' বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' শুদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' ইত্যাদি। সংস্কৃত নাট্যধারায় ১টি নতুন ভাব ও রস সন্নিবেশিত করা হয়। তা হচ্ছে—শান্ত ভাব থেকে শান্ত রস। সংস্কৃত নাট্যে ১৮টি উপরূপকের সন্ধান মেলে—নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খন, রাসক, সংলাপক, শ্রীগতিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মলিকা, প্রকরণী, হল্লীশ ও ভানিক। এ সময় এ উপরূপকগুলো সমাজ জীবনে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো বলে ধারণা করা হয়। অনুমান করা হয়, এসময় আলেকজান্ডারের ভারতে আগমনের ফলে ভারতবাসীগণ যেমন—গ্রীক সভ্যতার চিন্তনের সাথে পরিচিত হয় তেমনি গ্রীকরাও ভারতীয় জীবন, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য ও চিন্তার সাথে পরিচিতি লাভ করেন।

সংস্কৃত শিল্প-ঘরানায় অষ্টম-নবম দশকের দিকে গুরুত্বপূর্ণ নাট্যতাত্ত্বিকগণ হচ্ছেন—ধনঞ্জয় (দশরূপক), সাগর নন্দী (নাটকলক্ষণরত্নকোষ), রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র (নাট্যদর্পণ), রচক (নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা), শারতানতয় (ভাবপ্রকাশন), বিশ্বনাথ কবিরাজ (সাহিত্যদর্পণ), শিংগ ভূপাল (নাটকপরিভাষা, রসার্ণব সুধাকর) প্রমুখ।

ভারতীয় আধুনিক নাট্য বা নব নাট্য মূল সংস্কৃত নাট্য চিন্তা কেন্দ্রিক বিকশিত। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধারায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সমস্তটাই সংস্কৃত ঘরানাকেন্দ্রিক শিল্প-সাহিত্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের নাট্যচিন্তার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটে। ফলে মূল

ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আধুনিকতার পথে এগিয়ে চলে। আধুনিক নবনাট্য আন্দোলন বেগবান হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে বিশেষত বাংলা ভাষা কেন্দ্রিক নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে শম্ভুমিত্র, উৎপল দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাদল সরকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাঙলা নাট্য মূলত বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। বাঙলা নাট্যের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। এ 'বাংলাদেশ' ভূখণ্ডের বসতির সঙ্গে এর সম্পর্ক। ড. নীহাররঞ্জন রায় এ অঞ্চলের প্রাচীন নাট্যকে গীত-বাদ্য-রঙ্গ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রে এ অঞ্চলের নাট্যরীতিকে 'ওড্রমাধগী' নাট্যরীতি হিসেবে তুলে ধরেছেন। এ অঞ্চলে 'তম্বরু নাটক' নামের উল্লেখ নানা গ্রন্থে থাকলেও তা পাওয়া যায়নি। যদিও বৌদ্ধদের ধর্মাশ্রিত দু-একটি নাটক ছাড়া উল্লেখযোগ্য নাটক পাওয়া যায় না। খ্রিস্টাব্দ অষ্টম-নবম শতকে চর্চিত চর্যায় এ অঞ্চলে নৃত্যযুক্ত নাট্য ও পেশাদার নাট্যকুশলীদের সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙলা অঞ্চলের মধ্যযুগ ধরে পালা, জারি, পাঁচালি, যাত্রা নামের নাট্যগুলো শিল্প-সাহিত্যচর্চায় প্রধানরূপে ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুরোটাই নাট্য। হাজার বছর ধরে বহমান এ ভূখণ্ডের নাটকগুলো পাশ্চাত্য নাট্যরীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পাশ্চাত্য নাট্য চরিত্রাভিনয় নির্ভর। বাঙলার নাটক বর্ণনানির্ভর। পাশ্চাত্যের নাটক ক্রিয়ানির্ভর; কিন্তু বাঙলা নাট্য ব্যাখ্যানির্ভর। বাঙলার নাট্যরীতি নৃত্য-গীত, বর্ণনা-বন্দনা, অভিনয় সবমিলে অদ্বৈত শিল্পমার্গতায় উপস্থাপিত হয়। উপনিবেশ শাসনে বাঙালিদের মধ্যে পাশ্চাত্যনাট্য রীতির প্রবর্তন হতে থাকে। সেলিম আল দীন স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত স্বভূমিজ বাঙলা নাট্যচিন্তার পুনরোদ্ধার এবং চর্চা করেন। প্রাচীন ভারতীয় জনপদ কেন্দ্রিক 'বাংলাদেশ' ভূ-খণ্ডের, বাংলাভাষী জীবন-যাত্রায় শিল্প-নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে একের মধ্যে বহুত্বের দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পধারার উত্তরসূরি হিসেবে নাট্যের পরিচয় তুলে ধরেন। যা পালা, পাঁচালী, কীর্তন, যাত্রার মধ্যে লক্ষ্যণীয়। একসঙ্গে কাহিনি, বর্ণনা, অভিনয়, নৃত্য-গীত সমন্বিত। সেপ্রেক্ষিতে বাংলানাট্যের বৈশিষ্টভিত্তিক-বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি, বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতি, কথানাট্য, পাঁচালী রীতি তুলে ধরেন। বাংলা নাট্য উপস্থাপন হতো আসর কেন্দ্রিক। ত্রিকোণা বস্তুবাদী মঞ্চে নয়। হাজার বছরের বাঙলা নাট্য অখণ্ড আখ্যাননির্ভর এবং অদ্বৈত শিল্পসমন্বিত।

পাশ্চাত্যের নাট্য চিন্তা প্রাচীন গ্রীস ও রোমকেন্দ্রিক নাট্যচিন্তারই আধুনিকায়ন রূপ। গ্রীসের সোফিস্ট থেকে শুরু হয়েছে এর দার্শনিক ভিত্তিমূলক যাত্রা। এরিস্টটলের পোয়েটিক্সই প্রথম নাট্যধারার তত্ত্বগ্রন্থ। নাট্যতত্ত্বে এরিস্টটল অনুকরণ বা উপস্থাপনার রূপ হিসেবে মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, কমেডি এবং ডিথিরয়াম্ব কবিতাকে তৎকালীন সময় প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ব্যক্ত করেন। বাস্তব জীবনের কোন ক্রিয়া বা কৃতিকে সরাসরি অনুকরণের কথা বলেননি। মূলত অনুরূপ সৃজন বা অনুসৃজনের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। অনুকরণ বা অনুসৃজন অনুভূতি ও কর্মধারার অনুকরণ ছন্দ, ভাষা, বর্ণ, রেখা ও সুরের একক বা সমবায়ী প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে পারে। তবে কবিত্বের প্রসঙ্গে অত্যন্ত জোর প্রদান করেছেন। মানব জীবন বাস্তবতার কোনো ক্রিয়া উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মহত্তর রূপে উপস্থাপনকে ট্র্যাজেডি এবং হেয় রূপ উপস্থাপনাকে কমিডির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে সুনির্দিষ্টতার ছাঁচে ফেলে দিয়েছেন। কমিডিতে জীবনের হালকা বিষয়ের অনুকৃতি থাকবে। সংগীত, ছন্দ হিসেবে হাস্যাত্মক উপস্থাপিত হতো। এ ধারায় এরিস্টটোফেনিসকে আদর্শ হিসেবে তৎকালীন প্রেক্ষিতে গুরুত্ববহ মনে করেছেন এরিস্টটল। আবার জীবনের মহত্তর রূপায়নের ক্ষেত্রে উচ্চতর বলে হোমার ও সফোক্লিসকে উচ্চতর আদর্শ হিসেবে দেখেছেন। প্রাচীন গ্রিসের ক্যালিক গীত থেকে কমেডি এবং ডিথিরয়াম্ব গীত রচিয়তাদের হাতেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব বলে এরিস্টটল অভিমত পোষণ করেন। স্কাইলাস প্রথম ট্র্যাজিক ধারার রচনা বা ট্র্যাজেডি সন্নিবেশিত করেন। তিনি প্রথম অভিনেতা বা উপস্থাপনকারীর সংখ্যা ১ থেকে ২ করেন এবং সমবেত গীতি বা কোরাসকে কমিয়ে সংলাপকেই মূখ্য স্থান দেন। সে ধারাতেই সফোক্লিস অভিনেতার সংখ্যা করলেন ৩ এবং সংযোজন করেন দৃশ্যসজ্জা। মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির তুলনামূলক আলোচনায় এরিস্টটলের মতে উভয় অনুকৃতিই হবে ভাবগম্ভীর ও সমন্বিত ছন্দবদ্ধ। রচনারীতির দিক থেকে মহাকাব্য আখ্যানধর্মী ও পূর্বাপর একই ছন্দ অন্যটি বিচিত্র ছন্দের প্রয়োগ ঘটে। ট্র্যাজেডির বিষয়ের সময়সীমা একদিন বা তার চেয়ে একটু বেশি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে, কিন্তু মহাকাব্য কোনো সময়সীমার বন্ধন মানে না। মহাকাব্যের সব উপাদানই ট্র্যাজেডিতে থাকে আর ট্র্যাজেডির সব উপাদান মহাকাব্যে থাকে না। আর কমেডিতে হীনপ্রকৃতি, দোষ, ত্রুটি, কদর্যতা, হাস্যকার হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

এরিস্টটল ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ধারণে উল্লেখ করেন—ট্র্যাজেডিতে কোন ঘটনা বা ক্রিয়ার অনুকরণ, বিচিত্রভঙ্গিম কলাকৌশলে, অলংকার সমৃদ্ধ ভাষায়, আখ্যান রূপে না হয়ে ক্রিয়ারূপে উপস্থাপিত হয়, যা করুণা ও ভয়ের উদ্রেক করে আবেগগুলোর মোক্ষণ ঘটায়। এতে অবশ্য ক্রিয়াশীল মানুষের জীবনদৃশ্য থাকবে। চরিত্র ছাড়াও ট্র্যাজেডি হতে পারে কিন্তু ক্রিয়া ছাড়া ট্র্যাজেডি হবে না। একটি ট্র্যাজেডির জন্য ছয়টি উপাদানকে এরিস্টটল গুরুত্ব প্রদান করেছেন— ১) কাহিনি বা বৃত্ত ২) চরিত্র ৩) বাচন ৪) মনন বা চিন্তন ৫) দৃশ্য ৬) সংগীত। এরিস্টটল বৃত্ত বলতে ঘটনার সুষ্ঠু বিন্যাসকে বুঝিয়েছেন। জীবনের সুখ-দুঃখের অনুকরণ। মানব জীবনের সমস্ত ঘটনাই নিয়ন্তা নিয়তি বা ভাগ্য। তাই নিয়তি বা ভাগ্যের নির্মম পরিণতি বা প্রতিবিম্বিক ক্রিয়ার অনুকরণ সৃষ্ট থাকবে বৃত্তে। ট্র্যাজিক বৃত্তটি সমগ্র ঘটনার পরিস্থিতি নির্যাস ও চেনা-জানা মনে হবে। চরিত্র নির্ধারণে ক্রিয়াশীলতাকে এরিস্টটল প্রাধান্য দিয়েছেন। ট্র্যাজেডিতে সন্নিবেশিত চরিত্রগুলোর মনন বা চিন্তনের দক্ষতা থাকবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে সঙ্গত-সংযমিত, মহৎ বা উন্নততর চিন্তার সামর্থ থাকবে। গদ্য বা পদ্যের তাৎপর্য ভেদ না রেখে সাবলীল কথা বা সংলাপ থাকবে। তাছাড়াও দর্শকের উপর প্রভাববিস্তারী ও ভাবপ্রকাশক সংগীত ও দৃশ্যসজ্জাও আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসেবে এরিস্টটল উল্লেখ করেছেন।

ট্র্যাজেডির বিষয়ের জন্য সঠিক বৃত্ত গঠনের প্রয়োজন অপরিসীম। বৃত্তে তিনটি ভাগ থাকবে—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। যা কার্যকারণ হিসেবে আসে বা সাধারণভাবে থাকে তাই আদি, আর আদিও পরম্পরায় ঘটনা বা পরিণতির দিকে স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে যায় তা মধ্য। আদি ও মধ্য-এর অনিবার্য ফল হিসেবে যা আসে তাই অন্ত্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু ট্র্যাজেডিতে সময় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেজন্য বৃত্তটি ঐক্যনীতির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এরিস্টটল বাস্তবের কোন ঘটনার সরাসরি অনুকরণকে কাব্য বা শিল্প হিসেবে গুরুত্ব দেননি। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ ও কবির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে কবিকে উঁচুমার্গের, ছন্দোবদ্ধ ও শিল্প সৌকর্যের প্রসঙ্গে গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন যে, ইতিহাসবিদ ঘটনার বর্ণনা দেন আর কবি কল্পনাশ্রিত যা যা ঘটতে পারতো তার বর্ণনা দেন। বৃত্তটি আবার সরল, জটিল হতে পারে। মাত্রাবিচারে ৪টি সন্ধির উল্লেখ করেন। তা হলো—প্রোলোগ বা

প্রস্তাবনা, এপিসোড, এক্সোড ও কোরাসগীতি। কোরাস গীতিকে দুটি উপশাখায় বিভক্ত করেছেন—প্যারোড ও স্টেসিমোন। ট্র্যাজেডির চরিত্রের মধ্যে কয়েকটি শর্তের আরোপ করেছেন। চরিত্র হবে বাস্তবের প্রতিরূপ, ভালো ও নৈতিক গুণসম্পন্ন এবং অঙ্কিত চরিত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা থাকবে। কবিকে হতে হবে উঁচুতর উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী। কাব্যের চরিত্রগুলো ও ঘটনা দর্শকের চেনা-পরিচিত বলে মনে হতে হবে। প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতেই গ্রন্থিবন্ধন ও গ্রন্থিমোচন থাকবে। এরিস্টটল ট্র্যাজেডিকে ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এরিস্টটল ভাবদ্যোতক বাক্যের আবশ্যিকতা উল্লেখ করেছেন। তাতে বর্ণ, অক্ষর বা শব্দাংশ, অব্যয়, বিশেষ্য, ক্রিয়া, কারক, বিভক্তির সুসমন্বয় প্রত্যাশা করেছেন।

এরিস্টটলের ঐক্যনীতিতে ঘটনার ঐক্যের দিকে জোর প্রদান করলেও প্রাচীন গ্রীক নাট্যকলার ৩টি নাট্য ঐক্য হিসেবে গৃহীত হতো। সেগুলো হচ্ছে—সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য।

হোরেস প্রাচীন রোমের একজন সাহিত্যতাত্ত্বিক। পরিবেশনা রীতির দিকে তিনি খুব একটা কথা বলেননি। মূলত বাচিক বা বচনিক, ভাষ্যিক বা লেখ্যরীতি প্রসঙ্গে সমধিক কথা বলেছেন। তাঁর epistula ad pisones উল্লেখযোগ্য কাব্যচিন্তা। যা আর্স পোয়েটিকা হিসেবে সমধিক পরিচিত। কবি কল্পনার ঐক্যে তিনি সমুন্নতির দাবী করেছেন। সাধারণ কল্পনা ও কবি কল্পনা এক নয়। কবি কল্পনার উচ্চতর সৃজনবিন্যাস থাকবে এবং সেগুলোর ঐক্য সমন্বিত থাকবে। শব্দ বিন্যাসের ক্ষেত্রে হোরেস অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। শব্দের সঠিক নির্বাচন, সঠিক ব্যবহার কাব্যের অর্থ ব্যঞ্জনাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। শৃঙ্খলা, বিন্যাস, মহিমা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সক্ষমতাই কবির প্রধান গুণ। পূর্বপর সঙ্গতি, সুসামঞ্জস্য, ঐক্যতান শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার ভাষার সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে। সাথে শ্রোতা বা দর্শকের মন জয় করার সম্মোহনী শক্তিও হোরেস অবশ্যম্ভাবী বলে ব্যক্ত করেছেন। কমেডির ক্ষেত্রে উচুঁভাবকল্পনা সমৃদ্ধ ভাষা যদি দর্শকের চিত্তকে স্পর্শ না করে তবে সে ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য বলে মনে করেছেন হোরেস। ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা বাদ দিয়ে দর্শক উপযোগের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হোরেস স্পষ্ট করে বলেছেন—তুমি যদি কাউকে কাঁদাতে চাও তবে তোমাকেও কাঁদতে হবে। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টান্ত

প্রয়োগ করেছেন। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। যদি নব্য সৃজনে বিন্যাসগত সমস্যা হয় তবে চেনা-পরিচিত বিষয় গ্রহণের দিকে হোরেস নির্দেশ করেছেন। উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগে এতই দক্ষ হতে হবে যে, আদি সঙ্গে মধ্যের, মধ্যের সঙ্গে অন্ত্যের সুসামঞ্জস্য থাকতে হবে। বয়স ও প্রকৃতির বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে চরিত্রের আচরণ বিধি থাকতে হবে। এমন কোনো দৃশ্য দেখানো যাবে না যা দর্শককে পীড়িত করবে বরং যদি কষ্টকর বা কষ্টপ্রাপ্ত বিষয়ও উপস্থাপন করতে হয় তবে তা ভিন্ন অনুঘটনে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যে কোনো উপস্থাপনের সময় কাব্যিক মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে হোরেস অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। বাণীভঙ্গির দিকে অত্যন্ত জোর প্রদান করেছেন আর্স পোয়েটিকায়। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দ, যথাযথ ব্যবহার, সঠিক অর্থ প্রকাশক, সৌন্দর্যসৃষ্টিমূলক ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে শব্দ ও বাক্যে। হোরেস স্বভাবগত প্রতিভার চেয়ে চেষ্টাকৃত বা নিরন্তর অনুশীলনকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন।

সাহিত্য-শিল্পতাত্ত্বিক লুঙিনুসের অনন্য সাধারণ কর্ম peri hyspos। যার ইংরেজি পারিভাষিক on the sublime রূপে সমধিক পরিচিত। ফ্রান্সের প্যারিসে পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়'। লুঙিনুসের সাহিত্যতত্ত্বে প্রধান যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে পেরিহাইসপু, যা ইংরেজিতে সাবলিমিটি। বাংলায় প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সমুন্নতি। মূলত উৎকর্ষদ্যোতক গুণই হচ্ছে সমুন্নতি। সাধারণভাবে বলা যায়, চেতনার উচ্চতর অবস্থান ও প্রকাশিত উচ্চতর অভিব্যক্তি। কবির অবচেতনীয় দ্যোতক ও উঁচুমার্গীয় প্রকাশ ও সৃষ্টি। এ উঁচুতর সৃষ্ট যোগ্যতা বা দক্ষতা ও প্রায়োগিক রূপকেই লুঙিনুস অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। এ উচ্চতর ভাবকল্পনাজাত প্রকাশভঙ্গি সহজাত বা প্রকৃতিজাত হতে পারে বা নিরন্তর চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমেও হতে পারে। সেজন্য দেবতাদের সঙ্গে এ চেতনাগত জায়গায় পরোপচিকীর্ষা ও সত্যানুশীল বৈশিষ্ট্যে একীভূত হিসেবে কল্পনা করেছেন। তবে এটা বলা আবশ্যক যে, সমুন্নতিদ্যোতক গুণকে কখনই নিছক কলাকৌশলজাত কোনো বস্তু বলেও লুঙিনুস গণ্য করেননি। সমুন্নত রচনার ক্ষেত্রে শিল্পমূল্য বিচার চিন্তা করলেও লুঙিনুস প্রকৃতিগত এ বিষয়কে শিল্পমূল্যে উৎকর্ষের বলে মনে করেছেন। ট্র্যাজেডি প্রকৃতিগত

ভাবেই অনেকটা ভাবগম্ভীর ও ঐশ্বর্যশালী সেখানেও এ সমুন্নতির অবশ্যম্ভাবীতা নির্ধারণ করেছেন। তবে লুঙিনুস শুধু অহেতুক বাগাড়ম্বরকে ক্ষমার অযোগ্য বলে মত পোষণ করেছেন। সাবলিমিটির ক্ষেত্রে লুঙিনুস ব্যক্তিগত আবেগকে সংযমীয় রাখার গুরুত্ব দিয়েছেন। যেহেতু সৃষ্টি ও উদ্ভাবনী শক্তির মূলেও আবেগ বড় ভূমিকা রাখে সেহেতু আবেগের যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব দিয়েছেন। শৈল্পিক বিষয়ের অধিক ব্যবহারেও তা অশৈল্পিক হয়ে উঠতে পারে। সত্যিকার সমুন্নত ভাবগরিমাপূর্ণ রচনার লক্ষণ হিসেবে বিষয়ের মহত্ত্বকে লুঙিনুস প্রধানত দাবী করেছেন।

লুঙিনুস সমুন্নত রচনার ক্ষেত্রে পাঁচটি উৎকর্ষের উল্লেখ করেন— ১) উদাত্ত গম্ভীর ভাববৃত্ত গঠনের সামর্থ। ২) শক্তিশালী এবং প্রেরণাসম্ভুত আবেগের প্রাণদায়িণী শক্তি। ৩) যথাযথ অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কারের ব্যবহার। ৪) মহৎ কবি ভাষা সৃষ্টির ক্ষমতা, যা অবশ্যই শব্দনির্বাচন, বাকপ্রতিমা ব্যবহার এবং শৈলীর বৈচিত্র প্রকাশের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। ৫) সমুন্নত কল্পনা ও সৃষ্টিশৈলীজাত সামগ্রিক আবেদন। এ সমুন্নতির সুসামঞ্জস্য প্রায়োগীয় দক্ষতাই ঐশ্বর্যদ্যোতক শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয়ে ওঠে। ভাবসমুন্নতি হচ্ছে এক মহৎ মনের প্রতিধ্বনি। তাই লুঙিনুস যোগ্যতা সৃষ্টি লক্ষ্যে আত্মার মহত্ত্বকে প্রধান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নির্ভুল ও সঠিক বিষয়নির্বাচন বা নির্বাচিত ভাব চিন্তার সমবায়িক সুসাদৃশ্যমণ্ডিত, আবেদনময়ী উপস্থাপন হবে। লুঙিনুস আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য প্রদানে বিবর্ধনকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবর্ধনের সংজ্ঞায় উল্লেখ—যখন একটার পর একটা ভাবৈশ্বর্যদ্যোতক হতে হতে এগিয়ে আসে তখন বক্তব্যের কলেবর বা আয়তনের যে বৃদ্ধি ঘটে তাই বলে বিবর্ধন। বিবর্ধন ভাষার সেই শক্তি যা বিষয়কে উচ্চ মহিমা দান করে থাকে। অবশ্য রূপকল্প ও সৃজনী কল্পনার দ্বারা মানসচিত্রের উপস্থাপনা হলে সহজাতই তা উঁচুস্তরের হবে। শিল্পী বা কবির অবশ্যই আলঙ্কারিক চাতুর্য থাকতে হবে। লুঙিনুস ভাষার নানাবিধ ও বৈচিত্রপূর্ণ ব্যবহার, নানা প্রকার ও নানা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ যথাযথ ও যৌক্তিক অলংকার ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবীতা সমুন্নত রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইউরোপকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চার মধ্যযুগখ্যাত অধ্যায়ে সময় পৃথিবীব্যাপী নানা রকমের নাট্যচিন্তার নিরীক্ষা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসকেন্দ্রিক 'কমেডি'

ধারার আধুনিক রূপ পর্যন্ত ৩টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। পুরাতন কমেডি, মধ্য কমেডি ও নতুন কমেডি। ১৫শ শতক থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত ইউরোপের সর্বত্রই 'কমেডিয়া ডেল আর্ত' ও 'মেলোড্রামা' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের মলিয়েরের কমিডিকে আরও জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলেন। ঊনবিংশ শতাব্দিতে ইউরোপে নাট্য উপস্থাপন কৌশলও পাল্টে যায়। এনলাইটমেন্ট ধারণা ও শিল্প-বিপ্লবের ছাপ সমাজজীবনসহ শিল্প-সাহিত্যের সর্বত্র পড়ে। নাটক ও নাট্যপ্রযোজনায়-রোমান্টিসিজম, ন্যাচারালিজম, রিয়ালিজম, সিম্বোলিজম, এক্সপ্রেশনিজ প্রভৃতি উপস্থাপনীয় নানা মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অগাস্ট স্ট্রিনবার্গ, হেনরিক ইবসেনের নাট্যচিন্তায় মানুষের মানবিক বাস্তবতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। স্লানিস্লাভস্কি মনোদৈহিক অভিনয় তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটান। যা ১০টি উপাদানের মধ্যদিয়ে একজন অভিনেতার তার কাঙ্ক্ষিত চরিত্র ও ক্রিয়াদি বিশ্বাসযোগ্য ও শৈল্পিকভাবে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম।

স্তানিস্লাভস্কি অভিনয় ও নাট্যের মোড় পরিবর্তন ঘটলেও মেয়রহোল্ড ও গোস্টস্কির হাতে আরো নতুন মাত্রা যোগ হয়। গোটস্কি শরীরতাত্ত্বিক বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এ সময় স্যামুয়েল ব্রেকেট এবসার্ডিটির দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফলে তত্ত্বের নানা মাত্রা বৃদ্ধি পায়। নাট্য হয়ে পড়ে অন্ধতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক চিন্তন, যৌক্তিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। ব্রেখট প্রথম নাট্যের মোহমায়া থেকে দর্শককে মুক্ত করেন। আধুনিক নাট্যচিন্তনে ব্রেখট মাইলফলক। তাঁর এলিনিয়েশনতত্ত্ব বা বিযুক্তিকরণ তত্ত্ব সমগ্র ইউরোপসহ পৃথিবীর সর্বত্রই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এশিয়ান চীনের 'অপেরা' ও জাপানের 'নো' 'কাবুকি' নির্ভর উত্তর-আধুনিক চিন্তাজাত নিজস্ব শিল্পতত্ত্ব ও নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছে। পাউলো ফেইর থিয়েটারকে শিক্ষণকৌশল পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। ইউনিও বারবা নাট্যকে সামাজিক তত্ত্বকে ভিত্তি করে নাট্য নৃবিজ্ঞান সৃষ্টি করেন। পাওলো ফেইরের শিক্ষাতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে অগাস্টো বোয়াল থিয়েটার চিন্তনকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে জনমানুষের উন্নয়ন কর্ম হিসেবে নতুন তত্ত্বের 'থিয়েটার অব দ্যা অপ্রেসড' নাট্যের উদ্ভাবন ঘটান। এছাড়াও তিনি ইনভিজিবল থিয়েটার, ইমেজ থিয়েটার, জোকার সিস্টেম নামে ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটার তত্ত্বের উদ্ভব ঘটান। আফ্রিকান নাট্য পাশ্চাত্য উপনিবেশ দ্বারা

প্রভাবিত থাকলেও সংগীত নির্ভর ও ঐতিহ্যবাহী নাট্য-চিন্তার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকান পিটার ব্রুক উত্তর-কাঠামোবাদী ধারণায় নতুন নাট্যদর্শনের সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান আমেরিকায় থিয়েটার থেরাপি নামে মনোবৈজ্ঞানিক নতুন থিয়েটার তত্ত্বের ব্যবহার হচ্ছে।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ কার্ল বার্থ, মার্টিন হাইডেগার, লুডভিদ, স্যামুয়েল কোহন, জ্যাক দেরিদা, মিশেল ফুকো, লিওতার্দ প্রভৃতি জনের নানাতত্ত্ব ও উত্তর কাঠামোবাদী নানা ধারণার সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জ্যা বদ্রিয়ার উত্তর-আধুনিক ভাবনার বিকাশ ঘটান। তা বর্তমান বিশ্বের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন, মনোবিদ্যা, সমাজ-রাজনীতি থেকে শুরু করে সর্বত্র প্রভাব পড়ে চলেছে। নাট্য ভাবনায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উত্তর-আধুনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলো সমন্বিত ও সুকল্পিত হবার পূর্বেই বিভিন্ন নাট্য উপাদানের মধ্যে সে বৈশিষ্ট্যগুলো বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান ছিল। উত্তর-আধুনিক নাট্য ভাবনায় এরিস্টটলীয় ভাবনাকে উপেক্ষা করে নাট্যতাত্ত্বিক মিক্ ওয়ালিস বলেন- Post Modren theatre Makes a Pressentation, Not a Repressentation. অন্য নাট্যতাত্ত্বিক প্যাসটিস পেভিসের ভাষায়-Post Modren theatre raises theory to the rank of a playful activity, It suggests as the only inheritance the faculty of replaying the past. Rather than pretending to recreate and absorb it. নাট্যতাত্ত্বিক মেলি ইয়ামুমু উত্তর আধুনিক নাট্য সম্পর্কে বলেন—Post Modren theatre sees the vaious cultural and historical traditions as a vast source of signs… takes on pluralism and multiplicity in style, approach and over all process.

উত্তর আধুনিক ধারণা বিষয় মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা থেকে ক্ষুদ্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাখ্যান বা বিশেষে প্রকাশ করে। উত্তর আধুনিক ধারণায় সত্যের কোনো একক অস্তিত্ব নেই তাই আধুনিকতার মৌল উপাদান বিজ্ঞান ও যুক্তিশীলতাকেও অগ্রাহ্য করে। কোনো জ্ঞানকাণ্ডই সংশয়ের বাইরে নয়। কোনো গ্রান্ড থিয়োরির আদতেও মানবমুক্তির সম্ভাবনায় নেই। এমন কি মার্ক্সবাদ, বিবর্তনবাদ প্রভৃতিকেও অস্বীকার করে। আমাদের চারপাশের বিশ্বপ্রকৃতিই পাঠ্য এবং বিরাজমান প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্যেও ইন্টার-টেক্সয়ালিটি বিদ্যমান যা পরস্পর নির্ভরশীল এবং প্রভাবিত। উত্তর আধুনিক

চিন্তা বিশ্বাস করে—পাঠক বা দর্শক মানেই ব্যাখ্যাকারী। উপস্থাপকের ভূমিকা গৌণ। উপস্থাপন ক্রিয়াটি শুধুমাত্রই চিন্তনের যোগসূত্র। উত্তর আধুনিক শিল্প দর্শনে মনে করা হয় শিল্প উপস্থাপন এমন একটি মুক্ত মাধ্যম যেখানে সব মাধ্যম এমনটি আয়রনি, ম্যাটাফিজিক্স ও হাইপার সাবজিস্টিভিটিকে একত্রে স্থান দেয়। উত্তর আধুনিক নাট্যে বিভিন্ন বিষয় নৈর্ব্যক্তিক, সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ শৈল্পিক মাত্রায় প্রকাশ পায়। দলগত, ঐক্যবদ্ধ ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া পদ্ধতির সমন্বয়ে নৈর্ব্যক্তিক অবৈক্তিক চিত্র, ভাব বা ভাষা ইমেজ উপস্থাপন করে। বর্ণনা বা সংলাপের গুরুত্বের চেয়ে প্যারাডক্সাল ও ইমেজসৃষ্টিতে তৎপর। সবকিছুর সমন্বিত গতি একরৈখিক না হয়ে বহুমাত্রিক ও অন্তর্গত ঐক্য প্রকাশে দর্শকের নিজস্ব চিন্তনের রসদ যোগায়। প্রতি মূহূর্তই হবে একটি ইমেজ বা নাট্যমুহূর্ত যা বর্ণন, বিষয়, চরিত্র, ক্রিয়া, ভাষা, দৃশ্য, সংগীত, অভিনয়, মিডিয়া, এ্যাফেক্ট প্রভৃতি মাল্টিডাইমেনশনালি প্রকাশ থাকে কিন্তু ঐক্যগত সূত্র এক ও অভিন্ন থাকবে। চরিত্রগুলোও একটি মূলভাব, বিষয়, ধারণা ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বিকাশের দিকে যাবে। এ উত্তর আধুনিক নাট্যে দর্শকের উপলব্ধি বা ভূমিকাও বিবেচ্য বিষয়। প্রতি উপস্থাপনায় স্থান, কাল, বিষয়, অনুভূতি, মানসিকতা অনুসারে সৃষ্ট হয় নতুন থিয়েটার। দর্শককে মোহাচ্ছন্ন না রেখে সত্য উপলব্ধির নির্দেশ করে। আত্মদ্বন্দ্বজাত চিন্তনীয় পারিপার্শ্বিক সত্যের প্রকাশ ঘটে থাকে এবং দর্শকও এ ভাবনার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত থাকতে পারে। নাট্য শাব্দিকতার চেয়ে উত্তর আধুনিক নাট্যে পারফরমেন্স বা উপস্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ ভাষার ক্ষেত্রে, অন্তব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে, কোনো ভূ-সীমা না রেখে সার্বজনীন নৈর্ব্যক্তিক ভাষা ও ভাববিন্যাসের প্রকাশ থাকবে। এ ধরনের নাট্যে উঁচু-নিচু এসব ভেদাবেদ বিষয় উপেক্ষণীয়। নাট্য দর্শনে দর্শকের উপলব্ধ ভাবনাই মূল। লিখিত পাণ্ডুলিপির চেয়ে প্রাণান্তর, বৈচিত্রপূর্ণ ও বহুমাত্রিকতার জন্য ইম্প্রোভাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্য উপস্থাপন ও বহুমাত্রিক উপস্থাপনে বদ্ধ পরিকর। প্রখ্যাত উত্তর আধুনিক নাট্যতাত্ত্বিক Mark Fortier-র ভাষায়—এরাবহ technological developments in virtual reality and communications, it is not clear what, if any purpose will be served by live theatre in the not-too-distant... Post

Modern theory sees theatre as a quaint and marginalized activity in warried world, and… whether live theatre even really exists anymore. Some of you may dream of seeing your name up in light on a theatre marquee. But if you are realy looking for fame and fortune shouldn't you be studying film at least of television arts or computers? What is it about theatre that remains compelling for you? Is it just because it there.

উত্তর আধুনিক নাট্য বাস্তবতায় উপলব্দ সত্য উপস্থাপিত করে এবং দর্শককে ব্যক্তিক নির্বিশেষে তাঁর অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধিতে সহায়তা করে। এ নাট্য চিন্তায় দর্শককে প্রশ্নের সম্মুখীন করে কিন্তু উত্তর দেয় না। দর্শকই তার নিজের মতো উত্তর তৈরি করে। বর্তমান বিশ্বে উত্তর আধুনিক নাট্য প্রযোজনা হিসেবে আলোচিত—Fuerzabruta, Hamletmachine, The Real think, Twilight: Los Angeles প্রভৃতি। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের উত্তর-আধুনিক নাট্যচিন্তা স্বাধীন বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশক থেকেই বাংলাদেশের নাট্য প্রযোজনায় বিচ্ছিন্ন ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি ও মঞ্চ ব্যবহারের বহুমাত্রিকতার তুলনায় কম। উত্তর-আধুনিক নাট্য বৈশিষ্ট্য ঢাকা থিয়েটার, সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার, প্রাচ্যনাট প্রভৃতি নাট্যদলগুলো মধ্যে বিদ্যমান। বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষিতে থিয়েটার পেশাদার ও অপেশাদার ভিত্তিতে ক্রিয়াশীল। সাম্প্রতিক বিশ্বনাট্যধারায় নাট্যতত্ত্বের পরিধি বা পরিসর প্রাচীনকালের মতো ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। তা নাট্যক্রিয়ার নানা উপাদান, উপকরণ, রীতি-নীতি ও প্রয়োগকৌশলের ওপর দাঁড়িয়েছে। সাধারণত বর্তমান উত্তর-আধুনিক চিন্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের বিশ্বপ্রেক্ষিতে নাট্যতত্ত্বের পরিসর-মঞ্চ/ মঞ্চস্থাপত্য, দর্শক, প্রযোজনা/ দল/ গোষ্ঠী/ গ্রুপ, কাহিনি/ বিষয়/ চিন্তন/ পাণ্ডুলিপি, অভিনয় শিল্পী, নির্দেশনা / নির্দেশক/ পরিচালক/ অধিকারী, দৃশ্যসজ্জা/ সেট/ দৃশ্যরূপায়ন/ দৃশ্যন, আলো, পোশাক, সংগীত (কণ্ঠ ও আবহ), নেপথ্যকর্ম/নেপথ্য বিধি, নান্দনিকতা, উপস্থাপন কৌশল ও দর্শক প্রতিক্রিয়া, ব্যবহার্য অন্যান্য বিষয়সমূহ ইত্যাদির। যে কোনো তত্ত্ব ও তথ্য সময়-স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে সৃষ্টি। নাট্য প্রযোজনায় প্রধানত সমসাময়িক জীবন-চিন্তার প্রতিফলনই সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে। তাই সমাজ জীবনের যেকোন

পরিবর্তন-পরিবর্ধনে নাট্যশিল্পচর্চায় প্রভাব পড়ে। অধুনা উত্তর আধুনিক বাস্তবতায় নাট্যচর্চায় রয়েছে নানা জ্ঞানতত্ত্বের দার্শনিক নিরীক্ষণ ও একসাথে প্রধান বিনোদনের মাধ্যম। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন থিয়েটার কোম্পানী, পেশাদার-অপেশাদার দল বা গ্রুপগুলোতে নাট্যচর্চা অব্যহত রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বনাট্য ধারায় স্বগৌরবে উজ্জ্বল। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার স্বরূপ, পরিধি, শিল্পমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক তা আমাদের সবারই কাম্য।

[প্রবন্ধটি লিটলম্যাগ 'প্রতিস্বর' এ প্রকাশিত]

‘পালা’ : বাংলার ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব নাট্য

‘পালা’ বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতি। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্যমনস্ক বুদ্ধিজীবী এ পালাগুলোকে ইউরোপীয় ‘ফোক’ তত্ত্বের মধ্যে ফেলে এর প্রাণভোমরাকে মেরে ফেলতে চান। থিয়েটার ইউরোপীয় নাট্যরীতি। থিয়েটারের মতো শিল্পরীতি হাজার বছর ধরেই বাংলায় সংস্কৃতিতে বহমান ছিল। আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা নৃত্য-গীত-অভিনয়-কথোপকথনের অদ্বৈত সমন্বয়ে উপস্থাপিত। যা আবহমান কালের পাঁচালি, পালা, যাত্রা, গাজীর গান প্রভৃতি আঙ্গিক, বিষয় ও রীতিতে প্রতীয়মান। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের পালার মধ্যে আধুনিক থিয়েটার শিল্পাঙ্গিকের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। তাই আবহমানকাল ধরে বহমান পালাকেই অনায়াসে বলা যেতে পারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব নাট্য বা থিয়েটার। আমরা এ প্রবন্ধে স্বল্প পরিসরে বাংলার নাট্য ঐতিহ্যের সঙ্গে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রচলিত পালাগুলোর বৈশিষ্ট্য; বাংলার নিজস্ব পরিচয়বাহী নাট্যাঙ্গিক হিসেবে পালার স্বরূপ ও যৌক্তিকতা অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত থাকব।

বাংলায় প্রাচীনকালে নাট্যাভিনয় হতো নৃত্য এবং গীতের সহযোগে। কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, প্রাচীনকালে নৃত্য বা নৃত্ত ছাড়া নাটক ছিল না। বুদ্ধনাটক কিংবা তুম্বুরুনাটক—যাই হোক, নৃত্য-বাদ্য ছিল। সে সময়ের নাট্যরীতিতে কোনোটি বর্ণনানির্ভর আবার কোনোটা বা উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রাধান্যে পরিবেশিত হতো। তবে প্রতিটির সঙ্গেই নৃত্য-গীত

কমবেশি জড়িত ছিল। পালযুগে চন্দ্রগোমীর 'লোকানন্দ' বা বৌদ্ধ নাটকগুলো নৃত্য-গীত সহযোগে বিভিন্ন বিহারগুলোতে কিংবা বিহারের বাইরে প্রদর্শিত হতো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত চর্যাগীতিকাগুলোর ১৭ সংখ্যক চর্যার দৃশ্যকল্পে গান্তি দেবী নৃত্যপর আর বুদ্ধনাটক সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে নৃত্য-গীতনির্ভর নাট্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। চর্যাপদে ডমরু বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের উল্লেখও পাওয়া যায়।

আদি মধ্যযুগের নেটো বা নাটুয়া নৃত্য-গীত ও অভিনয় সহযোগে পালা আকারে পরিবেশিত হতো। নাটুয়া ছিল অনেকটা যাত্রার ফর্মের মতো। তবে তা ছিল গীতল। সাথে বাদক দল থাকতো। বন্দনা দিয়ে পরিবেশনা শুরু হতো। নানা কৌতুকপূর্ণ অভিনয়ও সংযোজিত থাকতো। নানা ধরনের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় আশ্রিত ছিল এ নাটুয়ার পরিবেশনা। মধ্যযুগের 'রামকীর্তন', 'রায়মঙ্গল', 'রামলীলা', 'কুশান গান' নানা নামে পরিচিত রামায়ণী গান পাঁচালি আঙ্গিকে পরিবেশিত হলেও তা ছিল একধরনের পালাভিনয়। আসর কেন্দ্রিক ছিল রামায়ণের উপস্থাপনা। মূল গায়েন দুই হাতে দুই চামর দুলিয়ে রসভারে অভিনয় করতেন। সংগীত দ্রুত, উত্তেজিত নৃত্য, অঙ্গভঙ্গি সহকারে উপস্থাপন হতে দেখা যেতো। এতে কাহিনির বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করার জন্য গায়েন বা দোহার বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করত। মুসলিম শাসনের কারণে 'ইউসুফ জুলেখা', 'রসুলবিজয়' প্রভৃতিও পাঁচালি কিংবা পালা আঙ্গিকে পরিবেশিত হতো। মনসা দেবীকেন্দ্রিক মঙ্গলনাট্য সমকালে 'মনসার গীত', 'পদ্মার নাচন', 'রয়ানী গান', 'পদ্মপুরাণ', 'বেহুলার নাচাড়ি', 'ভাসান যাত্রা', 'কান্দনী বিষহরির পালা' নানা নামে পরিচিত।

বাংলা 'পালা', 'পাঁচালি', 'কেচ্ছা', 'কথকতা', 'গান' নানা বৈশিষ্ট্যমূলক পরিবেশনায় ঋদ্ধ। আবহমান বাংলার পালানাট্য চারপাশে দর্শকবেষ্টিত খোলা মঞ্চে অভিনীত হতো। কখনো কখনো কৃত্রিম মঞ্চও স্থাপিত হয়। পালাগানে একজন মূল গায়েন বা বয়াতি থাকেন। পালার সংগীতকাহিনি ও নাট্যিক উপস্থাপনে দোহারগণ সাহায্য করে থাকেন। 'মালঞ্চমালা' পালা অধিক প্রাচীন। 'মহুয়া', 'কাজল রেখা' চতুর্দশ শতকেই আগেই রচিত হয়েছিল বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। মধুমালার কেচ্ছা, সখিসোনা, মালঞ্চকন্যার কেচ্ছা, কাঞ্চনমালা আর মালতীকুসুমমালা নানা পালার বিকাশ ঘটেছে সে সময়। এ পালানাট্য পঞ্চদশ-ষোড়শ থেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। চিরকালই

বাঙালির শিল্পতৃষ্ণা এ পালাগুলোই নিভৃত করেছে। নৃত্য-গীত ও অভিনয়সহ অদ্বৈত মাধুর্যে উপস্থাপিত হতো। ১৭৫৭ সালে বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে 'থিয়েটার' নামে ইউরোপীয় তত্ত্বের আড়ালে হারিয়ে যেতে থাকে আমাদের নাট্য ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সবকিছু।

এ পালা নাট্যের প্রধান ভাণ্ডার বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল। বর্ণনা, বন্দনা, নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের অদ্বৈত মিলনে কাহিনিনির্ভর এ নাট্যধারা। আধুনিক থিয়েটার তত্ত্বের সামগ্রিক উপাদানই এতে আছে। এমনকি রিচার্ড শেখনারের পারফরম্যান্স থিয়োরির তাত্ত্বিক ভিত্তিতে পালা আঙ্গিকের পরিবেশনার মধ্যে লক্ষ করা যায়। বৃহত্তর বঙ্গভূমিতে পালানাট্য যেমন যুগে যুগে মানুষের শিল্পতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে তেমনি বর্তমানেও গ্রামীণ পর্যায়ে পালা অত্যন্ত জনপ্রিয় নাট্য আঙ্গিক। 'পালা' নাট্যের রূপরীতি কেমন? সাধারণত পরিবেশনযোগ্য কাহিনিকেই পালা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যদিও কাহিনিনির্ভরতার কারণে সম্প্রতি অনেকে কিচ্ছাগান বলেও অভিহিত করে থাকেন। বাঙালি জীবনে পালা নানা বিষয় ও বিন্যাসে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। বৈশিষ্ট্য ও বিষয় অনুসারে পালা ভিন্ন ভিন্ন নামেও পরিচিত। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য দিনে পরিবেশিত হলে বলা হতো দিবাপালা আর রাত্রিকালে উপস্থাপিত হলে বলা হতো নিশাপালা। বর্তমান বাংলাদেশে মানবীয় প্রেম-আখ্যান নিয়ে নানা নামকরণে পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ নাট্যাঙ্গিকটি সাধারণত চারপাশের খোলা মঞ্চে অভিনীত হয়ে থাকে। কখনো কখনো কৃত্রিম মঞ্চও স্থাপিত হয়। এতে সাধারণত লোকায়ত বিষয়বস্তু এবং বাঙালি জীবনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রেম-ভালোবাসাসহ নানা বিষয় ও চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন—মহিষাসুরবধ পালা, মহুয়া পালা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী পালা ইত্যাদি। পালাগানে সাধারণত একজন গায়েন বা বয়াতি থাকতে দেখা যায়। পালার সংগীতকাহিনি ও নাট্যিক উপস্থাপনে দোহারগণ সাহায্য করে থাকেন। পালাগানের কবিকে সাধারণত পদকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। পালার বৈশিষ্ট্যে বর্ণনা, ঘটনা, চরিত্র, অভিনয়, সংগীতনৃত্য ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে।

ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসনের রাজধানী কলকাতা হওয়ায় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসকরণে পূর্ব বাংলা কিছুটা অপ্রকাশ ও অমূল্যায়িত থেকেছে সবসময়। এ অঞ্চলের পালানাটের প্রথম খবর কলকাতায় পৌঁছে এশিয়াটিক

সোসাইটির মাধ্যমে। ১৯১৩ সালে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায় ময়মনসিংহের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী বিষয়ক আলোচনায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের পালার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে এ পত্রিকায় দু-একটি পালা প্রকাশের সংবাদও পাওয়া যায়। এতে দীনেশচন্দ্র সেন পালা সম্পর্কে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সে প্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালে দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমার দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে সময়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তার সানুগ্রহে চন্দ্রকুমারকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলে পালা সংগ্রহ নিযুক্ত করেন।

সংগৃহীত পালাগুলো থেকে বাছাই করে ১০টি পালা নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি অনুবাদে Estern Bengali Ballads, Mensingha part-1 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে এটি বাংলায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। মৈমনসিংহ গীতিকায় সংগৃহীত পালাগুলো হলো—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা। এগুলোর পালাকার হলেন দ্বিজ কানাই (মহুয়া), নয়ানচাঁদ ঘোষ (চন্দ্রাবতী), দ্বিজ ঈশান (কমলা), চন্দ্রাবতী (দস্যু কেনারামের পালা), মনসুর বয়াতি (দেওয়ানা মদিনা), দামোদর দাস, রঘুসুত, শ্রীনাথ বিনোদ ও নয়ানচাঁদ ঘোষ (কঙ্ক ও লীলা)। অন্য পালার পালাকারদের নাম অজ্ঞাত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. দীনেশচন্দ্র সেন পালাগুলোকে 'ব্যালাড' হিসেবে তত্ত্ববদ্ধ করেন।

১৯২৬ সালে দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহের পাশাপাশি নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকেও কিছু পালা সংগ্রহ করে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে ১৯৭১-৭৫ সালে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকও সাত খণ্ডে প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে গ্রন্থ প্রকাশ করে। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় উল্লেখযোগ্য পালাগুলো—'ধোপার পাট', 'মইষাল বন্ধু', 'কাঞ্চনমালা', 'কমলা রাণীর গান', 'মদনকুমার ও মধুমালা', 'পরীবানুর হঁলা', 'মলকাবানু মনুমিয়ার হঁলা', 'নছর মালুম', 'দেওয়ান মনোহর ও মজুনা', 'নেজাম ডাকাতের পালা', 'দেওয়ান ঈশা খাঁ', 'মাঞ্জুর মা', 'কাফনচোরা', 'ভেলুয়া', 'হাতি খেদার গান', 'আয়না বিবি', 'কমল সদাগর', 'চৌধুরীর লড়াই', 'গোপিনী কীর্তন', 'সুজা তনয়ার বিলাপ', 'বার তীর্থে গান', 'নূরুন্নেছা ও কবরের কথা', 'বগুলার বারমাসী', 'শিলাদেবী', 'ভারাইয়া রাজা' ইত্যাদি। এ সংকলনের অনেক পালা কখনো সরাসরি, আবার কখনো ভাষাগত দিক ও বিষয় বিবেচনায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিংবা ময়মনসিংহ ঘেঁষা।

ভাষা, বিষয়, সংখ্যা ও শিল্পগুণ বিচার করলে দেখা যায় পালানাট্যের মূল ভূ-খণ্ড বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল। ১৯৬০ সালে বদিউজ্জামানের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে 'মোমেনশাহী গীতিকা' নামে আরেকটি পালার সংকলন প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়—'সোনাই বিবি', 'চিলাই রাণী', 'মনোয়ার খাঁ দেওয়ান', 'তোতা মিয়া', 'মাধব মালঞ্চী কন্যা', 'গফুর চান ও আইধর চান' প্রভৃতি পালা।

'মোমেনশাহী গীতিকা'র পালাগুলোর মধ্যে 'মাধব মালঞ্চী কন্যা'র চরিত্র, সংলাপ, বর্ণনা প্রভৃতি নাট্যগুণ আধুনিক নাটকের মতোই মনে হয়। তাই তখন প্রশ্ন জাগে পালাকারের কাছ থেকে শোনে সংগ্রাহকের লেখাকে দীনেশচন্দ্র সেন কেটে ছেঁটে ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিল করতে ব্যালাড প্রতিপন্ন করেছেন কি না। মৈমনসিংহ গীতিকার পালাকে কাব্যগীত বৈশিষ্ট্য প্রধান মনে হয়। এতে রয়েছে কাহিনির বর্ণনামূলক ছান্দিক গীত। 'মাধব মালঞ্চী' পালাটির সংগ্রাহক ছিলেন মোহাম্মদ সাইদুর। প্রচলিত এ পালাটি তিনি কিশোরগঞ্জের নিকলী থানার অন্তর্গত গোপদিঘি এলাকার ইব্রাহিম বয়াতির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এর প্রকৃত পালাকার কে তার নাম জানা যায় না। তবে ইব্রাহিম বয়াতি এ পালা ৩০-৩৫ বছর আগে স্বগ্রামে কাউছার বয়াতির কাছ থেকে শেখেন। এ পালার মধ্যে গদ্যে বর্ণনা, উক্তি-প্রত্যুক্তি ও গানের অদ্বৈতনীয় মিশ্রণ আছে। বাংলা একাডেমি মোমেনশাহীর পশ্চিম পাড় দিঘলি অঞ্চলের মোহাম্মদ আমজাদ হোসেনের কাছ থেকেও 'মাধব মালেঞ্চার গান' নামে আরেকটি পালা সংগ্রহ করেছে।

পালার গায়কি ঢঙের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র গ্রন্থের পালার সাদৃশ্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন ড. সুকুমার সেন। ড. সেন এ পালাগুলোকে কখনো ফোক বলেন নাই। বরং নাটকই বলতে চেয়েছেন। পালার মঞ্চ, গল্প, বর্ণনা, সংলাপ, গীতময়তা, বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার ও পরিবেশনারীতি প্রমাণ করে এ পালাগুলো মূলত নাট্য। এটিই বাংলার ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব নাট্য বা থিয়েটার। বর্তমান ময়মনসিংহের প্রচলিত পালাগুলোতেও দেখা যায় গায়েন-দোহারের কথোপকথন, বর্ণনা, গল্পকথন, সংলাপ, অভিনয় ও নাট্য উপকরণে সমৃদ্ধ। তবে রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ, শিক্ষা ও প্রযত্নায়নের অভাবে পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধে সমকালীন বিশ্বজ্ঞানে এ পালা শিল্পমাধ্যমটি এখনো পুরো বিকশিত হতে পারেনি।

সম্প্রতি বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা প্রজেক্টের অধীনে ৬৪ খণ্ডে জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। তাতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের পালাগুলো দেখলে বিস্মিতই হতে হয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইন্টারনেটের যুগে এসেও পালা নাট্যে এ অঞ্চলের মানুষ শিল্পতৃষ্ণার পথ খোঁজে। এ সংকলন গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী হলেন— শামসুজ্জামান খান, মো. আলতাফ হোসেন এবং আমিনুর রহমান সুলতান।

বর্তমানের প্রচলিত প্রতিটি পালায় রয়েছে নাট্যীয় উপকরণ। পালার প্রতিটি বয়াতিই যেন ব্রেখটের এলিনিয়েশন তত্ত্বের মতোই বিমুক্তকরণ করছে। প্রায় নিরক্ষর পালাকার বয়াতিরা দর্শককে ঘোরের মধ্যে না ফেলে যেভাবে বিযুক্তিকরণের পথে হাঁটেন, তা অবিশ্বাস্য। এমনকি উপকরণে বাস্তববাদী অভিনয় তাত্ত্বিক স্তানিস্তাভ্লস্কি তত্ত্বকেও হারিয়ে বাস্তব-কল্পনা, শিল্পবোধের বাস্তব সত্যে আনন্দে হাঁটেন। বালিশের মতো সামান্য উপকরণ দিয়েই তৈরি করেন দৃশ্যপটের কাল্পনিক সৌধ। পালাগুলোতে আছে গল্প বা বিষয়, চরিত্র, কথোপকথন, গীত ও উপস্থাপন।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ এখন নানা জেলায় বিভক্ত। সমকালে জামালপুর অঞ্চলে সবচেয়ে জনপ্রিয় পালা 'খায়রন সুন্দরী'র উপস্থাপনরীতিতে নাট্যের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। এতে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপন আছে। বয়াতির বর্ণনায় নাচনেওয়ালি থেকে শুরু করে খায়রন, ভাবী, ঘটক, আকবর মাস্টার, আলাউদ্দিন, রফিক, বড়বাবু, ছোটবাবু, ইন্সপেক্টর, সিপাহি প্রভৃতি চরিত্র লক্ষ করা যায়। বয়াতির বর্ণনায় যেন দৃশ্যকল্পেরই সৃষ্টি হয়ে থাকে। শেকসপিয়রের ওথেলোর মতোই মিথ্যা সন্দেহ ও অবিশ্বাসে খায়রন নামের এক শুদ্ধ শুভ্র নারীর করুণ পরিণতিই এর মূল উপজীব্য। ইসলামপুরের রামভদ্রা গ্রামের তৈয়বুর রহমান বয়াতির কাছ থেকে ২০০৪ সালে সংগৃহীত 'খায়রন সুন্দরী' পালাটি অনেকটাই সংলাপাত্মক।

হরিশ্চন্দ্রের দিঘির করুণ কাহিনি নিয়ে জামালপুরে চন্দ্রাবতী পালা নামেও একটি পালার সন্ধান পাওয়া যায়। যা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'তওফিক' নামে একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি নৃত্যনাট্য হিসেবেও পরিবেশিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে জামালপুর অঞ্চলে 'বেহুলার নাচাড়ি' পালা জনপ্রিয়। সরিষাবাড়ীর মোহাম্মদ ফজল বয়াতি ও মোহাম্মদ সাজাহান এ পালা করে থাকেন।

জলিল খানের সংগ্রহে সাম্প্রতিক জামালপুরের নানা পালানাট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'হুরমুজ আলী', 'সোনারাম বাদশাহ', 'পরানপাখির

কিসসা', 'দুধ কমল বত্রিশ দাঁত', 'রূপচান ও সুরতভান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো প্রতিটিই নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। 'পরানপাখির কিসসা'র পালা শুরু হয় গায়েনের বন্দনা দিয়ে।

গায়েন : প্রথমে বন্দনা করি আল্লা নবীর নাম (১)
জামাল বাবার নামে তারপর জানাই গো ছালাম
স্মার করি তারপর আমি মহির উদ্দিন নাম
বাইন্ধা ছিলেন যেইন গায়েন ইইনা কিচ্ছা গান
যার কাছ থাইক্যা পাইলাম আমি এইনা কাহিনি
মহির গায়ের নাতি নাদশার কাছে রইলাম ঋণী

সমবেত :
হে পরান পাহীন কিসসা ভাইরে
পরান পাহীর কিসসা খান
হুনেন মন দিয়া ভাইরে হুনেন মন দিয়া বোইরেরে
হুনেন তারপর কি বয়ান।
গায়েন : জামালপুর টাউনের পূর্বে রঘুনাথপুর গেরাম
সেই গেরামে ঘইটাছিল এই ঘটনা খান/ভাইরে

সংলাপ
জবান : চেঙ্গার গড় থনে আইলাম আমি কথাবার্তা ঠিক
শুক্কুরবার তা ভালা দিন মরিচ রাঙাই টিক
পরান : আমি ও বিয়া করমু না।
জবান : আমি তোর বড় ভাই ভুইয়া যাও ক্যান ভাই
আমার ইজ্জাত বংশের ইজ্জত তলাইওনা ভাই
বিয়া অবই মনে রাইখো তোমার ভালাই চাই।
পরান : আমি ও বিয়া করমু না গো করমু না মিয়া ভাই।

কিশোরগঞ্জ জেলার অন্যতম জনপ্রিয় পালা 'চন্দ্রাবতী'। চন্দ্রাবতীর জীবন আশ্রিত এ পালাটি যেন আধুনিক নাটক। দীনেশচন্দ্র সেনের নয়ানচাঁদ ঘোষের চন্দ্রাবতী এখন যেন নতুন সুরে ঝংকৃত। এ পালাতে বয়াতির বন্দনার মধ্য দিয়ে কাহিনির আরম্ভ হয়। পালাটি দৃশ্য বিভাজনে উপস্থাপন হয়ে থাকে। গান ও সংলাপ মিলে পালাটি একাকার। পালাটির দ্বিতীয় দৃশ্যে ভেসে আসে মুরগির ডাক। আজানের ধ্বনি। পাখির কলকাকলি। ফুলেশ্বরী তীর ঘেঁষে

সূর্যোদয়। ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে ফুলের সাজি হাতে চন্দ্রাবতী বাগানে ফুল তুলতে যায়। সেখানে জয়নন্দের আগমন ঘটে—

চন্দ্রাবতী : চাইর কোণা সারি বান্দা চম্পা নাগেশ্বর
ডাইল নোওয়াও পুষ্প তুলবাম রসিক নাগর—
গো রসিক নাগর।
জয়ানন্দ : আমি ধরি ডাইল কইন্যা তুমি তুল ফুল
রক্ত জবা যুঁই চামেরি ধুতরা বকুল—
গো ধুতরা বকুল।
চন্দ্রাবতী : প্রভাতে আইলাম আমি পুষ্প তুলিবারে
বাপেতে করিব পূজা শিবের মন্দিরে
গো শিবের মন্দিরে
জয়ানন্দ : বাইছ্যা বাইছ্যা গেন্দা তুল মালতার হার
ফুলের মধু কায় ভোমরা রঙিন বাহার
গো রঙিন বাহার।

নয়ান চাঁদ ঘোষের 'চন্দ্রাবতী' পালাটি বর্তমানে বিজয়কান্তির নব উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বলে জানা যায়। বীরাঙ্গনা সখিনার পালাতেও চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্ববহ হয়ে ওঠেছে। উপস্থাপনায় যেসব চরিত্র বিন্যাস দেখা যায়—বয়াতি; ফিরোজ, উমর, বেগম আম্মা, সখিনা, দরিয়া, তসবীর, ওয়ালী, উজিরদ্বয়, বাদি, সৈনিক, রাজ নর্তকী ও প্রজাবৃন্দ প্রভৃতি। এ বীরাঙ্গনা সখিনাও কিংবদন্তি গাঁথা। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে বহুকাল ধরে প্রচলিত 'বীরাঙ্গনা সখিনা'র পালাটি লোকগীতিকার মুক্তি চৌধুরী নতুন আদলে রচনা ও সুরারোপ করেছেন। এ পালাটিও কিশোরগঞ্জে জনপ্রিয়। সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে সায়িক সিদ্দিকী পালাকার হিসেবে খুবই পরিচিতি পেয়েছেন। তার 'ভানু সুন্দরীর পালা', 'রূপচাঁন সুন্দরীর পালা' অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের মহুয়া পালা পুরোপুরি নাট্য। ইউরোপীয় নাট্যতত্ত্বের সামগ্রিক উপকরণগুলোই এর মধ্যে দেখা যায়। সম্ভবত ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে দ্বিজ কানাই 'মহুয়া' পালাটি রচনা করেছেন। এর কাহিনি গড়ে উঠেছে এক বেদে কন্যা মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রেমকে উপজীব্য করে। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে মুক্তি চৌধুরী সম্পাদিত কাহিনিটি পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার নানা থানাতেই ঐতিহ্যবাহী নানা বৈশিষ্ট্যের নাট্য প্রচলিত আছে। ফুলবাড়িয়ার ঘাটুগান খুবই জনপ্রিয়। ঘাটু গানে তারা

নৃত্য-গীত ও অভিনয়ে নাট্য উপস্থাপন করে। কখনো কখনো সংলাপাত্মক ধারায় কাহিনির বিকাশ ঘটে। ত্রিশাল ও মুক্তাগাছাতেও ঘাটুগান লক্ষ করা যায়। ভালুকা থানার নিঝুরি গ্রামের চান মিয়ার গাজীর গানের গায়ক হিসেবে খুব নামকরা। গৌরীপুরের শামীম বয়াতি ও তার দল বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গাজীর গান গেয়ে থাকেন। এ ছাড়াও হালুয়াঘাটের গাজীর গান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এর পরিবেশনারীতি নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের অদ্বৈত উপস্থাপন। নানা ভণিতা নাচাড়ি থাকে এতে।

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর, ত্রিশাল ও মুক্তাগাছায় এখনো বাইদ্যার পালা খুবই জনপ্রিয়। কখনো কখনো একে বাইদ্যার গান বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটি মূলত গান প্রধান নাট্যপালা। আধুনিক নাটকের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এতে লভ্য—

উমরা : আইলরে শিকারী বাইদ্যা
তীরের কাড়ি লইয়া নারে
শরের কাডি লইয়ারে।
ভানুমতী : তামশা করিতে আইলাম
বাইদ্যার নারী
রূপেতে উজ্জলা লইতে
নইদ্যা ঠাকুরের বাড়ি।
দোহার : বাইদ্যা নাচে বাইদ্যানি নাচে
আরো নাচে ঘোড়া
চন্দ্রাবতী নাচতে লাগলো
লইয়া ফুলের মালা রে।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥

ঈশ্বরগঞ্জের নাট্যপালার মধ্যে 'সতী হরবোলা ও রূপকুমার পালা' অন্যতম। এগুলো আসরভিত্তিক গায়েন-দোহার কেন্দ্রিক নৃত্য-গীত, অভিনয়ের অদ্বৈত সুরে উপস্থাপিত।

টাঙ্গাইল জেলার বর্তমান জনপ্রিয় পালা হচ্ছে—'চন্দ্রতাপের পালা', 'গাজী কালু ও চম্পাবতীর পালা'। তা ছাড়াও টাঙ্গাইল অঞ্চলের 'বেহুলা ভাসান' ও 'সংযাত্রা' খুবই জনপ্রিয় নাট্য আঙ্গিক। বর্তমান শেরপুর জেলাতে নানা পালাই যুগ যুগ ধরে দর্শকের শিল্পতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে। তারমধ্যে পুষ্পমালা, লালবানু, জরিনা সুন্দরী, আলাল দুলাল, কংসবধ, নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি খুব উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান শেরপুর অঞ্চলে 'মেহের নিগার', 'আলোমতির পালা' জনপ্রিয়। এ পালাগুলো পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছে শ্রীবর্দী থানার খাটিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা মেম্বর মো, জহুর হকের কাছ থেকে। শেরপুর অঞ্চলে 'গুনাইবিবির পালা' অত্যন্ত জনপ্রিয়।

উপনিবেশ সময়ে ইউরোপীয় শাসনে বাংলায় পরিভাষাগত নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপে থিয়েটারের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয় ষোড়শ শতকে। থিয়েটার শব্দটি গ্রিক শব্দ *theatron* থেকে উদ্ভূত। ইংরেজিতে থিয়েট্রন বলতে বোঝায়—seeing place সাধারণত কোনো স্থানিক আয়তনে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কোনো বিষয়/ঘটনা/চিন্তা-দর্শনকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করাকে বলে থিয়েটার। থিয়েটার বা নাট্যের সঙ্গে বেশ কিছ বিষয় জড়িত থাকে—কুশীলব, কাহিনি বিন্যাস বা নাট্যীয় উপকরণ, স্থায়ী/অস্থায়ী মঞ্চ, দর্শক। কাহিনি বিন্যাস—এটি লিখিত বা অলিখিত দুটোই হতে পারে। নাট্যজন শম্ভুমিত্র থিয়েটারের বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'নাট্য' আর ড্রামা বা প্লের প্রতিশব্দ করেছে 'নাটক'। আধুনিক থিয়েটারে পোশাক, দৃশ্যসজ্জা, আলো, আবহসংগীত এবং চরিত্র বা নাট্য ক্রিয়ার ব্যবহার্য দ্রব্যাদি থাকে। এক বা একাধিক সৃজনশীলকর্মী একটি লক্ষ্যকে উদ্দিষ্ট করে নাট্যক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এ নাট্য শুধু একটি মঞ্চস্থাপত্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা উন্মুক্ত স্থান, ধর্মীয় স্থান, হাট-বাজারে কৃত্রিম মঞ্চ, রাস্তাঘাটে, পার্কে, স্কুল-কলেজে, ক্লাব ইত্যাদিসহ প্রচলিত নাট্যমঞ্চেও প্রদর্শিত হয়। নাট্যিক উপকরণে চরিত্র, দ্বন্দ্ব, সংলাপ ইত্যাদি বিষয় জড়িত থাকে। নাট্যজন সৈয়দ জামিল আহমেদ তার 'থিয়েটার কি' প্রবন্ধে থিয়েটারের যে উপকরণগুলোকে আবশ্যক মনে করেছেন তা হলো—দর্শক, কুশীলব, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও অভিনেয় স্থান। যদি আমাদের ভূখণ্ডের সংস্কৃতির দিকে তাকাই তাহলে দেখব হাজার বছর পূর্ব থেকেই প্রায় একই বৈশিষ্ট্যের রীতি বিদ্যমান ছিল। স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থানিক উপকরণ ছিল, অভিনয় ছিল, দ্বন্দ্ব, সংলাপ, জীবনের ব্যাখ্যা সবই ছিল। ঐক্যনীতির ওপর নির্ভরশীল নয়; এ ভূবৈশিষ্ট্যের কারণেই গীতলতার প্রবহমানতা ছিল। সে শিল্পমাধ্যম নানা জনগোত্রে নানা নামে নানারূপে বিদ্যমান ছিল। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের পালাগুলো গায়েন-দোহার সমন্বয়ে নৃত্য-গীত, গল্প, কথোপকথন-অভিনয়ের অদ্বৈত ধারায় উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। কিন্তু ইউরোপের থিয়েটারে যৌথ চরিত্রের সমাবেশ ঘটে। প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক বলতে যা বোঝায় তা গীত-অভিনয়-গল্পনির্ভর পরিবেশনা। মধ্যযুগের বাংলায় পাঁচালি, পালা, জারি,

কীর্তন, যাত্রা—এগুলোর পরিবেশনা চারদিকে দর্শকবেষ্টিত স্থায়ী বা অস্থায়ী মধ্যমঞ্চে উপস্থাপিত হতো। এগুলোকেই ইউরোপীয় পরিভাষায় আমাদের থিয়েটার বলতে পারি। কিন্তু উপনিবেশবাদী মানসিকতার বুদ্ধিজীবী সাধারণত প্রসেনিয়াম স্টাইলে চরিত্রনির্ভর দ্বন্দ্ব-সংলাপে উপস্থাপিত না হলে তাকে থিয়েটার বলতে নারাজ। প্রকৃতপক্ষে দুটি দুই ভূখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল। বাংলা নাটক ইউরোপ থেকে আমদানি হয়নি; হাজার বছর ধরেই এ ভূখণ্ডে নাট্য বিদ্যমান ছিল। পালা আমাদের বাংলাদেশের আবহমান নাট্য বা থিয়েটার। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'পালা' রীতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের নাট্য ঐতিহ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের বাস্তববাদী, চরিত্রাভিনয় ও অকৃত্রিম দৃশ্যনির্ভর নাট্য উপস্থাপনাকে স্থূলরীতি হিসেবে তাচ্ছিল্য করেছেন। তিনি বলেছেন—

> *বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য; তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতী পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ...বাগানকে যে অবিকল বাগান আটকিয়াই খাঁড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে। ...ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।*

পালার মধ্যে আধুনিক নাট্যতত্ত্বের সমস্ত গুণই রয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিল্প-সাহিত্য তত্ত্ব আমাদেরকে পাশ্চাত্যমুখী করেছে। বাংলা নাট্য বৈশিষ্ট্যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। বাংলার ঐতিহ্যিক নাট্যরীতি নৃত্য-গীত-কাহিনি-কথন-অভিনয়-নাট্য উপকরণের অদ্বৈত বিন্যাসে উপস্থাপিত। চারদিক দর্শকবেষ্টিত মধ্যমঞ্চে তার উপস্থাপনরীতি। এখনো বাংলাদেশের নানা প্রান্তে পালা-জারি-যাত্রাগুলো চারদিকের দর্শকবেষ্টিত অস্থায়ী মধ্যমঞ্চে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। অবাক হতে হয় যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে জাতীয় নাট্যশালা শীর্ষক স্থাপত্য তৈরি করলেও ঐতিহ্যবাহী পালা নাট্যের কোনো মঞ্চ নেই।

সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পাঁচটি মঞ্চই ইউরোপীয় রীতির। জাতীয় শিরোনামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম মঞ্চ। উপনিবেশ মনস্কের প্রেতাত্মা থেকে বের হওয়া প্রয়োজন। দেশীয় ঐতিহ্যের বিকাশের স্বার্থে 'জাতীয় বাংলা নাট্যমঞ্চ' স্থাপন জরুরি। পালাগুলো বাংলার নিজস্ব নাট্যসম্পদ। বিশ্বজ্ঞান এর মধ্যে প্রযুক্ত হোক। নানা নিরীক্ষা, নানা পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতায়, নানা জ্ঞানে এ পালানাট্যের বিকাশ ঘটুক। অতীত বেয়ে আধুনিকতা মাড়িয়ে নিজস্ব পরিচয়ে উদ্ভাসিত যেন হয়ে ওঠি। বাংলাদেশ নিজস্ব ও আত্মপরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠুক বিশ্বে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.), মৈমনসিংহ গীতিকা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, মুদ্রণ-২০১৩
২. বদিউজ্জামান (সম্পা.), মোমেনশাহী গীতিকা, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬০
৩. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা.) প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা
৪. সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬
৫. সাইমন জাকারিয়া, বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৮
৬. সাইদুর রহমান লিপন, বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০
৭. আবু সাঈদ তুলু, নাট্য ঐতিহ্য ও বাংলাদেশের নাটক, অন্বেষা, ঢাকা, ২০২০
৮. আলীম আল রাজী, বাংলা লোকনাট্য পালাগান : প্রকৃতি ও প্রয়োগ, বাংলা একাডেমি, ২০১০
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্র প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী, বোলপুর, পশ্চিম বাংলা
১০. শামসুজ্জামান খান, মো. আলতাফ হোসেন, আমিনুর রহমান সুলতান (সম্পা.) বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ২০১৯
১১. Ahmed, Syed Jamil, Achinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh, University Press Ltd. Dhaka, Bangladesh, 2000
১২. Willmar Sauter, Understanding theatre: performance analysis in theory and practice, Almqvist & Wiksell, 1995
১৩. Edwin Wilson, *The Theatre Experience*, Mccraw Hill Book Company, New York, third edition 1985
১৪. Richard Schechner, PERFORMANCE STUDIES An introduction, Third edition, Rountle, 2013

প্রবন্ধটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংকৃতিক ফোরামের ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'ব্রহ্মপুত্র' তে প্রকাশিত। সম্পাদক : রাশেদুল হাসান শেলী।]

ঐতিহ্যের ধারায় বাংলাদেশের নাট্যচর্চা

বাঙালি জাতির ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। দীর্ঘ ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বাংলাদেশি বাঙালি। বাংলার প্রাচীন পর্বের শিল্প-সাহিত্য প্রধানত উপস্থাপন কেন্দ্রিক ব্যাপ্ত ছিল। তা ছিল স্মৃতিনির্ভর কিংবা হস্তলিখিত। বাংলা পরিবেশনা শিল্পকৌশলের প্রায় সমস্তটাই বৌদ্ধ-মুসলিম-হিন্দু, সূফি-বৈষ্ণবীয় ঘরানায় সুগঠিত হয়েছিল। বাংলা নাট্যের জীয়ন্তকাল মধ্যযুগে মুসলিম পর্বেই। সেলিম আল দীন ভরত নাট্য শাস্ত্রে উল্লিখিত 'ওড্রমাগধী' আঞ্চলিক রীতি হিসেবে বৃহত্তর বাংলা ভূখণ্ডের নাট্য প্রবৃত্তির পরিচয় সনাক্ত করেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নির্দশন 'চর্যাপদ' এ 'নাচন্তি বাজিল গান্ধি দেবী বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই' উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে এ সময়ে বৃহত্তর বাংলায় নাট্য অস্তিত্বের সমূহ প্রবহমানতা ছিল বলে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। বাঙলার প্রাচীনযুগের 'সেখ শুভোদয়া' 'শূন্যপুরাণ' 'গীতগোবিন্দম' প্রভৃতিও ছিল পরিবেশনা। চর্যায় 'এক সো পদুমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ী, তঁহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ি' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমকালীন বৃহত্তর বঙ্গ সংস্কৃতির মধ্যে নাট্য পরিবেশনা শিল্পের নানা উপাদান ও উপকরণ বিধৃত হয়ে ওঠে। পাল শাসন অধিভুক্ততায় বিভিন্ন ভাস্কর্য, পুথিচিত্র প্রভৃতিতে বাংলা অঞ্চলের নৃত্য সংবলিত নাট্যের অস্তিত্বের প্রামাণ্য তৈরি করে। বাংলা সংস্কৃতির মধ্যযুগের ইসলামী শাসনাধ্যায়ে সাহিত্য ও শিল্প সমস্তই ছিল পরিবেশনা। আসর-দর্শক-গায়েন-দোহারের সমন্বিত পরিবেশনমূলক আখ্যানই সাধারণত নাট্য রূপে বিবেচ্য।

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুলতানী-মোঘল শাসনযুগের অন্যতম নাট্যাঙ্গিক ছিল পাঁচালি। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালির আঙ্গিকে পরিবেশিত। ঐ সময় 'নেটো' নামে জনপ্রিয় নাট্যরীতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিও নাট্যমূলক পরিবেশনা। মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যধারা ছাড়াও প্রণয়মূলক ও পীরমাহাত্ম পাঁচালি নাট্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। যেমন—ইউসুফ জোলেখা, বিদ্যাসুন্দর, লাইলী মজনু, পদ্মাবতী, খোয়াজখিজিরের জারি, মাদারপীরের জারি উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এগুলো ছাড়াও সমস্ত বৃহৎ বঙ্গে নানা ধরনের নাট্য পরিবেশনা আঙ্গিক ও রীতি বিদ্যমান ছিল। যেমন—মহুয়া, মলুয়া, কাঞ্চন কন্যা, দেওয়ানা মদিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দিতে সমস্ত বঙ্গে 'যাত্রা' নাট্যাঙ্গিকের অসম্ভব জনপ্রিয়তা বিদ্যমান ছিল। সেলিম আল দীন বাংলা নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিমূল হিসেবে বৈষ্ণবীয় 'উজ্জ্বলনীলমণি'কে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেন। বাংলা সাহিত্য-শিল্প অদ্বৈতের চেতনায় একাকার বলে উল্লেখ করেন।

বাংলা সংস্কৃতির মধ্যযুগে সাহিত্য-শিল্পের উপস্থাপনের মধ্যে—পাঁচালি, কীর্তন, কথা, কথকতা, লীলা, হাস্তর প্রভৃতি রীতি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। পাঁচজন গায়েন—দোহার মিলে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত কাহিনি বা আখ্যানকেই পাঁচালি হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ পাঁচ ধরনের পরিবেশনের সন্নিবেশিত উপস্থাপন বলে পাঁচালি বলতে অধিকতর যুক্তি দেখান। তাহচ্ছে—পা-চালী, ভাবকালি, নাচাড়ি, বৈঠকী ও দাঁড়া কবি ইত্যাদি। পাঁচালি পরিবেশেনের পাঁচটি পারিভাষিক শব্দও উল্লেখ্য—কথা, বোলাম, দিশা, পদ ও নাচাড়ি। মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য পাঁচালি হচ্ছে—জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' মানিকদত্তের 'চণ্ডীমণ্ডল' প্রভৃতি। পাঁচালি সাধারণত দুধরনের হয়ে থাকে—কৃত্য পাঁচালি ও প্রণয় পাঁচালি। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসমূহ কৃত্য পাঁচালির আঙ্গিকে পরিবেশিত হতো। মানবিক প্রেম আখ্যান বর্ণিত হতো প্রণয় পাঁচালিতে। মধ্যযুগের অন্ত্য পর্যায়ে খণ্ড পালা কাহিনি অবলম্বন করে পাঁচালি গড়ে উঠতো। এ ধরনের পাঁচালিতে ৩টি পরিবেশনামূলক শব্দ পাওয়া যায়। তা হচ্ছে—ধূয়া, পয়ার, ত্রিপদী বা নাচাড়ি কখখনো বা শিকলি। পাঁচালিতে নাট্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান বলে পাঁচালিকে সম্পূর্ণই নাট্য হিসেবে বিবেচিত। এতে নাট্য বৈশিষ্ট্যের

সমস্তটাই দেখা যায়। বর্ণনা, নৃত্য, গীত, অভিনয়ের হাবভাব, কাহিনি, সংলাপ সমস্তটাই ফুটে উঠতো। মধ্যযুগের এ শিল্পকর্মেই যথার্থভাবে দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পগুণ ফুটে উঠতো বলে সেলিম আল দীন অভিমত পোষণ করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা বৈঠকীরীতির নাট্য হিসেবে কথকতারীতি দেখা যায়। অভিব্যক্তি-ভঙ্গিমা, গীত-সুরে আখ্যায়িত হতো এ রীতিটি। অনেকে মনে করেন পাঁচালির পদ ও পয়ারের উপর ভিত্তি করেই উত্তর সময়ে এ কথকতা রীতির সৃষ্টি হয়েছে। সেলিম আল দীন এ কথকতা বা পাঠ অভিনয় ধারায় সমকালীন কথানাট্যের উদ্ভাবন ঘটান।

মধ্যযুগের শিল্প-সাহিত্যের আরেকটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে ছিল কীর্তন ও লীলা। কীর্তন মূলত এক ধরনের বন্দনাগীতি। কীর্তনের সঙ্গে লীলা যুক্ত হয়ে নাট্য বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। এ লীলাকীর্তনে গীত, সংলাপ, বর্ণনা প্রভৃতি নাট্যগুণে উজ্জ্বল। কীর্তন পরিবেশনে পাঁচটি অংশ থাকে—কথা, তুক, ছুট, ঝুমুর ও আখর। এর সাথে মধ্যযুগের পরিবেশনা নাট্যশিল্পে আরেকটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে লীলানাট্য। অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা বা দেবতা-দেবতাকল্প মানুষের কাহিনিভিত্তিক নাট্য। যেমন—কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি। লীলানাট্য এক চরিত্র বিশিষ্ট বা একাধিক চরিত্রবিশিষ্ট হয়ে থাকে। লীলানাট্যের পরিবেশন কখনো মঞ্চকেন্দ্রিক বা কখনো পরিবেশকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। অন্তবিভাজনের নির্ভরতায় নামকরণও হয়। যেমন—ডঙ্ক নাট্য, কালিয়দমন নাট-এগুলো এক চরিত্র বিশিষ্ট। অনুরূপ 'গীতগোবিন্দ'-মঞ্চকেন্দ্রিক লীলানাট্য। এ লীলানাট্যের উদ্ভব বাংলায় এবং মধ্যযুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় পরিবেশনা শিল্প। উত্তরকালে লীলানাট্য শিথিল অর্থে যাত্রা নামেও উপস্থাপিত হয়। যেমন—কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা প্রভৃতি। বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের মধ্যযুগ খ্যাত অধ্যায়ে নানা আঙ্গিক-নানা বৈচিত্র্যের নাট্যক্রিয়াদির পরিচয় বিধৃত হয়।

বাংলা নাট্য একটি আঙ্গিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন রূপ ও আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্য প্রবহমান। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাট্য বলতে কোনো একটি আঙ্গিকেই নির্দিষ্ট করে না। শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে পরিবেশনা শিল্পের অন্যান্য বিষয় থেকে নাট্যকে আলাদা করা হয়ে থাকে। বিশ্বনাট্য ধারায় বাংলা নাট্যশিল্পকে বৈশিষ্ট্যমূলক আলাদা করা যায়। হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের প্রধানতম

বৈশিষ্ট্য বর্ণনানির্ভরতা অর্থাৎ বাংলা নাট্য বর্ণনাত্মক। বাঙালি জাতির উপস্থাপনীয় নাট্য শিল্পস্বরূপ প্রধানত বর্ণনাকেই ভিত্তি করে প্রদর্শনরীতি বাঙালি জীবনের মধ্যযুগ অধ্যায়ে সর্বত্রই দেখা যায়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে মঞ্চ ছিল আসরকেন্দ্রিক। চারদিকে দর্শক বসতো এবং মাঝখানে সংঘটিত হতো নাট্যক্রিয়া। কৃত্যনাট্যে কখনো কখনো মঞ্চ বানিয়ে নাট্য উপস্থাপন করা হতো। সেলিম আল দীন মধ্যযুগের পরিবেশনায় ভূমি সমতল বৃত্তমঞ্চ, চৌকোণ খোলা মঞ্চ বা চৌপথ খোলা মঞ্চ, গৃহাঙ্গন প্রভৃতি স্থায়ী বা অস্থায়ী মঞ্চ ব্যবহৃত হত বলে তুলে ধরেন। উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও বর্ণনাত্মক রীতি শিল্পের সর্বত্রই প্রচলন ছিল। হাজার বছরের বাংলা এ বর্ণনাত্মক নাট্যধারায় গায়েনরীতি, কথানাট্যরীতি ইত্যাদি নানা রীতিতে উপস্থাপিত হতো। অভিনয়রীতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী বাংলা অভিনয়রীতিও ছিল বর্ণনাধর্মী। এটাকে আবার কথকতারীতি হিসেবেও উল্লেখ্য। গায়েন বা কথক ঘটনার বর্ণনা করেন এবং একই সাথে চরিত্ররূপ অভিনয় করতেন। পাশ্চাত্যের চরিত্রাভিনয়ের মতো একই চরিত্রমোহে আবদ্ধ না থেকে আসরে উপস্থিত দর্শকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে বর্ণনার সাথে সাথে অভিনয় করেন। পাশ্চাত্যের অভিনয় থেকে বাংলার ঐতিহ্যের ধারায় অভিনয়রীতি ভিন্ন। ঐতিহ্যবাহী বাংলা অভিনয়রীতিতে জীবনের ব্যাখ্যা করে। সেলিম আল দীন বর্ণনাত্মক অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত তিনটি প্রধান দিক তুলে ধরেন। এক) গায়েন বিশুদ্ধ বর্ণনাত্মক রীতির আশ্রয় নেন। যা জারি, হাস্তর গান প্রভৃতি নাট্যের উপস্থাপনায় দেখা যায়। দুই) কখনো অভিনয়ে গায়েন কাহিনির অন্তর্গত চরিত্রগুলোকে নানাভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেন এবং তিন) চরিত্রাভিনয়ের মতো অভিনয়। লীলাযাত্রায় দোহার সহযোগে চরিত্রাভিনয় সম্পন্ন হয়। বাংলা নাট্যরীতিতে একজন অভিনেতা একই সময়ে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। পাশ্চাত্যের সংলাপের মতো ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যে সংলাপনির্ভরতা নেই। এখানে কাহিনি বা ঘটনা বর্ণনার উক্তি-প্রত্যুক্তিই প্রধান। গায়েন বা বর্ণনাকারী কখনো সরাসরি চরিত্রের সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তি করেন, আবার কখনো দোহার বা সহযোগীর সঙ্গেও উক্তি-প্রত্যুক্তি করেন। কাহিনিবিন্যাস বা বৃত্তরীতিতে নানা রকমের বৃত্ত ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যে দেখা যায়। যেমন—আখ্যানরীতি, পাঁচালী রীতি ইত্যাদি। এতে প্রথমে বন্দনা থাকে, পরে নৃত্য-গীত সহযোগে কাহিনি উপস্থাপিত হয়। ঐতিহ্যবাহী

বাংলা নাট্যের শিল্প-নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে সেলিম আল দীন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প বৈশিষ্ট্যের বলে তুলে ধরেছেন। একই সাথে বর্ণনা, গান, নৃত্য, অভিনয়, কথা সবকিছুই এ নাট্যে একীভূত বা অদ্বৈত। সে প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যকে সেলিম আল দীন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প বলে উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত বাংলা নাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিক ও বিষয় বৈচিত্র্যের যেমন সন্ধান পাওয়া যায়। তেমনি বৈচিত্র্য রয়েছে নাট্য উপস্থাপনার সহযোগ বিধানমূলক কর্ম তৎপরতায়।

উপনিবেশিত বাংলার নাট্যাতিহাসে বলা হয়ে থাকে—"১৭৫৩ সালে কলকাতায় প্রসেনিয়াম মঞ্চস্থাপন এবং ১৭৯৫ সালে লেবেদেফের 'ডিসগাইজ' বা কাল্পনিক সংবদল ও 'লাভ ইস দ্যা বেস্ট ডক্টর' নাটক অনুবাদ ও মঞ্চায়নের মধ্য দিয়েই বাংলা নাটকের শুরু।" সেলিম আল দীন গবেষণায় তুলে ধরেন—এ ধারণাটি ভুল। 'ডিসগাইস' দিয়ে বাঙলা নাটকের শুরু নয়; বরং পাশ্চাত্য প্রভাবিত 'থিয়েটার' নামক ধারণার শিল্পাঙ্গিকের শুরু হয়। যার সূচনায় প্রেষণা ছিল ভাষা শিখন এবং প্রসেনিয়াম ধারা। আমাদের ভাষায় 'থিয়েটার' শব্দটি ইতোপূর্বে ছিল না। 'থিয়েটার' শব্দটি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে আমাদের শব্দভাণ্ডারে যোগ হয়েছে। পারিভাষিক অর্থে থিয়েটার বলতে যা বুঝায় তা আমাদের বাঙালি জীবনে দীর্ঘদিন ধরেই বহমান ছিল। সেলিম আল দীন 'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য' গ্রন্থে বলেন—'নাটকের মতো একটি জননন্দিত শিল্পমাধ্যম শুদ্ধ উনিশ শতকের আকস্মিক উদ্ভাবনা নয়। নানা রূপে ও রীতিতে, আমাদের এই জনপদে সহস্র বছর ধরে এর ধারা বহমান ছিল।' তিনি আরও বলেন, 'বাঙলা নাটকের প্রাচীন ও মধ্যযুগে 'নাটক' কথাটি প্রায় দুর্লভ। ...আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো 'ন্যারেটিভ' ও 'রিচুয়্যাল থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান, পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।'

সেলিম আল দীনের ইতিহাস চেতনা ও নাট্যরচনা; নাসির উদ্দীন ইউসুফের নির্দেশনা—নাট্য নেতৃত্ব; সৈয়দ জামিল আহমেদের নির্দেশনা সমকালীন ও ঐতিহ্যবাহী আধুনিক বাংলা নাট্যচর্চার ভিত্তিমূল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত, ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যকে দুটি বিভাজনে দেখা

যেতে পারে। একটি শহরে বা কেন্দ্রিক পর্যায়ে, অন্যটি গ্রামীণ বা প্রান্ত পর্যায়ে। যদিও এ কেন্দ্র ও প্রান্ত সৃষ্টিও উপনিবেশ। উপনিবেশদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ সুবিধার্থেই এই কেন্দ্র ও প্রান্ত তত্ত্বের সৃষ্টি। আবার উপনিবেশের 'ফোক' পরিভাষাটি ব্যবহারের মধ্য দিয়েও দেশীয় শিল্পের বিকাশকে অবদমিত রাখার একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৌশল লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা আঙ্গিকের ঐতিহ্যবাহী নাট্য। সেলিম আল দীন 'বাঙলা নাট্যকোষ' গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী নাট্য আঙ্গিকের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য—পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের পরিবেশনা শিল্পকে 'ফোকস্টাডিজ' এ লোকনাট্য ঐতিহ্য হিসেবে জরিপমূলক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে। বর্তমান বাংলাদেশের লোকায়ত পর্যায়ে নানা আঙ্গিক বৈচিত্র্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নাট্যপালা। বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে বহুল উপস্থাপিত নাট্য 'পালা'। সাধারণত পরিবেশনযোগ্য কাহিনিকেই পালা হিসেবে আখ্যায়িত। কাহিনির প্রাধান্য বা নির্ভরতা বিদ্যমান থাকে বলে এ শ্রেণির নাট্যকে পালা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। 'পালা' নাট্য আঙ্গিকটি বাঙালি জীবনের মধ্যযুগে অন্তিমপর্যায়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মঙ্গলকাব্য ধারার উপস্থাপন রীতিই ছিল প্রধানত পাঁচালি-পালাকেন্দ্রিক। তাছাড়াও বাঙালি জীবনে নানা বিষয়-বিন্যাসে পালা উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্য ও বিষয় অনুসারে পালা ভিন্ন ভিন্ন নামেও পরিচিত। যেমন—মহুয়া পালা, দস্যু কেনারামের পালা ইত্যাদি। বর্তমান বাংলাদেশে মানবীয় প্রেম-আখ্যান নিয়ে নানা নামকরণে পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ নাট্যাঙ্গিকটি চারপাশের খোলা মঞ্চে অভিনীত হয়ে থাকে। কখনো কখনো কৃত্রিম মঞ্চও স্থাপিত হয়। এতে সাধারণত লোকায়ত হিন্দু, মুসলমানদের ধর্মীয় বা বিশ্বাসগত বিষয়বস্তু এবং বাঙালি জীবনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নির্ভর নানা বিষয় ও চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন—মহিষাসুরবধ পালা ইত্যাদি। পালাগানে একজন মূল গায়েন বা বয়াতি থাকেন। পালার সংগীত, কাহিনি ও নাট্যিক উপস্থাপনে দোহারগণ সাহায্য করে থাকেন। পালাগানের কবিকে সাধারণত পদকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। উপনিবেশিক টার্ম পালাকে

গীতিকা বা ব্যালেড হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। পালার বৈশিষ্ট্যসমূহে বর্ণনা, ঘটনা, অভিনয়, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। সংগীত নির্ভর আরেকটি প্রধান নাট্য আঙ্গিক গান। আপাতভাবে 'গান'কে শুধুই সংগীত মনে করা হলেও নৃত্য-সংগীত-কাহিনি নির্ভর নাট্যপরিবেশনা। এতে সংগীতকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে বলে এ শ্রেণির নাট্যের নামকরণ করা হয় গান। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন লীলা, যাত্রা, হাস্তর, পাঁচালি প্রভৃতি নাট্য আঙ্গিকের সঙ্গে সুর ও ছন্দের প্রাধান্য থাকলে আঙ্গিকগুলোর সাথে 'গান' যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন—পালাগান, যাত্রাগান, হাস্তরগান, পাঁচালি গান ইত্যাদি। বিষয়ানুসারে বর্তমানে গানের নামকরণও হয়ে থাকে। যেমন—রামায়ণ বিষয়ক বা চরিত্রনির্ভর এ আঙ্গিকের নাম হয় 'কুশানগান'। পীর মাহাত্মমূলক গানও পরিবেশিত হয়। যেমন—গাজীরগান ইত্যাদি। এ গান নাট্যক্রিয়ায়—বর্ণনা, কাহিনি, অভিনয়, নৃত্য ও সংগীতের বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। এগুলো ছাড়াও সংগীত নির্ভর তুলনামূলক তত্ত্ব পরিবেশন কেন্দ্রিক নাট্য 'কবিগান' পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এতে কাব্যিক চেতনা প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। এ শ্রেণির নাট্যে সাধারণত দুটি দল থাকে। কবিয়ালকে প্রধানত তর্কযুদ্ধে সহযোগিতা করেন তার দলের প্রধান ঢুলবাদক ও দোহারগণ। এছাড়াও বিচারগান নামে বাঙালি সমাজে নাট্যাঙ্গিক লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে 'জারি'। জারি আখ্যানমূলক গাথা বা পাঁচালি, শোকগাথা। জারিগান ইসলাম ধর্মীয় বিয়োগান্তক ঘটনা ভিত্তি করে উদ্ভব ও বিকাশ হলেও বর্তমানে তা বিষয়বিন্যাস, অঙ্গবিন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ছোট আকারে বিশেষ সুরে গাওয়া হলে তাকে মর্সিয়া এবং বয়াতি বা গায়ক আলাদা সুরে কাহিনিবিন্যস্ত-বিস্তৃতভাবে পরিবেশিত হলে তাকে জারিগান হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। জারিগান আবার ধূয়া গান হিসেবেও পরিচিত। পরিবেশনের সময় বয়াতি বেহালা, সারিন্দা, দোতারা বা ডুগডুগি বাজায় এবং যন্ত্রীরা ঢোলক, একতারা, দোতারা, সারিন্দা, বেহালা, বাঁশি, জুড়ি বা ঘুঙুর, খঞ্জনি, হারমোনিয়াম, কাঁসা ইত্যাদি বাজায়। বাঙালি জীবনে লোকায়ত জীবন—পীরমাহাত্মসহ নানামুখী বিষয় নিয়ে বর্তমান জারি নাট্য প্রদর্শিত হয়। এ জারি নাট্যের সঙ্গে গান শব্দটিও যুক্ত থাকে। যেমন—জারিগান ইত্যাদি। অতি পরিচিত নাট্য যাত্রা। ধর্মীয় চেতনা থেকে এ

আঙ্গিকের সৃষ্টি হলেও বর্তমানে নানাবিষয়ের যাত্রাপালা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এ আঙ্গিকটির সঙ্গে পাশ্চাত্যের থিয়েটার আঙ্গিকের অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। যাত্রা ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সমকালীন ও সাহিত্যনির্ভর নানা বিষয় আশ্রিত। নৃত্য-গীত তারপরে যাত্রাপালা আরম্ভ হয়। যাত্রায় হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোলক, ড্রাম, কঙ্গো, বেহালা, কার্নেট, ওর্গান, বাঁশি, ক্লারিওনেট ব্যবহৃত হয়। সেপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণযাত্রা, নিমাই সন্ন্যাস যাত্রা ইত্যাদি সনাতন ধর্মীয় কৃত্যমূলক যাত্রা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ইসলাম ধর্মের কারবালার বিয়োগান্ত কাহিনি নিয়ে পরিবেশনার নাম 'ইমামযাত্রা'। মহাভারতের ধ্রুপদী আখ্যান ও জীবনমাহাত্ম বিশিষ্টতা নিয়ে একটু আঙ্গিকের সংযোজন-বিয়োজনে ধর্মভিত্তিক পরিবেশনা 'ঢপযাত্রা' ইত্যাদি। এ শ্রেণির নাট্য পরিবেশন বৈশিষ্ট্যে সাধারণত বর্ণনামূলক হয় না। পাশ্চাত্যের চরিত্রাভিনয়ের মতো উপস্থাপিত হয়। অনেকে মনে করে থাকেন—জনপ্রিয়তার কারণে বৃটিশ সংস্কৃতির নানা স্পর্শ লেগেছে এ শিল্প আঙ্গিকটিতে ফলে এর স্বরূপ অনেকটা ইউরোপীয়দের মতো হয়েছে। হয়ত সেপ্রেক্ষিতেই এ নাট্য আঙ্গিকে বিদেশি নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এবং বিদেশী কিছু টার্মও ব্যবহার হতে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গে নৃত্য, গীত, কথা, ছড়া ইত্যাদির সংমিশ্রণে আলকাপ উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এ আঙ্গিকটি বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে দেখা যায়। এতে দশ বার জন শিল্পী নাচ-গানের মাধ্যমে সমাজ বাস্তবতার নানা হাস্য-কৌতুক উপস্থাপন করেন। আলকাপে ছেলেরা মেয়ে সেজে নৃত্য-গীত ও অভিনয় করে থাকে। আলকাপ অনেকটা ভাঁড়ামীর মাধ্যমে দর্শকদের হালকা আনন্দ দান করে থাকে। উত্তরবঙ্গের আরেকটি নাট্য আঙ্গিক গম্ভীরা। সনাতন ধর্মীয় শিবকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির নাট্যমূলক পরিবেশনাই গম্ভীরা নামে পরিচিত। এতে ৩টি পর্ব থাকে—শিবের জাগরণ, নানারূপ কৃত্য ও মুখোশ নৃত্য বা নাট্য। সাধারণত চৈত্রসংক্রান্তির দিন পরিবেশিত হতো। বর্তমান কৃষক সমাজ জীবনের হালকা হাস্যাত্মক বিনোদনমূলক পরিবেশন নাট্য হিসেবে বিবেচিত। ধর্মীয় আখ্যানে নির্মিত হলেও পারিবারিক ও সামাজিক জীবন আশ্রিত নাট্য উপাখ্যান। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে জনপ্রিয় একটি নাট্য আঙ্গিক। এতেও বর্ণনা, সংগীত ও উক্তি-প্রত্যুক্তি দেখা যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনপ্রিয় পরিবেশনা 'সঙযাত্রা।' সঙযাত্রা সামাজিক,

পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা অসংগতি নিয়ে পরিবেশিত নাট্য আঙ্গিক। বর্তমান বাংলাদেশের টাঙ্গাইল অঞ্চলে এ সঙযাত্রা পরিবেশন দেখা যায়। 'সং' নাট্যরীতিটি মূলত কৌতুক, গান, নাচ ও অভিনয়ের একটি বিশিষ্ট রঙ্গব্যঙ্গাত্মক চিত্র। 'সং' অত্যন্ত সমসাময়িক বিষয়বস্তু আশ্রিত। এ পরিবেশনা শিল্পীরা পারিবারিক, সামাজিক জীবন-বাস্তবতার নানা অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনা বা চরিত্র সর্বোপরি পারিপার্শ্বিক ক্ষমতা-কাঠামোকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও হাস্য কৌতুকের ছলে সেসব সাধারণ মানুষদের সামনে তুলে ধরে। বিলুপ্তপ্রায় নাট্য ঘাটু। নৃত্য-গীত নির্ভর এক শ্রেণির নাট্য। হালকা বিনোদন প্রদানের লক্ষ্যে এর কাহিনি সহজ-সরল হয়ে থাকে। ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে উপস্থাপিত হতো বলে এ নাট্য আঙ্গিকের নাম ঘাটু, ঘাটু গান, ঘেটু গান, ঘাটুর গান ইত্যাদি। এতে কিশোর বালক বালিকা সেজে নৃত্য-গীত ও অভিনয় করে থাকে। এই ঘাটুর গানে স্থূল ইন্দ্রিয় প্রেম উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের নদী কেন্দ্রিক জীবন নির্ভরতা অনেকাংশে কমে যাওয়ায় এ ঘাটুর গানের প্রচলনও অনেক কমে গেছে। এ ছাড়াও পুতুল নাট্য একটি জনপ্রিয় নাট্য আঙ্গিক। পুতুলকে কেন্দ্র করে সূত্রধার কাহিনি উপস্থাপন করেন এ শ্রেণির নাট্যে। বিভিন্ন মাধ্যমে নির্মিত পুতুল বা পশু-পাখি-মানব মূর্তি দ্বারা সঞ্চালিত নাট্য ক্রিয়াই পুতুল নাট্য হিসেবে পরিচিত। পুতুল নাট্যে জীবন্ত নাট্যশিল্পের মতোই বর্ণনা, কাহিনি, সংলাপ, গীত-নৃত্য থাকে। শুরু নৃত্যমূলক পরিবেশনা হলে পুতুল নাচ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাংলা নাট্যে পুতুল নাট্যও একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ঐতিহ্যবাহী নাট্যে নানা আঙ্গিকগুলোর মধ্যে বৈশিষ্ট্যানুসারের নামকরণ করা হয়ে থাকে। কখনো একটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্য বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েও সংযোজিত নাম ব্যবহৃত হয়। উনবিংশ শতকে এতে ইউরোপীয়রা তাদের নির্ধারিত পণ্ডিতবর্গদের দ্বারা ঐতিহ্যবাহী ধারাকে ফোকলোর তত্ত্বের মধ্যে ফেলে এ জীবন্ত শিল্পের প্রাণভোমরাকে মেরে ফেলতে চান।

ঐতিহ্যবাহী নাট্য বৈশিষ্ট্যে সমকালীন নাট্য প্রযোজনার আদর্শ বা প্রভাব বাংলাদেশের অধিকাংশ নাট্যদলগুলোর নাট্য প্রযোজনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রাম থিয়েটার আন্দোলন বাংলাদেশের জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণে জোরালো ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান নাট্যচর্চায় আবহমান বাংলার ঐতিহ্য-বিকাশী নাট্যচর্চাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।

ঐতিহ্যের ধারায় প্রায় শতাধিক নাট্য প্রযোজনা গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে মঞ্চে সবচেয়ে আলোচিত ও দর্শকপ্রিয়। সেলিম আল দীনের উপনিবেশ বিযুক্তিকরণ কৌশলী তৎপরতা, ইতিহাসের বিভ্রান্তির বিপরীতে হাজার বছরের বাংলা নাট্যের ইতিহাস, সৈয়দ জামিল আহম্মেদের বিষাদসিন্ধু, বেহুলার ভাসান প্রভৃতি পরিবেশনা নিরীক্ষা এবং নাসির উদ্দীন ইউসুফের বাংলার নিজস্ব নাট্য পরিবেশনা আন্দোলন বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে বেনিয়া তত্ত্বের বিপরীতের ঐতিহ্য-বিকাশী আদর্শে পরিণত করেছে।

ঐতিহ্যের ধারায় শহর পর্যায়ে সমকালীন বাংলা নাট্যগুলোর মধ্যে ঢাকা থিয়েটারের বনপাংশুল, ধাবমান; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলারানীর সাগরদিঘি, বেহুলার ভাসান, শাজাহান; সং ভং চং নাট্যকেন্দ্রের আরজচরিতামৃত; দেশ নাটকের নিত্যপুরাণ, পদাতিকের বিষাদসিন্ধু, মহাকাল নাট্যসম্প্রদায়ের নীলাখ্যান, শিবানী সুন্দরী, পালাকারের নারীগণ, বটতলার খনা, স্বপ্নদলের চিত্রাঙ্গদা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি, বিষাদসিন্ধু; জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের কীর্ত্তনখোলা, প্রাচ্যনাটের কইন্যা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মাবতী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর খনা, লোকনাট্যদলের লীলাবতী আখ্যান, সোনাই মাধব, সুবচন নাট্য সংসদের মহাজনের নাও, আরণ্যকের রাঢাঙ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখরা রমণী বশীকরণ, সাধনার চম্পাবতী, সিএটির ভেলুয়া, থিয়েটার আর্ট ইউনিটের আমেনা সুন্দরী, আরশীনগরের সেই রাতে পূর্ণিমা ছিল, নাগরিক নাট্যাঙ্গনের গহর বাদশা ও বানেছা পরী, অন্বেষা থিয়েটারের ভানু সুন্দরীর পালা, বুনন থিয়েটারের নকসী কাঁথার মাঠ, বঙ্গলোকের রূপচান সুন্দরীর পালা, যশোরের বিবর্তনের মাতব্রিং, বোধন থিয়েটারের চন্দ্রাবতী কথা, ভোলা থিয়েটারের গ্রন্থিকগণ কহে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সমকালে ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রযোজনা ধাবমান নাট্য। সেলিম আল দীন ঐতিহ্যবাহী মধ্যযুগের বাংলার পাঁচালি ও কথকতার ধারায় সমকালীন প্রয়াস হিসেবেই রচনা করেছেন তাঁর অনেকগুলো নাটক। ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনা বনপাংশুল মধ্যযুগের পাঁচালি ধারায় সমকালীন বৈশিষ্ট্যে রচিত। এ নাটককে বলা হয় নব্যপাঁচালি। নাট্য উপস্থাপনে বাংলার ঐতিহ্য-উৎসারী ধারায় চারদিকের দর্শক পরিবেষ্টিত মধ্যমঞ্চে উপস্থাপন হয়েছে। বন্দনা, বর্ণনা, উক্তি-প্রত্যুক্তি, নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক

মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ সমকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে অত্যন্ত শিল্পকুশলতায় ফুটে উঠেছে। ধাবমান নাট্যটি উপস্থাপনেও মঞ্চবিন্যাস ছাড়া ঐতিহ্যের ধারায় বহমান বাংলা নাট্য অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্যণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহুলার ভাসান সমকালীন বাংলা নাট্যের মাইলফলক। একদিকে স্বতঃসিদ্ধ পৌরাণিক বেহুলাকে সাধারণ পারিপার্শ্বিকতার 'বেহুলা' নিরীক্ষা এবং অন্যদিকে নৃত্য-গীত-বর্ণনা-উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে চারদিকের দর্শক পরিবেষ্টিত মঞ্চে উপস্থাপন বাংলাদেশের নাট্যাতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। নবদর্শনজাত এ নাট্যটির নির্দেশনায় ছিলেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। বটতলা নাট্যদলের প্রযোজনা খনা। বাঙালি গার্হস্থ্য সমাজের দার্শনিক, সত্যের ভাষ্যকার 'খনা'র জ্ঞান ও সত্যদর্শনীয় প্রতিহিংসার শিকারে নির্মম পরিণতির কিংবদন্তি নিয়ে নাট্যটি। নাট্যটির রচনা সামিনা লুৎফা নিত্রা, নির্দেশনা—মোহাম্মদ আলী হায়দার। খনা নাট্যটি উপস্থাপনে বন্দনা, বর্ণনা, নৃত্য-গীত-উক্তি-প্রত্যুক্তিসহ চারদিকের দর্শক পরিবেষ্টিত মধ্যমঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে। সুবচন নাট্য সংসদ সংগীত সাধক শাহ আব্দুল করিমের জীবন ও দর্শন নিয়ে মহাজনের নাও শিরোনামে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী রীতিতে নাট্য প্রযোজনা করেছে। নাট্যটি রচনা করেছেন শাকুর মজিদ এবং নির্দেশনায় সুদীপ চক্রবর্তী। উপস্থাপনায় আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী এরিনা বা চারদিকের খোলা মঞ্চ ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙালি জীবন সংস্কৃতির বহমান 'পালা' রীতিকে অবলম্বনে নাট্যটি প্রদর্শিত। স্বপ্নদলের প্রযোজনা চিত্রাঙ্গদা নাট্যটি। রচিয়তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মঞ্চের চারপাশে দর্শক; মাঝখানে উপস্থাপিত হচ্ছে নাট্যটি। বন্দনা, বর্ণনা, সংলাপ, অভিনয়-নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে নাটকটি উপস্থাপিত। নির্দেশনায় ছিলেন জাহিদ রিপন। পালাকারের প্রযোজনা নারীগণ নাট্যটি। আবহমান বাংলার নিজস্ব পরিবেশনা রীতিতে উপস্থাপিত। রচনা সৈয়দ শামসুল হক, নির্দেশনা আতাউর রহমান। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত দর্শকনন্দিত প্রযোজনা মুখরা রমণী বশীকরণ শেক্সপিয়রের কাহিনি হলেও বাংলার ঐতিহ্যবাহী 'সং' আঙ্গিকে উপস্থাপিত নাটকটি। নাট্যটির নির্দেশনা আল জাবির। নাগরিক নাট্যাঙ্গনের গহর বাদশা ও বানেছা পরী এ সময়ের অত্যন্ত আলোচিত নাটক। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি প্রচলিত গাথাকে সমকালীন বৈশ্বিক প্রযুক্তি সহযোগে

অনন্যসাধারণ এক উপস্থাপন তৈরি করেছেন। বোধন থিয়েটারের চন্দ্রাবতী পালা, ভোলা থিয়েটারের গ্রন্থিকগণ কহে, অন্বেষা থিয়েটারের ভানু সুন্দরীর পালা, বঙ্গলোকের রূপচান সুন্দরীর পালা এক নতুন মাত্রা তৈরি করেছে। কিছু প্রযোজনায় নির্দেশকের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার বিকাশমূলক সচেতন প্রচেষ্টা না থাকলেও অবচেতনভাবেই ঐতিহ্যের ধারার বাংলা নাট্যের বৈশিষ্ট্যে প্রত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নাট্য।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, হাজার বছরের গৌরবান্বিত নাট্য-ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙালি হলেও বাংলাদেশে এখনো ঐতিহ্যের ধারায় চারদিকে দর্শকবেষ্টিত মধ্যমঞ্চ স্থাপিত হয়নি। 'জাতীয় নাট্যশালা' শিরোনামে ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতাই বিদ্যমান। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ হয়ে সমকালীন পর্যায়ে বহমান বাঙালির পরিবেশনা ঐতিহ্যে নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের অদ্বৈত রূপই প্রধানরূপে লক্ষ্যণীয়। বন্দনা, বর্ণনা ও কথন, উক্তি-প্রত্যুক্তিসহ নানা শিল্পসম্মিলনে সৌন্দর্যবোধের অনন্যতায় জীবন জগতের ব্যাখ্যাই প্রতীয়মান। যা দর্শকবেষ্টিত স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী মঞ্চে পরিবেশিত হতো। এগুলো বিষয় বৈচিত্র্যে যেমন অনন্য, তেমনি পরিবেশনা রীতিতেও বহুমাত্রিক। হাজার বছরের বাংলা নাট্য সংস্কৃতি পাশ্চাত্য কিংবা সংস্কৃত থেকেও পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। স্বাধীন বাংলাদেশে নিজস্ব ঐতিহ্যের বিকাশে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে ঐতিহ্যের ধারার 'বাংলা নাট্যমঞ্চ' স্থাপিত হওয়া উচিত। হাজার বছরের বাংলাদেশের পরিবেশনা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে এবং প্রযুক্তির প্রয়োগে আসর বা চারদিকের দর্শকবেষ্টিত বিশ্বমানোপযোগী মঞ্চ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ঐতিহ্যের বিকাশী অনুপ্রেষণ সৃষ্টি হলে বিজাতীয় দাসত্বের অনুশৃঙ্খলের বিপরীতে বাংলার নিজস্ব শিল্পের বিকাশ ঘটবে বলে সহজেই অনুমেয়।

[প্রবন্ধটি চিত্রকলা-সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক 'শিল্প ও শিল্পী'-তে প্রকাশিত। ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ ১৪২৪, মে ২০১৭]

নাট্য সমালোচনার কথকতা

সমালোচনা ছাড়া শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্ভব নয়। শিল্পের জন্য সমালোচনা খুব জরুরি, তা বিশ্বের শিল্পতাত্ত্বিকরা সবাই একমত। অথচ বাংলাদেশে সমালোচনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। এমনকি একজন নাট্য সমালোচককে অসৃজনশীল মানুষ হিসেবেও আখ্যা পেতে হয়। সাম্প্রতিক বিশ্বে অনেকেই সমালোচনা বিদ্যাকে বিজ্ঞান হিসেবেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ডের মতো সমালোচনাও একটি জ্ঞানকাণ্ড। সমালোচনা কোনো জাতির শিল্প-সাহিত্যের ধারাকে প্রভাবিত করে। এমনকি ইউরোপীয় আধুনিকতার মূলেও ছিল যুক্তির বিকাশ, সমালোচনার বিকাশ। কিন্তু বাংলাদেশে নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রটি একটু অমসৃণ। বাংলাদেশের সমালোচনা চর্চা এখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই সংলাপটির মর্মার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—'ভালো হতো আরো একটু ভালো হলে।' শিল্পের কি কোনো ভালো-মন্দ মানদণ্ড হতে পারে? শিল্প নিজেই একেশ্বরী, নিজের মতো সুন্দর। শিল্পীর সঙ্গে সমঝদার বা ভোক্তার সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে তার মূল্যায়ন। তবে শিল্পনির্মাণ প্রচেষ্টাটি যদি শিল্পমূল্যের ন্যূনতম অভিধেয় না হয় তবে তার আলোচনা নিরর্থক। অতএব সমালোচনা কী? তার রূপরেখা কেমন হতে পারে? একজন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে? সমালোচনামূলক লেখার ধরন কেমন হবে—এসব প্রশ্নই চালিত করেছে এ লেখাকে। এ প্রবন্ধে আমরা খোঁজবো বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় বিদ্যমান সমস্যার প্রেক্ষিতে সমালোচনার

রূপ-রীতি, তার বিবর্তন, পদ্ধতি বা তার টুলসগুলো? সমালোচনার ভাষা কেমন হওয়া উচিত—এসব নানা কিছু।

সৃষ্টিশীল মানুষ মানেই একজন বড় সমালোচক। নিজের ভালো লাগাই সৃষ্টি করেন। তবে যখন নিজে শিল্পসৃষ্টি না করে অন্যের শিল্পকর্মের ওপর আলোচনা করেন তখনই গোলমালটা বাঁধে। ভালো বললে খুশি হই; আর মন্দ বললে কষ্ট পাই। আর যিনি বলেন তার শিল্প-ভাবনা কী তাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এসব কারণে সমালোচনা চর্চার ক্ষেত্রটা একটু গোলমেলে। এখনো বাংলাদেশে সমালোচনা শব্দটি খুব নেতিবাচক অর্থে প্রচলিত। নাটক নিয়ে সমালোচনা করছে শুনলেই লোকজন আঁতকে ওঠে। এই বুঝি আমার ইমেজ নষ্ট হয়ে গেল এমন এক আতঙ্কে থাকেন সবাই। এ জন্য একজন সমালোচককে তাচ্ছিল্যের শিকারও হতে দেখা যায়। অথচ অনেকে বলেন সমালোচক হচ্ছে শিল্পীর শিল্পী।

আমাদের দেশে নাটক নিয়ে পত্রপত্রিকায় 'নিউজ', 'নিবন্ধ', 'কলাম', 'প্রবন্ধ', 'রিভিউ', 'সমালোচনা' প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে নানা লেখার মধ্যে মূল্যায়ন বা বিচারধর্মী আলোচনাকে অনেকেই সহজে মেনে নিতে পারেন না। তার নানা কারণ আছে। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন উপনিবেশের মনস্তাত্ত্বিক নিগড়ে বন্দি ছিল। ফলে আমরা উপনিবেশ কিংবা বুর্জোয়া গ্যাঁড়াকল থেকে এখনো বের হতে পারিনি। নিজেকে যেমন নিজে দেখতে চাই না, তেমনি নিজের শিল্পকর্মটির ওপর আলো ফেলে দেখতে বা বিশ্লেষণ করতে দিতে নারাজ। আমরা সৃষ্টশিল্পকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে দিতে চাই না। অথচ এই প্রশ্ন; এই যুক্তির ফলেই পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতার বিকাশ। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজ-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল বুদ্ধিভিত্তিক পরীক্ষণের ফলে। যা বাংলাদেশে এখনো হয়নি। বাংলাদেশে এখনো শুধু নেতিবাচক পয়েন্টে কথা বলাকেই অনেকে সমালোচনা মনে করে থাকেন। সম্ভবত এ কারণেই অনেক সমালোচক অন্যের কাজের ওপর খোঁচাখুচি করেই জীবন কাটিয়ে দেন। অনেকে আবার ভুলত্রুটি বা পরামর্শ দেওয়াতেই ব্যস্ত থাকেন। বাংলাদেশের নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রটা এখনো বুদ্ধিভিত্তিক জায়গায় দাঁড়ায়নি। আমাদের দেশে নাট্যচর্চায় সমালোচনার চেয়ে পত্রিকায় নিউজ হওয়া অর্থাৎ নাট্য সংবাদ পরিবেশনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এর কারণ ওই একই—নির্মাতা বা শিল্পী নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে দিতে নারাজ। এতে ব্যক্তিগত লাভ হলেও জাতীয়গত

শিল্পচর্চায় গুণগত দৈন্য সৃষ্টি হয় । কখনো দেখা যায়, নাট্যদলগুলো পত্রিকায় কী লেখা হলো তার চেয়ে পত্রিকায় নিজেদের নাম-ছবি দেখেই নিজেরা আপ্লুত হয়ে থাকেন। একজন শিল্পী অগোচরে অন্যের কাছে বাহবা অর্থাৎ মূল্যায়নই প্রত্যাশা করেন। সে প্রেক্ষিতে সমালোচনাচর্চা খুব জরুরি। সমালোচনা বিদ্যা একটি বৌদ্ধিক চর্চা। যা অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ডের মতোই। অনেকে জানেই না কীভাবে প্রকাশ করতে হয় সমালোচনা অভিসন্দর্ভ।

'সমালোচনা' শব্দের 'সম' উপসর্গটি নানা অর্থ প্রকাশ করে। সম্যক, সমান বা সমর্থক, সমঝোতামূলক আলোচনাকেই বোঝায়। শিল্পের অর্থ স্পষ্ট করতে সম্যক বা সম্পূর্ণ বা পরিপূরকমূলক বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করাকেই সমালোচনা বলা যেতে পারে। এই অর্থে সমালোচনা সৃষ্টির সমগামী। শিল্পের বিশ্লেষক বা বিচারক বা মূল্যায়ন বা আবিষ্কারক অর্থেই সমালোচনা শব্দটিকে গ্রহণ করতে পারি। প্রাচীন ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সমালোচককে অভিহিত করা হয়েছে প্রাশ্নিক নামে। যা শিল্পসৃজন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন চিন্তায় অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি Critic, Critical, Criticism শব্দটি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পর বিশেষ করে সতেরো শতক থেকে পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ শব্দগুলোর মূলে গ্রিক শব্দ Krites-কে ধরা হয়ে থাকে। আর Krites বলতে গ্রিসে বিচারককে বুঝানো হতো। সতেরো শতকে ইউরোপে Critic বলতে শিল্পকর্মের ব্যাখ্যামূলক মূল্যায়ন বা বিচারমূলক আলোচনাকে ধরা হতো। তাদের প্রধান টুলস ছিল যুক্তিনির্ভরতা। রিচার্ডসের সংজ্ঞায় পাওয়া যায়—A Critic is to set up as a judge of values. তিনি যোগাযোগ মনোবিজ্ঞানকে বড় করে দেখেছেন। আর ম্যাথু আর্নল্ড সমালোচককে মনে করেন Intellectual Middleman. যিনি শিল্প এবং দর্শকের মধ্যে ভাববিনিময়ে সহায়তা করে থাকেন। এবারক্রম্বিক শিল্পের উদ্দেশ্য আবিষ্কারের পথে হেঁটেছেন, শিল্পগুণ নির্ণয় এবং করণকৌশলের রূপকে বড় করে দেখেছেন। এসব কথায় স্পষ্ট যে, সমালোচনা হচ্ছে শিল্পের অভ্যন্তরীণ সত্যকে আবিষ্কার করে তা বিশ্লেষণ করা, বিচার করা ও উপলব্ধিতে সাহায্য করা। ম্যাথু আর্নল্ডের কথা ধরে আরো বলা যায় ভালোকে জানার এবং জানানোর নিরপেক্ষ উদ্যোগকেই সমালোচনা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

নাট্য বলতে দর্শকের সামনে ত্রিমাত্রিক অবস্থানে উপস্থাপিত শিল্পমাধ্যমকে বোঝায় বলে নাট্য সমালোচনায় নাট্য পরিবেশনার অন্তর্গত

সত্য আবিষ্কার, প্রতীক বা উপকরণ-বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও রসোপভোগ অধিক গুরুত্ব পায়। এতে পরিবেশনা টেক্সট থেকে উপস্থাপনের রীতিসহ নানা বিষয়ই জড়িত থাকে। শিল্প নিজেই একেশ্বরী। নিজের মতো সুন্দর। তার অনুভূতি জনে জনে ভিন্ন হতে বাধ্য। নাট্য সমালোচনার টুলস বা পদ্ধতি এখন পর্যন্ত অনেকাংশে সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। নাট্য সমালোচনা কোন নিয়মকে অনুসরণ করবে, কিংবা নতুন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করবে তা নির্ভর করে স্থান, কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর। সমালোচনা নির্মাতাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েন বটে, তবে সমালোচনা মানে কোনো শিল্পকে নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে নম্বর প্রদান বা ওই রকম মূল্যায়ন করা নয়। বিখ্যাত নাট্যশিক্ষক Edward A. Wright বলেন, 'In a very real sense dramatic criticism can be said to exist on at least three levels, Which we shall define as the literary, the theatrical and the practical.' একইভাবে Jhon Gassner নাটকের অন্তঃসূত্র আবিষ্কারকেই বড় করে দেখেছেন। আধুনিক নাট্যে অভিনয়-মঞ্চ-আলো-সংগীত ইত্যাদি প্রতিটি উপকরণই নৈর্ব্যক্তিক বা সাংকেতিক ভাষা-ব্যঞ্জনা তুলে ধরে ধরে। এসব বৈশিষ্ট্যকে ধরে নাট্য সমালোচনা বলতে নাটকের রূপরীতি-প্লট-চরিত্র-ভাষা-উপস্থাপনের প্রয়োগিক উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যৌক্তিকতা-মূল্যায়ন, রসোপভোগ বা দর্শকের উপযোগিতার রূপরেখাকে বোঝায়।

সমালোচনার ইতিহাস শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। ভরত মুনির প্রাশ্নিক যে নাট্যপ্রশ্নের যাত্রা শুরু করেছিল নাট্যবিচার ধারায় তা এগিয়ে চলে। নাট্যশাস্ত্র অনুসারে নাট্যবিচারের প্রধান পদ্ধতি ছিল রসবিচার। এ কথা সত্য যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-শিল্পের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে রসবিচারই প্রধান রূপে বিবেচ্য ছিল। তবে অনেকে শিল্প-কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে কাব্যবস্তু বা বিষয়বস্তুকে তুলে ধরেছেন। অবশ্য নন্দীকেশর অভিব্যক্তিকে বড় করে দেখেছেন। ভরত মুনির শাস্ত্রে নাটক রচনা, কাঠামো, মঞ্চনির্মাণ, অভিনয়ের ধরন, সাত্ত্বিক বিশ্বাস, শারীরিক ক্রিয়াদি, সাজসজ্জা, পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য-সংগীত, শিল্প পরিচালকের ভূমিকাসহ নানা বিষয়ের বিস্তর নীতিনির্ধারণী আলোচনা পাওয়া যায়। সমালোচনায় রস বিচার মূলত নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। পাঠ বা দর্শনের অভিজ্ঞতার ওপর যা নির্ভর করে। নাট্যশাস্ত্র মতে স্থায়ীভাব আটটি। তা হলো—রতিভাব, হাসভাব, শোকভাব,

উৎসাহভাব, বিস্ময়ভাব, ভয়ভাব, জুগুপ্সাভাব ও ক্রোধভাব। এছাড়াও সঞ্চারী ভাব ৩৩টি। শিল্পকরণ কৌশলে ভাব থেকে রসের উৎপত্তি ঘটে। রসগুলো হলো—আদিরস বা শৃঙ্গাররস, হাস্যরস, করুণরস, বীররস, অদ্ভুতরস, ভয়ানক রস, বীভৎসরস ও রৌদ্ররস। অবশ্য পরবর্তী আলংকারিকগণ শান্তভাব নামের নতুন ভাবের কথা বলেছেন। আর শান্তভাব থেকে শান্তরসের উৎপত্তি ঘটে। দর্শকের মধ্যে সঞ্চায়িত রসানুভব নাট্যশাস্ত্রে গুরুত্ব পেয়েছে। ভরতের পর নাট্যতত্ত্বকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক', সাগর নন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থ।' আচার্য দণ্ডীর কাব্য বা শিল্প বিচারের মানদণ্ড ছিল অলংকার। দণ্ডী মনে করতেন কাব্য অভিধা অলংকারের গুণেই হয়ে উঠতে পারে। তবে তিনি ভাষার বক্রোক্তিকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। অন্যদিকে ভামহ ছিলেন রসবিরোধী। কাব্যে তিনিও অলংকারকে প্রধান রূপে দেখতেন। অন্যদিকে কাব্য বা শিল্পের আত্মা হিসেবে রীতিকে প্রধান মনে করতে আচার্য বামন। কাব্যতাত্ত্বিক কুন্তক বিশ্বাস করতেন ভাষার বক্রতাই কাব্য বা কাব্যের সৌন্দর্য তৈরি করে। নন্দনতাত্ত্বিক আচার্য বিশ্বনাথ অবশ্য নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনির পথেই হেঁটেছেন। কাব্যের আত্মা যে রস তা তিনি দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন। কাব্যবিচারে সৌন্দর্য ও রসানুভূতির কারণে শিল্প-সাহিত্যে উদ্দেশ্য পরিগণিত হতো আনন্দপ্রাপ্তি হিসেবে। নাটক দৃশ্যকাব্য হিসেবে চিহ্নিত হতো বলে কাব্যতত্ত্বের মূল্যায়নমুখী পদ্ধতির প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

হাজার বছরের এ বাংলায় সমালোচনার মূল পদ্ধতি ছিল রসোপভোগ। প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুসারে সাহিত্য-শিল্প সমালোচনায় প্রাধান্য পেত শিল্প উপকরণের নান্দনিকতা। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে ভক্তি-রস প্রধান হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসুর বিচারের পদ্ধতি ছিল নিজের রুচিবোধ, ভালো-মন্দ লাগার উপভোগনির্ভর ও পাঠকের সেতুবন্ধনের নিমিত্ত। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তিনভাবে সমালোচনা করা যেতে পারে—ব্যাখ্যান, বিচার ও রসোপভোগ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমালোচনা হবে সাহিত্যের ব্যাখ্যা। সাহিত্য-শিল্প বিচার পদ্ধতি যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথ চৌধুরী, আবু সাইয়িদ আইয়ুব নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলার সমালোচনার ধারাকে বিকশিত করতে তৎপর ছিলেন। এ ভূখণ্ডে হাজার বছর ধরে অলংকার, রীতি, রস, বাচ্য, সৌন্দর্য, ব্যঙ্গ

নানা উপাদানভিত্তিক মানদণ্ড থাকলেও ত্রিশের দশকে বাংলা সমালোচনায় টি এস এলিয়ট, বোদলেয়ার কিংবা প্রতীকমুখী আধুনিকতাবাদ প্রধান হয়ে উঠেছিল। ইউরোপে তখন ব্রের্টল্ট ব্রেখট, কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কি, মেয়রহোল্ডের মধ্য দিয়ে থিয়েটারের নতুন মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাহিত্য বিচার' প্রবন্ধে বলেন, 'সূক্ষ্ম দৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনীন হয় না। সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির উপরে। ...সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে আবার কমে কৃশ হয় এবং স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্য পরিবর্তন পরিমাণ বৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হ্রাসবৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না।'

ইউরোপে প্লেটোর রিপাবলিক কিংবা এরিস্টটোফেনিসের ফগস্-এ যে প্রশ্ন করার ধারা তৈরি হয়েছিল তা যেন আধুনিক যুগে এসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে রূপ নেয়। প্লেটো একটি আদর্শ রাষ্ট্রে দার্শনিক সাহিত্যিক শিল্পী ছাড়া অলীক কল্পনায় ভাসা সাহিত্যিক শিল্পীকে স্থান দিতে নারাজ। শিল্প-সাহিত্যে অলীক কল্পনা মানুষকে সত্যচ্যুত করে বলে আদর্শ রাষ্ট্রে ওই সব সাহিত্যকে একদম নাকচ করে দেন। অ্যারিস্টটল তার 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে অনুকরণের প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শিল্পকাঠামোর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। ডিথিরাম্ব কবিতার রূপ কী, অনুকরণ কীভাবে করে, ট্র্যাজেডি হতে হলে কী থাকতে হবে, কীভাবে নাটকের ঐক্যনীতি নির্ভর করবে, কিংবা নাটকের গঠনকৌশল কী হবে অ্যারিস্টটল তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের মান নির্ধারণে টুলস বা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এখানে চিহ্নিত।

গ্রিক সভ্যতার পতনের পর হোরেসের আর্স পোয়েটিকার ভাব-ভাষা-কল্পনার সমুন্নতি, লুঙিনুসের পেরি হাইপুসের সাবলিমিটি কিংবা সিসিরোর অলংকার সমালোচনা বিদ্যায় অত্যন্ত গুরুত্ববহ রূপ লাভ করে। যদিও রোম সভ্যতা বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের চেয়ে জীবনকে আনন্দময় করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। পরবর্তী খ্রিষ্টায় ধর্মীয় প্রভাবে সমস্ত ইউরোপীয় বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তার বিকাশ স্থবির হয়ে পড়ে। এ সময়ে আরবের দেশগুলোতে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম নয়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস-আধুনিকতার যাত্রাই শুরু হয়েছিল যুক্তিবাদ ও সমালোচনার বিকাশের মাধ্যমে। ইতালির পেত্রার্কের কবিতার মধ্য দিয়ে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নের যাত্রা শুরু হলো তা ধীরে ধীরে ইউরোপে প্রবল হয়ে ওঠে। রেনে ডেকার্ত প্রথম নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। বস্তুবাদী চিন্তাধারায় লক, বাকলে, হিউম অপরদিকে অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তাধারায় ডেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিস দার্শনিক ভাবনাগুলো ব্যাপকভাবে শিল্প-সাহিত্য কিংবা রাজনীতি প্রভাব সৃষ্টি করে। সমালোচনার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। মধ্যযুগের ইমানুয়েল কান্ট-ই এসে প্রথম অভিজ্ঞতা ও বস্তুবাদের সমন্বয়ে এক নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করেন। এমনকি শিল্প-সাহিত্যসহ প্রাকৃতিক নিয়মকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন। সমালোচনার বুদ্ধিভিত্তিক গতিই তৈরি হলো ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে। শিল্প-সাহিত্য সমালোচনার নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত থাকে। সমালোচনার অসহিষ্ণুতার বিপরীতে সমালোচনা যে গুরুত্বপূর্ণ তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সমালোচনাটি আলাদা জ্ঞানকাণ্ডে পরিণত হতে থাকে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সমালোচনামূলক বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হলেও কবি আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪)-এর An Eassy on criticism (1711) খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রিস ও রোমের ধ্রুপদি সাহিত্যচর্চার প্রেক্ষিতে সমালোচনার প্রকৃতি এতে অনবদ্যভাবে চিত্রিত। সমালোচনায় কবিতার ক্ষতি হয় না, বরং আরো উৎকর্ষের দিকে ধাবিত হয়। ম্যাথু আর্নল্ড তার *Essays in Criticism (1865)* গ্রন্থে শেকসপিয়র, কিটস, পার্সি বিশি শেলির কাব্যের ব্যাখ্যায় সমালোচনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন। গ্রন্থটির প্রথম অংশে সাহিত্যকর্মের ওপর আলোচনা; দ্বিতীয় অংশে সমাজে সমালোচনার ভূমিকা সম্পর্কে তার নিজস্ব অভিমত। সমালোচক সমাজে জনমত গঠনে ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন বলে উল্লেখ করেন। Northrop Frye-এর Anatomy of Criticism (1957) সমালোচনার তাত্ত্বিক রূপ-রীতি ও কৌশলের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। এসব গ্রন্থগুলো সাহিত্য সমালোচনার একটি আধুনিক রূপরেখা তৈরি করে। অধুনা রোলা বার্থ, মাইকেল ফুকো, কার্ল মার্কস, ফেডরিক নিৎসে, সিগমন্ড ফ্রয়েড, ভার্জিনিয়া উলফ, সিমোন দ্য বোভেয়ার, দেরিদার ভাবনায় সমালোচনা আলাদা জ্ঞানকাণ্ড হিসেবেও বিশ্বে স্বীকৃতি

পায়। ফলে ইউরোপে সমালোচনা বিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু উপনিবেশ শাসনে আমাদের এ ভূখণ্ডে অস্তিত্ব ছিল শঙ্কাপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের প্রাশ্নিক-এর যে বিকাশ তা মীমাংসাতত্ত্বে উদগত হলেও এ সময়ে এসে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এমনকি আবহমান বাংলার রস, অলংকার, রীতি, বাচ্য, সৌন্দর্য, ব্যঙ্গ নানা টুলস বা উপাদানগুলো গুরুত্বহীন হয়ে অনেকের মধ্যেই ইউরোপীয় মানদণ্ডের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

সমালোচনাচর্চায় ইজম ধারা আঠারো শতকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন যুগে শ্রেণিগত বিভাজন—ট্র্যাজেডি, কমেডি, ফার্স কিংবা মেলোড্রামার রূপ নির্ণয়ের স্থলে আঠারো শতকে ইজম বা ভাবাদর্শজনিত সিম্বলিক, এক্সপ্রেশনিস্টিক, ইমপ্রেশনিস্টিক, সুররিয়েলিস্টিক, রিয়েলিস্টিক, আইডিয়ালিস্টিক, স্টাইলাইস্ট, আর্ট ফর আর্ট সেক প্রভৃতি নানা ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে সমালোচনা বলতে ব্যাখ্যানধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী, মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ রচনার প্রবণতাকে বোঝাত। একবিংশ শতকের শুরুর দিকে রুশ ফর্মালিজম ধারাটি সমালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ত্রিশের দশকে আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজম, চল্লিশের দশকে আধুনিকতাবাদ, নিউ ক্রিটিসিজম, প্রপঞ্চবাদ, ষাটের দশকে কাঠামোবাদ, সত্তরের দশকে—বিনির্মাণবাদ, পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ, ভাষাতাত্ত্বিক সমালোচনা, আশির দশকে সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ, নিউ হিস্টারিসিজম প্রভৃতি নামের নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নমুখীর ধারার বিকাশ ঘটে। সম্প্রতি বিশ্বে সমালোচনাকে দুটো প্রধানভাগে ভাগ করে থাকে—তত্ত্বীয় সমালোচনা ও প্রায়োগিক সমালোচনা। আবার ধারাগুলো নানামুখী ব্যাখ্যানে বর্ণিত—অনুকারী সমালোচনা, বাস্তববাদী সমালোচনা, অভিব্যক্তিবাদী সমালোচনা, বিষয়গত বা অবজেকটিভ সমালোচনা, গ্রথিক সমালোচনা বা টেক্সটুয়াল সমালোচনা, নিউ ক্রিটিসিজম ইত্যাদি। অতি সম্প্রতিকাল থেকে সমালোচনার বিশ্লেষণাত্মক রীতি দেখা যায়। সেগুলো নানা নামে পরিচিত।

দৃষ্টিভঙ্গিগত জায়গা থেকে সম্প্রতি প্রাশ্চাত্য-প্রতীচ্যে প্রতীক বা চিহ্নভিত্তিক সমালোচনার ধারা প্রবল। চিহ্নবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প-সাহিত্যের উপকরণগুলো কী ইঙ্গিত বহন করে তার বিশ্লেষণ করে। উত্তরাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নানা উপকরণে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা বেশি।

সে জন্য নারীবাদ, বিনির্মাণবাদ, মাকর্সবাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ, আঁভাগার্দ, সাইকো-অ্যানালাইসিস, লৈঙ্গিক, ফেনোমেনোলজি প্রভৃতি সম্প্রতি জনপ্রিয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চা প্রধানত কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার রীতি দ্বারা প্রভাবিত। ফলে নাট্য সমালোচনার তৎকালীন মানদণ্ড কলকাতার পত্রপত্রিকার আদলনির্ভর ছিল। আবার কলকাতা ব্রিটিশদের অনুকরণ করত। ব্রিটিশদের নাট্যতত্ত্বের দ্বন্দ্ব, সংলাপ ও ঐক্যনীতিকে প্রধান বিবেচনায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নাট্য সমালোচনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ সমালোচনাগুলো প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ছিল বিনোদন পত্রিকাগুলো। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় নাটকের জন্য আলাদা পাতা বরাদ্দ হয়। দৈনিক পত্রিকার প্রতিদিন বিনোদন কিংবা সাহিত্য পাতায় নাটকের সংবাদ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। কোথায় কখন কী নাটক হচ্ছে তার সংবাদ যেমন পত্রিকায় উঠে আসতে শুরু করে, আবার সেই নাটকের পর্যবেক্ষণ নিয়েও আলোচনা থাকে। কখনো বা বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসা, নিন্দা বা অভিজ্ঞতামূলক বর্ণনাও প্রকাশ হতে থাকে। অন্যদিকে সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে নাট্যবিষয় ও সংলাপ নিয়ে কথার ফুলঝুরি ফোটে। ম্যাগাজিন খুললে চোখে পড়ে রঙিন ছবির মোড়কে অভিনয়ের নানা কারিশমার তথ্য। এসব লেখায় কখনো কখনো গঠনমূলক সমালোচনার নাম করে নেতিবাচক পয়েন্টগুলো এমনভাবে দেখিয়ে দেন যে, শিল্পটিই পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে! কেউ কেউ অন্যান্য নাটকের সঙ্গে কিংবা পূর্বের প্রযোজনার সঙ্গে তুলনা করে আলোচনা করেন। সে সময় প্রবণতার মধ্যে আরো ছিল—নাটক নিয়ে নেতিবাচক কিছু একটা বলা চাই-ই চাই। নাটক বিষয়ক স্বতন্ত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। সম্প্রতি 'থিয়েটার', 'থিয়েটারওয়ালা', 'দুই বাংলার থিয়েটার', 'মঞ্চকথা' প্রভৃতি পত্রিকা নাট্য সমালোচনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তা ছাড়া বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য পত্রিকা 'কালি ও কলম' প্রকাশের শুরু থেকেই নাট্যবিষয়ক গবেষণা, প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশকে বিশেষ স্থান দিয়ে আসছে। বাংলাদেশে নাট্য আলোচনা নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এগিয়েছে। এ অঞ্চলে উপনিবেশ যুগে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমালোচকদের পছন্দ করতেন না। সম্ভবত তিনি মনে করতেন সমালোচকের নানা বক্তব্য নাট্য পরিবেশনায় ক্ষতি করে। কিন্তু সেপ্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। জার্মানের মহাকবি গ্যাটে সমালোচকদের খুব অপছন্দ করতেন। তলস্তয় সমালোচকদের স্টুপিড বলে ধিক্কার করেছেন। কিটসের মৃত্যুর জন্য সমালোচকদের দায়ী করা হয়েছে। বার্নাড শ'কে নানাভাবে নাজেহাল হতে

হয়েছে। জীবনানন্দ দাশকে অকবি হিসেবেই বারবার তিরস্কারের শিকার হতে হয়েছে। সমালোচনা বিদ্যায় সামাজিক নানা সীমাবদ্ধতা আছে। তাই নাটকের সমালোচনা হওয়া উচিত পদ্ধতিগত পর্যালোচনা। প্রত্যেক শিল্পই স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সগৌরবান্বিত। নিজস্ব রূপেই নিজের মতো সুন্দর। তার নিন্দা করার অধিকার কারো নেই। কারো ভালো লাগতে পারে কিংবা কারো মন্দ লাগতে পারে। সমালোচনা শিল্পের ভেতরের নতুন নতুন সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে। শিল্প ও শিল্পীর মনোভঙ্গির পর্যালোচনা করা যেতে পারে। শিল্পের নানা উপকরণ বা প্রতীকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে পারে। শিল্পীর চেতনা, এমনকি কর্মপ্রক্রিয়া নিয়ে পর্যালোচনা হতে পারে। মানবসমাজের উপযোগিতা নিয়ে গুরুত্বমূলক মূল্যায়ন হতে পারে। কখনো তুলনা, কখনো বিশ্লেষণ, কখনো গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় তা বিবৃত হয়ে উঠতে পারে। অনুদ্ধারিত চিন্তা ও প্রক্রিয়াগুলোকে অনাগত মানুষের জন্য লিখে দিতে পারেন।

কী গুণ থাকতে হয় একজন নাট্য সমালোচকের? প্রবাদ আছে—ভালো দর্শক ভালো সমালোচকও। অতএব নাট্য সমালোচনা করতে গেলে প্রথমে ভালো দর্শক হতে হবে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'সমালোচনার কথা' গ্রন্থে সমালোচকের বেশ কিছু গুণের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত ভালো লাগার ভাবোচ্ছ্বাস বা ভালো না লাগার নিরুচ্ছ্বাসে ব্যস্ত থাকবেন না; যত সম্ভব নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য বিচারে এমনভাবে প্রবৃত্ত হবেন যাতে পাঠকের সঙ্গে সাহিত্যের পরিচয়গত কোনো বাধা, কোনো আরোপিত নিয়মকানুনের বাঁধন না পড়ে।' তাই সাধারণভাবে বলা যায় একজন সমালোচকের থাকতে হবে নিরপেক্ষতা, গভীর শিল্পবোধ ও বিচক্ষণক্ষমতা।

সমালোচককে অবশ্যই সাহিত্য বা শিল্পের প্রতি অনুরাগী হতে হবে। সমালোচককে নাটকের ইতিহাস, নাটকের তত্ত্বীয় রূপ কাঠামো, নান্দনিকতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা থাকতে হবে। শুধু নাটক নয়; পৃথিবীর মানুষ, মানুষের জীবনধারা, সমাজ সংস্কৃতির রূপ কাঠামো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। নতুনকে মেনে নেবার মতো উদ্দীপনামূলক মনোবৃত্তি থাকতে হবে। তাকে মুক্তমনা হতে হবে। সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দেওয়ার মতো মানসিকতা থাকতে হবে। সমকালীন বৈশ্বিক বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে। তাকে প্রজ্ঞাবান হতে হয়। অন্যকে অনুধাবন করার যেমন ক্ষমতা থাকবে তেমনি নিজের কাজের প্রতি সততাও থাকতে হবে। শিল্পে সীমাবদ্ধতা

প্রকাশের ভাষাও সুসংহত হওয়া উচিত এবং সমালোচককের নিজস্ব সৃজনচিন্তা ও মতামত প্রকাশে সুস্পষ্ট হওয়া জরুরি। সমালোচককে হতে হয় ত্রিকালদর্শী। নাটক যেহেতু যৌথ শিল্পমাধ্যম। তাই এখানে সাহিত্য কাব্য, নৃত্য, সংগীত, ক্রীড়া, চিত্রকলা, জাদুবিদ্যা, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি জড়িত থাকে। সে জন্য বিশ্লেষণের পরিসরও অনেক বড়। নাট্য সমালোচনা সৃষ্ট শিল্পকে আঘাত করা নয়; বরং শিল্পের উন্নতি সাধন করা। মৌলিক রচনার চেয়েও সমালোচনা অনেক বেশি কঠিন। এর জন্য দরকার সৃজনশীল মন-মনন, জ্ঞান, দক্ষতা ও গভীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা। একটি নাট্য প্রযোজনায় পর্যবেক্ষণ করার অনেক বিষয় থাকে। মিথস্ক্রিয়া অনুধাবনের ক্ষমতা থাকতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে বলেন, 'সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।'

চিত্রশিল্পের সমালোচনায় যেন গভীর জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের দরকার তেমনি এ যৌথ নাট্য শিল্পের সমালোচনায় স্তিতধী, অধ্যয়ন, অনুধ্যান দরকার। নাট্য সমালোচনায় সৃষ্ট নাট্য কর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ রেখে সমালোচনায় হাত দেওয়া উচিত। সরাসরি তত্ত্বের সঙ্গে প্রযোজনার মিল বিন্যাস খোঁজা নিরর্থক। সমস্ত উপকরণের সুসমন্বয় নিয়েই নাট্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা তৈরি করে। যুগের পরিবর্তনে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের সবকিছুই সংগতি রাখা প্রয়োজন। সমালোচনা একদিকে নাট্যের ভালো দিকগুলো পর্যালোচনা করবে, নাট্য দর্শনে উদ্বদ্ধু করবে, আবার নাটকের সমীবদ্ধতা বা নেতিবাচক বিষয়গুলোও তুলে ধরে নাট্য প্রযোজনার পরিবর্ধন করবে। শিল্পের উন্নতির জন্য সবার মধ্যে শিল্পের প্রতি সহানুভূতি বাড়াতে সাহায্য করবে। নাট্য যেহেতু পরিবেশনা শিল্প সে কারণে একজন সমালোচক একটি দিকের একবারের উপস্থাপনা দেখেই মন্তব্য ঠিক নয়। কারণ পরিবেশনা শিল্পকলায় পরিবেশনকারী দলের শারীরিক-মানসিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উপস্থাপনাটি নির্ভর করে। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় নাট্যশিল্প উপস্থাপন বেশি জটিল ও কঠিন। সে জন্য সমালোচক শিল্প-সৃষ্টির পাশে দাঁড়ায় এবং সৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ রূপের দিক নির্দেশ করে। সমালোচক মূলত সৃষ্ট শিল্পের মধ্য দিয়ে কী

কী নতুনত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার সামগ্রিক নাট্যভাষা তুলে ধরে। অগাস্টো বোয়াল, পাউলো ফেইর, বাদল সরকার এবং বর্তমান আরো অনেকই ফর্মের গণ্ডি থেকে বের হয়ে এসে নতুন নাট্য নিয়ে দাঁড়িয়েছেন গণমানুষের সামনে। নাট্যকার, নির্দেশকের স্বাধীনতার প্রতি সমালোচককে শ্রদ্ধা রাখতে হয়। যদি নতুন কিছু সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে তবে তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে। কিন্তু সে মুগ্ধতা অযৌক্তিকভাবে নয়, যৌক্তিক, পরিমিতিসম্পন্ন, নান্দনিক ও শৈল্পিক হতে হবে। ফর্মের নতুন কোনো ধ্যান-ধারণা নিয়ে আসলেই যে নাট্যের বিশুদ্ধতা নষ্ট হলো এমন কিছু ভাবা ঠিক নয়। নির্দেশক নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্যকে বজায় রেখে বিভিন্ন রকমের উপস্থাপনীয় কৌশলের নিরীক্ষা করতে পারেন। সমালোচকের প্রি-কনসেপ্ট থাকবে না, মুক্ত মন থাকবে। শিল্পের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করাটা জরুরি।

নাট্য সমালোচনাও সাহিত্য। আবার নাট্যশিল্প সমালোচনা ও নাট্য সাহিত্য সমালোচনা ভিন্ন জিনিস। নাট্য সাহিত্য সমালোচনা শুধুই টেকস্ট কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। আর নাট্যশিল্প প্রয়োজিত নাট্যের ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। এ শিল্প তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয় নির্ভর। আবার নাট্য সমালোচনা ও নাট্য রিভিউ এক জিনিস নয়। নাট্য রিভিউতে মূলত নাট্য পর্যবেক্ষিত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি তার পর্যবেক্ষণকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। আবার নাট্যের সমালোচনা করা মানে নাট্যকর্মটিকে ল্যাবরেটরিতে ফেলে শুধু কেটে ছেঁটে একাকার করাও নয়। নাট্যটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুচ্ছ বা তাচ্ছিল্য করাও নয়। বলা আবশ্যক যে, নাট্য সমালোচনা সৃষ্টিকে সাহায্য যদি নাও করে তবুও সৃষ্টিকে ধ্বংস করবে না। তবেই, নতুন সৃজন, অনুসন্ধান. যৌক্তিকতা ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে নাট্য সমালোচনা।

কীভাবে লিখতে হয় নাট্য সমালোচনা? নাট্য সমালোচনা লিখতে গেলে নাট্যবিষয়ক মৌলিক ধারণাগুলোর সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হয়ে লিখতে বসতে হবে। নাট্য সমালোচনাকে একজন দর্শকের তাৎক্ষণিক সাধারণ প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করাও ঠিক হবে না। সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর হওয়া জরুরি। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, গবেষণার জ্ঞান সমালোচনা প্রবন্ধকে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ করে। তা ছাড়া কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হবে তার ধরন-ধারণ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

পত্রিকা কিংবা জার্নালের পরিসর অনুসারে আলোচনার ধরন ভিন্ন ভিন্ন হলেও একটি প্রযোজনার কম করে হলেও চারটি উপাদান নিয়ে কথা বলতেই হয়। সেগুলো হলো—প্লট-চরিত্র, নির্দেশনা ও নির্দেশকের ব্যাখ্যা, পরিবেশনা বা অভিনয় এবং সর্বশেষ ডিজাইন। যেমন সেট, পোশাক, আলো ও আবহ। নাট্য সমালোচক Jhon Gassner বলেন, Dramatic criticism consists of describing the interaction that occurred during a dramatic performance when each of the three entities the script, the production and the audience...নিউ ইয়র্ক টাইমসের থিয়েটার রিভিউ পাতার নাট্য সমালোচনাগুলোতে মঞ্চ-উপকরণে প্লট-সেটিংয়ের সঙ্গে চরিত্র-ঘটনার আলোচনা দেখা যায়। লন্ডনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার থিয়েটার রিভিউতে অভিনয়, চরিত্র, সংলাপের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়। সমকালীন ইউরোপে নাটকের একাডেমিক সমালোচনায় পারফরম্যান্স অ্যানালাইলিস করার প্রবণতা লক্ষণীয়। অভিনেতার দেহের ভাষা, আলোর অর্থব্যঞ্জনা, মঞ্চ-উপকরণের গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণের প্রতি অধিক মনোযোগী। নাট্য পরিবেশটা সামগ্রিকভাবে কী অর্থ প্রকাশ করছে তা খুব জরুরি।

নাট্য সমালোচনায় টেক্সট বলতে শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপিকেই বোঝায় না। নাট্য পরিবেশনার প্রতিটি উপকরণই টেকস্ট। বিষয় বা ঘটনার পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পরিবেশনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। নাটক নির্মাণের মনস্তত্ত্ব অন্বেষণ জরুরি। নাটকটির সুপার অবজেক্টিভ কী, নাট্যকার কীভাবে নাটকের গল্প বা বিষয় নির্মাণের পথ তৈরি করেছেন। চরিত্রগুলো কেমন, নাট্য আখ্যানের পরিবেশ কেমন, নির্দেশক কেন, কোন রীতিতে, কীভাবে উপস্থাপন করেছেন, নাটকটি দিয়ে নির্দেশক দর্শকের মনে কী ভাবনা তৈরি করতে চান তা গুরুত্বপূর্ণ। উপস্থাপিত নাটকের প্লট, সেটিং কেমন, এ নাটকটি এ সময়ে কেন গুরুত্বপূর্ণ, এ নাটকটি এ সময়ের নাট্যচর্চায় নতুন কী দিলো কিংবা এ নাটক না থাকলে সমাজের কী কোনো ক্ষতি হতো, নাটকের গঠন কৌশল বিশ্লেষণও জরুরি। নাট্যবস্তুর আলোচনার পর যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো উপস্থাপন শৈল্পী। উপস্থাপনার প্রধান অঙ্গী অভিনয়। কোন ধরনের অভিনয় করেছে, নাট্যকীয়তা বা নাট্যমুহূর্তের নির্মাণ কেমন, ভাব-ভাষা, কীভাবে চরিত্র নির্মাণ করেছেন, চরিত্র নির্মাণে কোন রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, বাচিক অভিনয় কেমন, স্বর-কণ্ঠ, প্রজেকশন কেমন, সহ-অভিনেতার সঙ্গে সম্পর্ক

কেমন, সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশের ধরন কেমন, কণ্ঠে ও অভিব্যক্তিতে কতটুকু প্রভাব ফেলছে। নাটকের নাটকীয়তা কীসে নির্ভর করছে, সংলাপজাত নাকি বর্ণনাজাত, দৃশ্যজাত নাকি গল্পনির্ভর, বিভিন্ন দৃশ্য ও আবেগিক মুহূর্ত তৈরিতে আলো কী রকম ভূমিকা রেখেছে, কী লাইটগুলো কী অর্থে ব্যবহার করেছে, আলো প্রক্ষেপণে পোশাকের রং কী পরিবর্তন হয়ে গেছে। পোশাক ডিজাইনে কী বিষয় বা অভিব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে, পোশাকটি সময়কালকে ধরে রাখতে চেয়েছে নাকি সর্বজনীন নাটকীয়তা তৈরিই মুখ্য? পোশাকের রং, ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা জরুরি। মঞ্চডিজাইন কাহিনি ধারণে কতটুকু উপযুক্ত, সেট নির্মাণে প্লট ও সেটিংকে কীভাবে মিলিয়েছেন, চরিত্রের চলাচলে মঞ্চটি কতটুকু উপযুক্ত, রং, রেখা ও নৈর্ব্যক্তিকতা বা ইঙ্গিতবাদী শৈল্পিক উপকরণ কতটুকু এসেছে তা বিচার জরুরি। আবহমান বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতির বিচার বা মূল্যায়ন ইউরোপীয় টুলস বা পদ্ধতি দিয়ে নয়; ঐতিহ্যবাহী বাংলার রীতি বা মূল্যবোধ দিয়ে করাই যুক্তিযুক্ত।

নাট্য বিশ্লেষণে প্রথমে গুরুত্ব দিতে হবে নাট্য পরিস্থিতিকে। নাট্যীয় আখ্যানভাগের সময়, স্থান, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, বোধ-বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে অনুধাবন করতে হবে। তারপর প্লটের অন্তর্গত ও বহিঃকাঠামোর রূপ নির্ধারণ আবশ্যক। চরিত্র কিংবা প্লটের সাবটেক্স্ট অনুসন্ধান নাট্যচিন্তা উপলব্ধি করতে বা বিশ্লেষণ সহজতর করে তুলে। চরিত্রের ধরন-মনন-মানসিকতা ও প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর চরিত্রের সংলাপ বৈশিষ্ট্য অনুধাবন জরুরি। নাট্য ক্রিয়াগুলো ও তার নেপথ্যের সূত্র তুলে ধরতে হবে। নাটকের গতি, ছন্দ ও প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে হবে। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ দিয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক ভাষা তৈরি করে তার পর্যালোচনা জরুরি।

আবহমান বাংলার পালা কিংবা যাত্রা নাট্যে দৃশ্য নির্মাণ করা হয় না। কিন্তু ইউরোপীয় নাট্যে দৃশ্যকল্প বা ভিজ্যুয়াল তৈরি করা হয়। রস নিষ্পত্তির জায়গা থেকে নাটকটি কেমন, উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় ফর্ম, নান্দনিকতা, টিমওয়ার্ক বা সামগ্রিক সমন্বয় কতটুকু গতিশীল। আর দর্শকের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে কী দেখাচ্ছে, কোথায় দেখাচ্ছে, কীভাবে দেখাচ্ছে এবং কাকে দেখাচ্ছে—তার অনুপুঙ্খ রূপ বিশ্লেষণ-যৌক্তিকতা-নান্দনিকতা নাট্যসমালোচনায় প্রয়োজন। পরিবেশনাটি বিচার করতে কন্টেন্ট, ফর্ম, স্টাইল, ইজম—টেক্সট ও পারফরম্যান্স, প্লে টু পারফরম্যান্স টু

অডিয়েন্সকে কীভাবে যোগাযোগ তৈরি করেছে, সমকালীন উপযোগিতা ও পারফরম্যান্স অ্যাওয়ারনেস বা শিল্পের মধ্য দিয়ে দর্শককে কী দিতে চান তার অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন জরুরি। নাট্যটিতে শৈল্পিক মাত্রাগুলো কীভাবে কাজ করেছে তার ব্যাখ্যাগুলো প্রয়োজন। আর নাট্য সমালোচনায় দর্শকের প্রতিক্রিয়াও জরুরি।

নাট্য সমালোচনা প্রবন্ধটি সাজাতে হয় মূলভাবকে উদ্দীপিত করে শিরোনাম, আকর্ষণীয় প্রথম লাইন; মধ্যভাগে বিশ্লেষণ ও আকর্ষণীয় সমাপ্তি বাক্য। বর্ণনার সঙ্গে বিশ্লেষণ, ইঙ্গিতধর্মী উপকরণগুলোর ব্যাখ্যা; তার সঙ্গে বিচার বা রসোপভোগ কিংবা মূল্যায়ন থাকে। স্থান কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে আলোচনা ভিন্ন ভিন্ন হবে। সমালোচনা এমন হতে হবে যাতে শুধু নাটকের প্রয়োগকর্মীরা নয় সবাই যেন বুঝে। যে লেখাটি নাট্যকর্মী ও সাধারণ পাঠককে একসঙ্গে অদেখা থিয়েটারকে বোঝাবে, মূল্যায়ন করবে এবং থিয়েটারে আগ্রহী করে তুলবে সেটিই আদর্শ লেখা। মঞ্চে আত্মনিষ্ঠ সাত্ত্বিক অভিনয়, কিছু চটুল বাহবা পাওয়া সংলাপ কিংবা লাফালে-ঝাঁপালেই উৎকৃষ্ট থিয়েটার হয়ে যায় না সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ইউরোপের নাট্য সমালোচনা আর আমাদের বাংলাদেশের নাট্য সমালোচনার ধরন এক হবে না। আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। আমাদের আত্মপরিচয় সৃষ্টি হওয়া জরুরি। আমরা উপনিবেশ মনস্তত্ত্বের কারণে এখনো আমাদের চারপাশ দেখি ইউরোপীয় চোখে। সে জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের চোখ দিয়ে। মূল্যায়ন করতে হবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ দিয়ে। নাট্যসমালোচকের দেখতে পারার ক্ষমতা অর্জন খুব জরুরি। আর দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করতে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে। কোনো থিয়েটার দেখলেই প্রশ্ন শুরু করতে হবে—থিয়েটারটা মানবজাতিকে নতুন কী দিল, নাট্যীয় নানা উপকরণে কীভাবে কী অর্থব্যঞ্জনা তৈরি করল। তখন নির্দেশনার পাঁচ উপাদানের প্রয়োগ কিংবা তাত্ত্বিক-তুলনামূলক পদ্ধতি ও যৌক্তিকতা-নান্দনিকতা বিশ্লেষণের পরিবর্তে বর্ণনাত্মক গবেষণার ভঙ্গিটা প্রধান হয়ে ওঠবে। পরিবেশনাকে স্টাডি হিসেবে দেখা উচিত। আমি নাটকটি কীভাবে পাঠ করি বা বুঝি সেভাবেই লিখলেই সহজে লেখা হয়ে যায়। পাঠকরা আমার অভিজ্ঞতা পাঠ করবে মাত্র।

বাংলাদেশের সমালোচনায় উপকরণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের সাথে হাজার বছরের বাংলার রীতি, নন্দনভাবের নীতি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কলকাতার শিল্প আদর্শ ও আমাদের আদর্শ এক নয়, তাও বোঝা উচিত। ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমাজ-রাষ্ট্রের একটা নিজস্ব কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের সেরূপ কিছুই হয়নি। সে ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নির্মিত বাঙালির সাংস্কৃতিক চেহারা নানা রঙের যৌক্তিকতায় উদ্ভাসন প্রয়োজন। যার শিকড়-ই নেই তার আবার ডালাপালার মধ্যে এত রঙারঙির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বাংলার পালা-জারি-যাত্রা-নাটগীত প্রভৃতি নানা ঐতিহ্যবাহী নাট্য পরিবেশনারীতির মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলোর গভীর পর্যবেক্ষণ আত্মপরিচয় নির্মাণ ও বর্ণনামূলক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করবে। পরিবেশনা কন্টেন্ট ধরে কখনো গবেষণা, কখনো রিভিউ, কখনো মূল্যায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা উচিত। কোনো আলোচনা হতে পারে চরিত্রের সাবটেক্সটভিত্তিক, কোনো আলোচনা মূল্যায়নধর্মী, কোনোটা দৃশ্যবর্ণনা নির্ভর। যেসব নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে, অ্যাক্টে নানা লেয়ার তৈরি হয়েছে সেগুলোতে বর্ণনাত্মক প্রক্রিয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। যেগুলো সংলাপাত্মক সেগুলোর আলোচনায় প্রাধান্য পায় সংলাপ। সমস্ত পরিবেশনা দিয়ে যে নির্দেশক একটি অখণ্ডভাব বা চিন্তাকে উসকে দিতে চায় পাঠকের অনুধাবনের জন্য সেগুলোর আলোচনা বর্ণনানির্ভর। বিভিন্ন পত্রিকার মেজাজ, পত্রিকার উদ্দেশ্য, পরিসর ও পাঠকের ভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে লেখা হওয়া উচিত। সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকে ইউরোপীয় রীতি বা টুলসগুলোর অন্ধ অনুকরণ করে থাকেন। আমাদের এ দেশে বাস করে এ দেশকে যেন ইউরোপীয় চোখ দিয়ে না দেখি। আমার সবকিছু বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হবে আমার ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ-নান্দনিকবোধ দিয়ে। এ জন্য স্থান কালে আলোচনা ভিন্ন ভিন্ন হবে এটা স্বাভাবিক। নাট্য আলোচনায় প্রথাগত তাত্ত্বিকবোধ, স্থান-কালের যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকে মনে করেন শিল্পের ভূগোল নাই। সত্যিই কী তাই! সাংস্কৃতিক ভূগোল বলেও একটি শব্দ প্রচলিত আছে। শিল্পের স্থান, কাল ও সময় আছে। মানবিক কিছু আবেদন ও রূপ রীতি নানা ভূখণ্ডে প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে বলে অনেকে শিল্পের ভূ-সীমা মানতে চান না। অথচ পৃথিবীর ৫০০ কোটি মানুষই আলাদা। মূলসূত্র একই হলেও প্রত্যেকে প্রত্যেকে কত ভিন্ন।

রূপ ও রুচি, সংস্কৃতি-প্রকৃতি সমস্তই ভিন্ন। সত্য যে, ভূ-সীমাহীনতার ধারণা একটা নব্য উপনিবেশ কৌশল। সমালোচনা চিন্তার কাঠামো ও সমালোচনায় ভাষার ব্যবহারে সচেতনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পে সীমাবদ্ধতা প্রকাশের ভাষাও সুসংহত হওয়া উচিত এবং সমালোচককের নিজস্ব সৃজনচিন্তা ও অভিমত প্রকাশে সুস্পষ্ট কিন্তু নমনীয় হওয়া জরুরি। নাট্যশিল্প সব কলাবিদ্যার সমষ্টি। তাই সমালোচককে সাহিত্য কাব্য, নৃত্য, সংগীত, ক্রীড়া, চিত্রকলা, জাদুবিদ্যা, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হয়। আর শিল্পীর সঙ্গে সমঝদার বা ভোক্তার সম্পর্কের ওপর মূল্যায়ন নির্ভর করে বলে সমালোচককে হতে হয় নির্মোহ। তবেই সমালোচনা শিল্পযাত্রাকে সমৃদ্ধতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। আর নাট্যতত্ত্বের বোধ পরিপক্ব, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট না থাকলে নাট্য সমালোচনায় নিরপেক্ষ দর্শন, অপক্ষপাত মূল্যায়ন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সমালোচনাচর্চার অনুকূল পরিবেশ বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এখনো সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি। তা হওয়া খুব জরুরি। বাংলাদেশে নাটকে সমালোচনা যত বাড়বে, নাট্যশিল্পের মান তত উন্নত হবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. *ভরত নাট্যশাস্ত্র* ১, বঙ্গানুবাদ-ড. সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. ছন্দা চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪
২. *আরিস্টটলের কাব্য নির্মাণকলা*, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়কৃত পোয়েটিকসের অনুবাদ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
৩. *হোরেসের কাব্যতত্ত্ব*, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৭৯
৪. *লুঙ্গিনুসের সাহিত্যতত্ত্ব*, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৭
৫. *এবারক্রম্বির সাহিত্য সমালোচনা*, আবু তাহের মজুমদার অনূদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭
৬. ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব, সুধীরকুমার নন্দী অনূদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬
৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচনার কথা, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা
৮. রাশিদ আসকারী, *উত্তরাধুনিক সাহিত্য* ও *সমালোচনা* তত্ত্ব, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ফ্রেন্ডস বুক কর্নার, ২০০৩

৯. গোলাম সারোয়ার, *নাট্য সমালোচনা নিবন্ধ*, মঞ্চকথা, ঢাকা
১০. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
১১. আশিস গোস্বামী, *বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা*, প্রতিভাস, কলকাতা
১২. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০
১৩. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব-বিচার*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা
১৪. আফজালুল বাসার অনুবাদিত '*বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব*', বাংলা একাডেমি, ঢাকা
১৫. মোস্তফা আহাদ সম্পাদিত '*পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি*', ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা
১৬. মাসুদ ইমরান (সম্পা.), ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০
১৭. Alexander Pope, *An Eassy on criticism* (1711), Oxford University Press. London
১৮ Matthew arnold, '*Essays in Criticism' (1865),* Internet Archieve, Ebook
১৯. T Y Northrop Frye, *Anatomy of Criticism*, Princeton, New Jersey, 1973
২০ Edwqrd a wright, *Understanding Todays Theatre, Spectrum,*
২১. Irving Wardle, *Theatre Criticism*. London and New York: Routledge, 1992
২২ James Thomas : *Script Analysis for Actors, Directors, and Designers,* Fourth Edition, Elsevier Inc, USA
২৩. Elaine Aston, George Savona : *Theatre as Sign System-A Semiotics of Text and Performance,* 1st edition, Routledge, USA
২৪. Kenneth Tynan, *Theatre writings,* Nick Hern Books, London

[প্রবন্ধটি 'বাংলা ট্রিবিউন' ওয়েব সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত ।]

বাংলা নাট্য পরিভাষার ভাঙাগড়া

স্বাধীন বাংলাদেশে সেলিম আল দীনই সম্ভবত প্রথম বাংলা নাট্যের বৈশিষ্ট্যগুলোকে তাত্ত্বিক ভিত্তিতে দাঁড় করান বা সংজ্ঞায়ন করেন। সেলিম আল দীন পাশ্চাত্য নাট্যরীতি থেকে বাংলার নাট্যরীতিকে আলাদা চিহ্নিত করা কিংবা স্বমহিমান্বিত করতেই সম্ভবত বাংলা নাট্যের পরিভাষাগত নানা তাত্ত্বিক ভিত্তি সংকলন, সংগ্রহ, সংজ্ঞায়ন কিংবা সৃষ্টি করেছেন। পরিবেশনা শিল্পের পরিভাষাগত নানা বিষয়ই তিনি তুলে ধরেছেন। এ আলোচনায় বাংলার নাট্যপরিভাষা আলোচনার প্রেক্ষিতে সেলিম আল দীনের নাট্যপরিভাষার কৃতিই প্রধানত তুলে ধরব। সেলিম আল দীন বাংলা নাট্যের বিভ্রান্তিমূলক প্রচলিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে নতুন সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। 'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতি' শীর্ষক পিএইচডি গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন বাংলা নাটকের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। উপনিবেশ ইতিহাসে ব্যাখ্যাত আঠারো কিংবা উনিশ শতকের লেবেদেফবর্গ সৃষ্ট নয়। সেলিম আল দীন বলেন—

> 'বাঙলা নাটক সম্পর্কে একটি সাধারণ বিশ্বাস এই যে—ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলে—অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে উক্ত শিল্পমাধ্যমের উদ্ভব ও বিস্তার। সচরাচর কোনো কোনো নাট্য-ইতিহাস গ্রন্থেও এ ধারণা ব্যক্ত হতে দেখা যায় যে—বাঙলা সাহিত্যের ধারায় নাটকের প্রারম্ভকাল ঊনবিংশ শতাব্দী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়—এ ধারণা ভ্রান্ত। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে

> বাঙলা নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিক ও উপস্থাপনারীতি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল মাত্র—কিন্তু তৎপূর্বে প্রায় সহস্র বৎসর ধরে এদেশে—বিভিন্ন ধারার নাট্যের প্রচলন ছিল। এমনকি সংস্কৃত নাট্যের নন্দনতাত্ত্বিক প্রভাবও মধ্যযুগে বাঙলা নাটকে ছায়াপাত করতে সক্ষম হয়নি। বাঙালির নাট্যরসপিপাসা চিরকালই স্ব উদ্ভাবিত দেশজ শিল্পরুচির ধারায় নিবৃত্ত হয়েছে।[১]

উপনিবেশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমাদের ভাষায় 'থিয়েটার' শব্দটি ছিল না। 'থিয়েটার' শব্দটি উপনিবেশ সময় থেকে যোগ হয়েছে। পারিভাষিক অর্থে থিয়েটার বলতে যা বোঝায় তা আমাদের বাঙালি জীবনে দীর্ঘদিন ধরেই বহমান ছিল। সেলিম আল দীন গবেষণায় তুলে ধরেন ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে আঞ্চলিক রীতি হিসেবে যে 'ওড্রমাধগী' রীতির উল্লেখ পাওয়া যায় তা তৎকালীন এ বৃহৎতর মগধ অঞ্চল তথা বাংলা অঞ্চলেরই প্রচলিত রীতি। প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে দশরূপকের মধ্যে 'নাটক' নামে একটি রূপকের সন্ধান পাওয়া যায়। উপনিবেশ শাসনের সময় 'থিয়েটার' শব্দের পরিভাষা হিসেবে সেখান থেকেই 'নাটক' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে অনেকেই নাটক বলতে ইউরোপীয় তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানেই দেখে থাকেন। ইউরোপীয় পরিবেশনা শিল্প 'থিয়েটার' এবং আমাদের পরিবেশনা শিল্প 'নাটক' মূলত ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সেলিম আল দীন বলেন—

> "বাঙলা নাটকের প্রাচীন ও মধ্যযুগে 'নাটক' কথাটি প্রায় দুর্লভ। 'বুদ্ধ নাটক'কে নাটক বলা হলেও তা নৃত্যগীতেরই আঙ্গিক। আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো 'ন্যারেটিভ' ও 'রিচুয়াল থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান, পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।"[২]

'বাঙলা নাট্যকোষ' গ্রন্থটি সেলিম আল দীনের অনন্য সংযোজন। কোষগ্রন্থটির গবেষণা, রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন সেলিম আল দীন

---

[১] মধ্যযুগের বাংলা নাট্য', সেলিম আল দীন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ ভূমিকা অংশ

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪

নিজেই। গ্রন্থটি ১৯৯৮ সালে ঢাকার শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন ফ. র. মাহমুদ হাসানকে। কোষগ্রন্থটি নাট্যসংক্রান্ত শব্দ, পরিভাষা ও নাট্যকৃতির নামের সংকলন। এ কোষগ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাট্যসংক্রান্ত বিদেশি শাব্দিক ব্যাখ্যান কিংবা এ-সংক্রান্ত বিদেশি কোনো পরিভাষাকে গ্রহণ করেননি। যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক নাট্যচর্চা এদেশে ছিল না; তবু অনেকের মধ্যে এদেশীয় নাট্য বিশ্লেষণে ইউরোপীয় তত্ত্বগত প্রয়োগ হতে দেখা যায়। এ কোষগ্রন্থে সেলিম আল দীন ইউরোপীয় তাত্ত্বিক ভিত্তি যেমন পরিত্যাগ করেছেন তেমনি সংস্কৃত নাট্যপ্রসূত শব্দও বর্জন করেছেন। তিনি বাঙালি জীবনের প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাট্যসংক্রান্ত যেসব পরিভাষা কিংবা বিষয়াদি ছিল তা এদেশীয় প্রচলিত ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছেন। সেলিম আল দীন বলেন—

> 'এই কোষ গ্রন্থটি প্রণয়নে দুটি পরিকল্পনা আমাদের সম্মুখে ছিল। প্রথমটি এই যে—এ সংকলনে শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগ এবং এই দুই যুগের ধারাবাহিকতায় লভ্য শব্দ গৃহীত হবে। দ্বিতীয়ত বাস্তবতা এই যে—কোষ গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রসীমার অধীনে বসবাসকারী জনগণের শিল্পরীতির বৃহত্তর পটভূমি প্রতিফলিত হবে। নাট্যকোষটি তাই বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যেরও কোষগ্রন্থরূপে বিবেচ্য।

বাঙলা নাট্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে সংস্কৃত বা পাশ্চাত্য নাট্যের মতো কোন শাস্ত্রসূত্রের অধীনে গড়ে উঠে নাই। নাট্য ও নাট্যমূলক গীত—নৃত্য-কথা—কৃত্য ও হাবভাবের মধ্য দিয়ে আখ্যান ও পরিবেশনায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পরীতি-রূপে এর উদ্ভব-ব্যাপ্তি ও বিস্তার। এই জনপদের নাট্যরুচি আমাদের জীবন—জগৎ ও ভৌগোলিক আবহে পরিপোষিত শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সংস্কৃত বা পাশ্চাত্য নির্দেশিত নাট্যের সংজ্ঞা সূত্রের অধীনে বাঙলা নাট্যের আঙ্গিক ও রীতি নির্ণয় বাস্তবসম্মত নয়। যে লোকায়ত রুচি ও যুগ ধর্মের তাগিদে এর উদ্ভব—তারই স্রোতধারায় সহস্র বৎসর ধরে পরিবাহিত শিল্পশস্যের নানা পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছিল।'[৩]

৬১৬টি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি রয়েছে 'বাঙলা নাট্যকোষ' গ্রন্থে। সেলিম আল দীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্পচর্চাকারীকে অন্যের অন্ধ অনুকরণের বিপরীতে

[৩] সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র, সম্পাদনা সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, খণ্ড-০৫, পৃষ্ঠা-৫৯৭

হাজার বছরের বহমান বাংলা সংস্কৃতির সমৃদ্ধিকে দেখাতে প্রয়াসীও ছিলেন।[৪] বাংলাদেশের বাংলার নাট্যর্চচায় সেলিম আল দীনের এ এক অনন্য সংযোজন। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাট্যক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য—অঙ্কিয়া, অনুনাট্য, অষ্টগান, অষ্টক গান, আখর, আখড়াই, আখ্যান, আজিয়া, গম্ভীরা, বয়াতি, আলকাপ, আলংনাবাহ, আসর, পুথি, লীলা, পাঁচালি, ওন্নি গান, কথা, কথকতা, কবিগান, কাঁচাসরা, কয়া, কাছ, কাঁদনা গীত, কালীনাচ, কিসসা, কীর্তন, কীর্তনীয়া, কুশান গান, কৃত্যনাট্য, ধামালি, কৃষ্ণনাচ, যাত্রা, মঙ্গল গান, নাটগীত, খন, খয়েরা গীত, খেই, খেউড়, খেমটা নাচ, গাইনের গীত, গাঙ্গোনাট, গাজন, গাজীর গান, গাজীর পট, পটগান, গাড়ু গান, গাথা, গান, গাহন, গীতাভিনয়, গীতিকা, গৃহাঙ্গন নাট্য, গেয়কাব্য, গোর্খনৃত্য, গোরিনাচ, ঘেটু গান, ঘেটু যাত্রা, ঘুড়ি নৃত্য, চণ্ডীযাত্রা, চাঁচরি, চোঘর, ছুটাগান, ছুটকি, ছুব, ছৌনৃত্য, জঙ্গনামা, জলনাট্য, জারিগান, জাগের গান, জিকসেককা, ঝুমুর গান, যাত্রা, টনসা যাত্রা, ডঙ্কনাট্য, ঢপকীর্তন, চাঈ নাচ, থমক নৃত্য, দিশা, পালা, নাটুয়া, পুতুলনাচ, বাইশ্যা, ব্রতগীত, ভাওয়াইয়া, ভাদুগান, মুড়াই, রঙ্গ, লীলানাট্য, সঙ, হাস্তর গান প্রভৃতি পরিভাষাসহ সে সময়ের শতাধিক নাট্য পরিবেশনা তুলে ধরেন।

সেলিম আল দীন সম্ভবত পাশ্চাত্য নাট্যরীতি থেকে বাংলার নাট্যরীতিকে আলাদা চিহ্নিত করতে বাংলা নাট্যের আলাদা বৈশিষ্ট্য সন্ধানে কিংবা নির্ধায়নে বর্ণনাত্মক বাংলা নাট্যরীতি নামে তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করান। বর্ণনা ও উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে পাঁচালি ও কথকতার ধারায় অদ্বৈত শিল্পবন্ধনে উপস্থাপিত নাট্যই বাংলা নাট্যের মূল। এখানে গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক এ সবই একীভূত। এ নাটকগুলো বর্ণনা প্রাধান্য দিয়ে রচিত কিংবা উপস্থাপিত হয় বলে বর্ণনাত্মক বাংলা নাট্যরীতি নামে অভিহিত করেছে। 'বাঙলা নাট্যকোষ' গ্রন্থে সেলিম আল দীন ব্যাখ্যায়—বর্ণনা ও উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রাধান্যে মধ্যযুগের পাঁচালি ও কথকতা ধারায় আধুনিক কালের উপন্যাস বা কথা সাহিত্যের ধাঁচে রচিত নাট্যই বর্ণনাত্মক নাট্য।

বর্ণনা ও উক্তি-প্রত্যুক্তির অদ্বৈত মিলনে অভিনয় ক্রিয়াকে সেলিম আল দীন বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলার মধ্যযুগ খ্যাত অধ্যায়ে কথকতা কিংবা পাঁচালিতে বর্ণনা ও সংলাপ থাকত। সে কথকতা ও

---

[৪] প্রাগুক্ত, সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র, খণ্ড-০৫, পৃষ্ঠা-৫৯৯

পাঁচালি ধারায় সমকালীন অভিনয়রীতিই বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি। অভিনয় ক্রিয়ায় বর্ণনার প্রাধান্যই লক্ষ করা যায়।

সেলিম আল দীনের আরেক পরিভাষায়ণ-কথানাট্য। কথকতা মধ্যযুগের বাংলার মধ্যযুগের পরিবেশনা শিল্পের এক পরিভাষা। কথকতা পরিভাষায় হাবভাব-ভঙ্গিমা-গীত ও সুর করে কাহিনি পরিবেশন। সে কথকতা ও পাঁচালি ধারায় রচিত সমকালীন নাটক হতে পারে কথানাট্য। কথার শাসনকে মেনে যে নাটক গতিমান। এখনো গ্রামবাংলার পরিবেশন শিল্প এ শিল্পতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সেলিম আল দীন এ ধারায় রচনা করেছেন 'চাকা' নাটক। মূলত মধ্যযুগের এ ধারাটির সমকালীন যুগসূত্রতায় ভিত্তি স্থাপন করেছেন সেলিম আল দীন। বাংলার এ ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে যে বাঙালির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ও সমকালীন বিশ্বমুখী নাট্য রচনা করা যায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পাশ্চাত্য নাট্যরীতি সংলাপনির্ভর কিংবা বাংলার নাট্যরীতি বর্ণনা বা ব্যাখ্যানির্ভর।

নব্য পাঁচালী রীতি পরিভাষাটি সেলিম আল দীনের নব্য সংযোজন। পাঁচালি রীতি বাঙালি মধ্যযুগের জনপ্রিয় একটি পরিবেশনা আঙ্গিক। গায়েন-বায়েন ও দোহার মিলে নৃত্যগীত-কাহিনি উপস্থাপনের শিল্পপদ্ধতি। মধ্যযুগে পাঁচালির পরিবেশনগত পরিভাষাগুলো হচ্ছে—কথা—বোলাম—দিশা—পদ ও নাচাড়ি। আর কেউ কেউ পরিভাষা নির্ধারণ করেন—পা-চালী—ভাবকালি—নাচাড়ি—বৈঠকি ও দাঁড়া কবি। যাহোক, গীত-নৃত্য-নাট্যের এক অদ্বৈত সমন্বয় ঘটে থাকে। বাঙালি সংস্কৃতির এ বৈশিষ্ট্যে উপনিবেশ জ্ঞানতত্ত্ব উপেক্ষায় দুই শ বছরের মধ্যখণ্ডন কাটিয়ে সমকালে রচিত শিল্প-সাহিত্যই নব্য পাঁচালি বলে চিহ্নিত করেছেন সেলিম আল দীন। সেলিম আল দীনের পাঁচালি আঙ্গিককে আধুনিক মনস্কতায় পুনর্নির্মাণ করে রচনা করেছেন নাটক বনপাংশুল ও প্রাচ্য। শিল্প পরিভাষায় নব্য পাঁচালি।

বাঙালি জাতির মহাজাগরণকারী শ্রীচৈতন্য দেবের 'অচিন্ত্যদ্বৈতবাদ' ধর্মচেতনার নিরিখে সেলিম আল দীন 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' নামক শিল্পচৈতনার উদ্ধার এবং বিশ্বাস করতেন বাংলা পরিবেশনা শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য হলো—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ একের মধ্যে বহুত্বের অবস্থান। একই আঙ্গিকের শিল্পের মধ্যে বহুবিধ আঙ্গিকের শিল্পের সমন্বয়। পাশ্চাত্যের মতো সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয় আমাদের শিল্প। আবহমান কাল ধরেই বাঙালি জাতির সংস্কৃতিতে নাট্য উপাদানসমৃদ্ধ হাজারো পরিবেশনা শিল্প

পর্যবেক্ষণই তা দৃষ্ট হয়। সেগুলো পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি। এ পরিবেশনা শিল্পে একজনই ঘটনা বর্ণনা করেন, গান করেন, বিভিন্ন চরিত্রে একজনই অভিনয় করেন। পাশ্চাত্যের মতো চরিত্রাভিনয় নয়। এ একের মধ্যে বহুত্বের বৈশিষ্ট্যই আমাদের শিল্প বৈশিষ্ট্য। হাজার বছরের বাংলায় নাট্য, কাব্য, সংগীত, ভাস্কর্য, চিত্রকলা শিল্পের কোনো দিকই বিচ্ছিন্ন নয়। সব মিলিয়েই অভেদাত্মক নাট্যশিল্প সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি সূত্র একই, শুধু প্রকাশের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগত ভিন্নতা।

পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম পরিবেশনা পদ্ধতির বিপরীতে বাংলার পরিবেশনা আসরকেন্দ্রিক বলে সেলিম আল দীন তুলে ধরেন। সেলিম আল দীন পাশ্চাত্যের সংলাপনির্ভরতার বিপরীতে রচনা করেছেন বর্ণনাত্মক ধারার নাট্য। পাশ্চাত্যের নাট্য রচনার মতো কোলন দিয়ে দিয়ে সংলাপ লেখেননি; উল্টো বিরাম চিহ্ন বর্জন করে হাজার বছরের বাংলার পরিবেশনার রচনা আদর্শকে ধারণ করেছিল।

সেলিম আল দীন সম্পর্কে অধ্যাপক আফসার আহমেদ বলেন—

'সেলিম আল দীনের তাঁর নাট্যভাবনায় প্রাচ্যের মানবতামুখীন শিল্পরুচিকে স্বকালের প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। আর এ জন্যই তাঁর নাট্যভাবনা ঔপনিবেশিক কালজাত নাট্যরীতির গ্লানিকর অবলেশ থেকে একেবারে মুক্ত। নিজের কালের স্পর্ধিত শিল্পরীতিকে ধারণ করেই সেলিম আল দীন ক্রমাগত আধুনিক নাট্যকার হয়ে উঠেছেন। নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক নির্মাণে সেলিম আল দীন হাত বাড়িয়েছে তাঁর নিজস্ব ভূমে।'[৫]

বাঙলার সংস্কৃতি পাশ্চাত্য কিংবা সংস্কৃত থেকে পৃথকী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সাহিত্য-শিল্পচর্চায় ঐতিহ্যের ব্যবহারমূলক নব্য উপনিবেশ কৌশল উপেক্ষায় ঐতিহ্যের বিকাশ জরুরি। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের বৈশিষ্ট্যে সমকালীন নাট্য প্রযোজনার আদর্শ কিংবা প্রভাব বাংলাদেশের অধিকাংশ নাট্যদলগুলোর নাট্য প্রযোজনার মধ্যে লক্ষণীয়। শতাধিক নাট্য প্রযোজনা এ সময় দর্শকনন্দিত। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য আঙ্গিকের দ্রষ্টা ও নবধারার স্রষ্টা সেলিম আল দীন। সেলিম আল দীন যেমন উপনিবেশ নাট্য ইতিহাসের বিপরীতে হাজার বছরের বাংলা নাট্যের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তেমনি

---

[৫] সেলিম আল স্মরণসংখ্যা, থিয়েটার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৭

বাংলা নাট্যসংস্কৃতির তাত্ত্বিক ভিত্তিও দাঁড় করিয়েছেন অসংখ্য; পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। পাশ্চাত্যের অঙ্ক-দৃশ্যবিভাজনের বিপরীতে সৃষ্টি করেছেন বাংলার হাজার বছরের বহমান পাঁচালি-কথকতা ধারায়, বর্ণনাত্মক বৈশিষ্ট্যে আধুনিক বাংলা নাট্য। ইউরোপীয় সাহিত্য-শিল্পের জ্ঞানতাত্ত্বিক আগ্রাসনের বিপরীতে তুলে ধরেছেন আসর-পালাকেন্দ্রিক সমন্বিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব। বাংলাদেশে ঐতিহ্যের ধারায় নাট্যচর্চায় সেলিম আল দীন পাঠ অনিবার্য।

[প্রবন্ধটি গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের মুখপত্র 'গ্রাম থিয়েটার' পত্রিকায় প্রকাশিত।]

বর্ণমালা কীভাবে তৈরি হলো

লিখনধারা মানবসভ্যতার ইতিহাসকে তথ্যবদ্ধ করেছে। জ্ঞানের বাহন হিসেবে লেখ্য-উপকরণ আবর্তিত হয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। মানবসভ্যতায় ইতিহাসে আমাদের এ পৃথিবী ভূখণ্ডে কখন, কীভাবে মানবযাত্রা শুরু হয়েছিল তা নিয়ে আধুনিক মানুষের ভাবনার শেষ নেই। ধর্ম-দর্শন ও বিজ্ঞান নানাভাবে তা ব্যাখ্যা করে চলেছে। নৃতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর প্রাচীনতম মানবজাতিকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন— অস্ট্রলয়েড, মঙ্গলয়েড, নিগ্রোয়েড ও ককেশীয়। মানবজীবন যাত্রার সঙ্গে ভাষাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনুমান করা হয়, পুরাতন প্রস্তর যুগে ভাষার সৃষ্টি। এ প্রস্তর যুগেই মানুষের প্রতিকূল পরিবেশে জীবনযাপনের জন্য একে অন্যের সাথে ভাব বিনিময়ের দরকার হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক শব্দ, পশুপাখির চিৎকার, গর্জনের অনুকরণে মানুষ আদিম ভাষা সৃষ্টি করেছিল। অনেকে মনে করেন—আদিম মানুষ নানা ধ্বনির অনুকরণ বা সহজাত আবেগ-উচ্ছ্বাস, আনন্দ-বেদনা প্রকাশ বা প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়ার তাগিদে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভাষার সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখান, এ কালেও প্রায় প্রতি ১০ কিলোমিটার পরপর ভাষার পরিবর্তন ঘটে থাকে।

ধ্বনি থেকে ভাষার সৃজন হলে স্বভাবতই ভাষার পরে লেখা পদ্ধতির সৃষ্টি। সভ্যতার শুরুর দিকে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় বোঝানোর সুবিধার্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করত। সে ব্যবহৃত প্রতীক দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করত। এ

ব্যবহৃত প্রতীকই পরবর্তী সময়ে বর্ণ/লিপি হিসেবে পরিগণিত হয়। আবিষ্কৃত বিভিন্ন গুহায় অঙ্কিত চিত্রে বিভিন্ন মানুষ, পশুপাখির ছবির সাথে বিভিন্ন রকমের চিহ্ন দেখা যায়। এ চিহ্নই লিপির উন্মেষের প্রথম ধাপ বলে ভেবে নেওয়া যেতে পারে। এসব চিত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, তৎকালীন গুহাবাসী মানুষ কোনো বিষয়কে বোঝানোর জন্য তার ছবি এঁকে অন্যকে বোঝাত। এর সময়কাল সম্ভবত পুরান পাথর যুগ। পুরান পাথর যুগ থেকে বেরিয়ে ক্রমশ মানুষ নতুন পাথর যুগের দিকে বিকাশমান হতে থাকে। এ সময়কার মানুষের ব্যবহৃত এ প্রতীকগুলো ক্রমশ সাংকেতিক থেকে সাংকেতিক স্তরে পৌছে যেতে থাকে। এ সাংকেতিক স্তরে পৌঁছেই লিপি নামে আখ্যা পায়। এ বিষয়ের ধারণা সম্পর্কে সত্যতার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন গুহাচিত্রগুলোর মধ্যে একই ধরনের চিত্রসমন্বয় দেখে। প্রতিটি গুহাতেই দেখা যায় তাদের কর্মপদ্ধতি বা জীবনভূমিকা এঁকে এঁকে প্রকাশ করার মানসিকতা। এ থেকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ যুগের মানুষ ভাব প্রকাশ করার জন্য বা কোনো বিষয় অন্যকে বোঝানোর জন্য চিত্র এঁকে এঁকে বোঝাত। এই গুহাচিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্পেন ও ফ্রান্সের গুহাচিত্রগুলো।

এই সাংকেতিকতা প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র তাদের 'পৃথিবীর ইতিহাস' গ্রন্থে।' তারা দেখিয়েছেন মাত্র কয়েক শ বছর আগে আমেরিকার সাতটি আদিম রেড ইন্ডিয়ান উপজাতি একমত হয়ে আমেরিকা সরকারের কাছে একটি আবেদন পত্র পেশ করে। আবেদনটি কোন শব্দ বা বাক্য দিয়ে গঠিত নয়। কিছু রেখা টেনে একটি সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। চিত্রে প্রতিটি উপজাতির নিজ নিজ টোটেম প্রতীক অঙ্কিত করে প্রত্যেকের চোখ ও অন্তর একসূত্রে গ্রথিত করে সবার একমত ও এক লক্ষ জ্ঞাপন করা হয়েছে। আবেদনে সরকারের কাছে তারা বিশেষ এক এলাকায় মাছ ধরার অধিকার প্রার্থনা করেছিল।

ব্রোঞ্জ যুগের পরবর্তী সময়ে কৃষিকে ভিত্তি করে সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। সুমেরু সভ্যতায় প্রথম লেখার চিহ্ন প্রতীক ব্যবহার শুরু হলেও পরবর্তী মিসরীয় নগর সভ্যতায় তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। কৃষিকাজকে প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে মানুষের যে জীবনযাত্রা শুরু হয় তাতে সামাজিক নানা ভাবের স্থায়ীকরণ কিংবা তথ্যবদ্ধতায় লিখে রাখার প্রয়োজন হয়। গুহা জীবনের যে চিত্র ব্যবহার হতো তারই অনুসরণে প্রতীকায়িত লিখন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় সামাজিক প্রয়োজনে মানুষ সম্পদের হিসাব রাখা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণ দেওয়া বা ঋণ ফেরত নেওয়ার জন্য যে চিহ্ন বা স্মারক ব্যবহার করত তা

থেকেই আজকের আধুনিক লিপির উন্মেষ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—একজন অন্যকে দশটি পশু ঋণ দেবে, কিন্তু কীভাবে মনে রাখবে ঋণদাতা? তাই মনে রাখার বিকল্প হিসেবে লিখে রাখার প্রবর্তন হয়। হয়তো সে সময় ঋণদাতা সে দশটি পশুর ছবি এঁকে রাখত। যাতে এ দশটি পশুর ছবি দেখলেই বুঝতে পারে যে, দশটি পশু ঋণ দেওয়া হয়েছে। ঋণদাতা যাতে ভুলে না গিয়ে ঋণ আদায় করতে পারে এ জন্যই এরূপ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন। সুমেরীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা কিন্তু নগরসভ্যতার দিক থেকে মিসরীয় সভ্যতা প্রথম। অঞ্চল হিসেবে সুমেরু মেসোপটমীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত একটি অঞ্চল। পরবর্তীকালে মেসোপটেমিয়ায় ব্যাবিলনীয়, এসেরীয়, ক্যালডীয় প্রভৃতি সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। এই সমুদয় সভ্যতা একযোগে মেসোপটেমীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। যদিও সুমেরু সভ্যতায় প্রথম লেখার প্রচলন হয়েছিল বটে, তবে মিসরীয় নগরসভ্যতায় তার বিকাশ লাভ করেছিল। গ্রিফিথস তার 'দি স্টোরি অব লেটার অ্যান্ড নাম্বারস' গ্রন্থে মিসরীয় সভ্যতায় ব্যবহৃত লিখন পদ্ধতিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন মিসরীয়রা ছবি এঁকে এঁকে হিসাব রাখত। এসব চিত্রলিপির জন্য ব্যবহার হতো হাড়, কাদামাটি বা মাটির ফলক, পার্চমেন্ট, ভেলাম, কডেক্স, হাতির দাঁত, কাপড়, পাথর ও প্যাপিরাস। চিত্রের এ লিপিই 'হায়ারোগ্লিফিক' (Hieroglyph) লিপি নামে পরিচিত। যার অর্থ পবিত্র লিপি। ধীরে ধীরে চিত্রের সাথে বিশেষ প্রতীক ব্যবহৃত হতে থাকে। মিসরীয় নগরসভ্যতার স্বর্ণযুগের সুমেরু জাতি গোষ্ঠীর সভ্যতায় যে লিপি ব্যবহৃত হয়েছে তাকে বলে সুমেরীয় লিপি। এ সুমেরীয় লিপির নাম কীলকলিপি (Cuniform)। নরম কাদামাটির চাকটি বা ফলকের ওপর অগ্রভাগের ন্যায় বিভিন্ন দাগ কেটে বা ছবি এঁকে এ লিপি উৎকীর্ণ হতো। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত 'গিলগামেস'-এর সময়ের লেখা দেখা যায়। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের রোজেটা বা রশিদ নামক স্থানে নেপোলিয়নের সৈন্যরা পরিখা খনন করতে গিয়ে ভিন্নধর্মী এক পাথরের সন্ধান পান। পরে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পাঠোদ্ধারে দেখেন এটি পঞ্চম টলেমি রাজবংশের সময় লেখা। এতে কিছু কিছু ভাববাচক অক্ষর ব্যবহার ছাড়াও মূলত চিত্রলিপির পরবর্তী ধাপ দেখা যায়। অনুসন্ধানে দেখা যায় এ রোজেটা পাথরে হায়ারোগ্লিফিক, ডেমোটিক লিপি ও গ্রিক ভাষার অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। টলেমি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর সে চিত্রলিপি বা হায়ারোগ্লিফিক লিপির সঙ্গে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বর্ণের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

চারহাজার অব্দের দিকে মিসরীয় সভ্যতায় চিত্রলিপির প্রচলন ছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এই চিত্রলিপির সময়কাল কয়েক শ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। পণ্ডিতরা মনে করেন, টলেমি রাজবংশের পূর্ব পর্যন্ত হায়ারোগ্লিফিক লিপির প্রচলন ছিল। আলেকজান্ডার মিসর দখল করলে বহু ভাষা-ভাষীর লোকসমাগম হতে থাকে। ফলে লিপি বিবর্তনের ধারায় ভাবলিপি-বর্ণলিপির উন্মেষ ঘটে। চিত্রলিপি পদ্ধতির আরো উন্নয়ন ঘটে এবং মনের সম্পূর্ণ ভাব বা কোনো পূর্ণাঙ্গ শব্দ প্রকাশ করতে ক্রমশ চিত্রের বদলে সেই বিশেষ চিহ্নই ব্যবহার হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ক্রিট, প্যালেস্টাইন, ফিনিশিয়া, লিডিয়া প্রভৃতি অঞ্চল মিসর কর্তৃক অধিকৃত হলে এ ধরনের হায়ারোগ্লিফিক লিপি এ সমুদয় অঞ্চলে ব্যবহৃত হতে থাকে।

চিত্র বা চিত্রপ্রতীক প্রণালিতে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ছাড়া কোনো সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ অসম্ভব ছিল। তাই পরবর্তী পর্যায়ে সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের তাগিদে ভাবলিপির (Ideogram) উন্মেষ ঘটে। ভাবলিপি অবশ্য কোনো স্বতন্ত্র লিপি পদ্ধতি নয়, তা চিত্রলিপির পরিপূরক। এর ফলে চিত্রলিপির চিত্রপ্রতীকসমূহ ক্রমশ ধ্বনিব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। একেকটা চিত্র দিয়ে মানুষের মনের ভাব সূক্ষভাবে বোঝাত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চিত্রলিপিতে মাছের চিত্র দিয়ে মাছ বোঝাত কিন্তু ভাবলিপি সেই মাছের চিত্রের সঙ্গে তীর চিহ্ন ব্যবহার করে মাছ শিকার করাকে বোঝাত, যার ফলে তাদের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতো। এ কারণেই চিত্রলিপি সঙ্গে বিভিন্ন ভাববাচক চিহ্ন ব্যবহার করত। এ চিহ্নের সমন্বয়ে চিত্রলিপি ভাবলিপিতে রূপান্তরিত হয়।

ভাবলিপিতে চিত্রের সাথে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হতো। যেমন—অর্ধবৃত্তের নিচে 'তারা' দ্বারা রাত্রি অথবা অর্ধ বৃত্তের নিচে 'সূর্য' দ্বারা দিন বোঝানো হতো। পরবর্তী পর্যায়ে এ প্রতিকৃতি সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক হয়ে একটি বিশেষ চিহ্নে রূপান্তরিত হয়। তখন কোনো আক্ষরিক চিত্র এঁকে বিষয় বা বস্তুকে বোঝাত না। প্রতিটি চিহ্ন সে বস্তুকে না বুঝিয়ে বস্তুর নামবাচক শব্দকে নির্দেশ করত। যথা—প্রাচীন সুমেরীয় লিপিতে প্রথমে 'মাছ' বোঝাতে মাছের চিত্রই আঁকা হতো। পরবর্তী সময়ে মাছের চিত্র একটি বিশেষ চিহ্নে রূপান্তরিত হয়ে যায়; যার সঙ্গে মাছের আকৃতির কোনো মিল নেই। এই লিপি থেকে মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি বোঝানের জন্য চিহ্ন সংক্ষেপকরণ শুরু করে। এই চিহ্ন সংক্ষেণকরণ থেকেই পরবর্তী সময়ে বর্ণলিপি বা আক্ষরিক লিপির সৃষ্টি হয়।

লিপি বিবর্তনের ধারায় চিত্রলিপি থেকে প্রথমে ভাবলিপি বা অক্ষরলিপি এবং তার পরে ক্রমশ বর্ণভিত্তিক লিপির উন্মেষ ঘটে। এই বর্ণভিত্তিক লিপিই বর্ণলিপি হিসেবে পরিচিত। বর্ণমালা ভিত্তিক লিপির উন্মেষ ঘটেছিল ফিনিশীয় জাতিগোষ্ঠীর হাতে। পণ্ডিতরা মনে করেন ফিনিশীয় জাতিই প্রথম বর্ণভিত্তিক লিপির উদ্ভাবন করেন। এ লিপিতেই প্রথম বর্ণমালা সংঘটিত হয়। ফিনিশীয় জাতি ছিল মূলত বাণিজ্যগোষ্ঠী জাতি। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করত। ফলে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা পরিচিতি লাভ করে। তারা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সব ভাষারই কিছু কিছু অংশ ধারণ করে স্বতন্ত্র লিপির প্রচলন করেন। যাতে যেকোনো অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে বাধা প্রাপ্ত না হয়। এ ফিনিশীয় জাতির সাংকেতিক চিহ্নগুলো সব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের বাহন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এ জাতি এ স্বতন্ত্র লিপিতেই প্রথম বর্ণভিত্তিক লিপির উদ্ভাবন ঘটায়।

খ্রিষ্টপূর্ব আঠারো শতকের 'আব্দো' শিলালিপিতে এ বর্ণমালার আদিরূপ পরিলক্ষিত হয়। ফিনিশীয়রা অল্পসংখ্যক চিহ্নরাশির সাহায্যে বহু সংখ্যক জিনিসের হিসাব রাখার জন্য কিউনিফর্ম ও হায়ারোগ্লিফিক লিপির ভিত্তিতে ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণের এক বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, এতে একটিও স্বরবর্ণ ছিল না। এ বর্ণমালা আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী সময়ে চিত্রলিপির সর্বত্র ব্যবহার কমে যায়। বর্ণমালার এক একটি অক্ষর মানুষের কণ্ঠ দিয়ে উচ্চারিত একেকটি ধ্বনির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। অনেকে অনুমান করেন, খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের দিকে ফিনিশীয়রা ব্যবসার কারণে তাদের এ বর্ণমালা প্রাচীন গ্রিস ও ভারতীয় সিন্ধু সভ্যতায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতীয় সভ্যতায় স্বতন্ত্র লেখার রীতি তার পূর্ব থেকেই প্রচলন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক হ্যান্সজেনসেন তার 'সাইন, সিম্বল অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট' গ্রন্থে পৃথিবীর প্রাচীনতম বর্ণলিপিকে ১২টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। অধ্যাপক হ্যান্সজেনসেন প্রাচীন অঞ্চল ভেদে এ লিপির বিন্যস্ত করেছেন। তারা সাতটি লিপিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সেগুলো হলো—সুমেরীয় লিপি, মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপি, ক্রিট দ্বীপবাসীর লিপি, হিত্তি লিপি, চীনা লিপি, এলামবাসীর লিপি ও সিন্ধুলিপি।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে ওঠেছিল সিন্ধু সভ্যতা। দক্ষিণ ভারতে, কাশ্মীরে এবং বাংলা ও আসাম অঞ্চলে প্রাচীন

নব্যপ্রস্তর যুগের কৃষি সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভারতের এ সিন্ধু সভ্যতায় স্বতন্ত্র লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রত্নস্থান হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত লিপিতে তার প্রমাণ মেলে। সিন্ধু সভ্যতার দুটি নগর ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি। সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলের আয়তন বিশাল। হিমালয়ের পাদদেশে সিন্ধু অববাহিকায় প্রায় ৯৫০ মাইল জুড়ে উত্তর থেকে আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত ছিল এই অঞ্চল। এই অঞ্চলের আয়তন প্রাচীন মিসরের পুরাতন রাজবংশের সাম্রাজ্যের দ্বিগুণ এবং সুমেরু ও আক্কাদের প্রায় চার গুণ। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর দূরত্ব ছিল ৩৫০ মাইল। এতেই বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতায় বহু নগর গড়ে উঠেছিল যা এখনো আবিষ্কারের অপেক্ষায়। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলে শুরু হয়েছিল বৈদিক সভ্যতার। বৈদিক যুগে বেদ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, সূত্র ইত্যাদির চর্চা লক্ষ করা যায়। বৈদিক যুগের পরবর্তী পর্যায়ে পৌরাণিক সভ্যতায় রামায়ণ, মহাভারতের চর্চা হতে দেখা যায়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা অঞ্চলে এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু লারকানা জেলার মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনের উদ্ধার করেন। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনাবলিতে বেশ কিছু সিল (Seal) পাওয়া যায়। তাতে প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার মতো সিন্ধু সভ্যতায়ও লিখন পদ্ধতি ছিল। মূলত এ লিখন পদ্ধতিই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার লিখন পদ্ধতি।

প্রাচীন ভারতের জনপ্রিয় লিখন পদ্ধতি ছিল–ব্রাহ্মী লিপি ও অন্যটি খরেষ্ঠী লিপি। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনেও তারই প্রমাণকে সুদৃঢ় করে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক ম্যাক্সমুলার মনে করেন—বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের সাহিত্যগুলো ছিল শ্রুতিনির্ভর। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শাল বলেন ‘মাটির ফলক বা সিলমোহরের বাইরে সিন্ধুলিপির ব্যবহারের বিশেষ নিদর্শনে পাওয়া না গেলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভূর্জপত্র, তালপাতা, চামড়া, কাঠ বা কাপড়ে সিন্ধুলিপি লিখিত হয়েছিল। কিন্তু সে উপকরণগুলো অপেক্ষাকৃত কম টেকসই হওয়ায় তা কালের অতলে হারিয়ে গেছে।’ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত কিছু নিদর্শন এখনো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সিন্ধু সভ্যতায় ২৫০০টি সিলমোহরে চিত্রধর্মী লিপি পাওয়া গেছে। অনেক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন শুধু মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা নয় ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক স্থানেই এখনো

অনুসন্ধান চালালে সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন তথ্য উদ্ধার হবে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রী এস আর রাও এই লিপির কিছুটা পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। তার পাঠোদ্ধার আবার অনেকটা অনুমাননির্ভর বলা যেতে পারে। তিনি ৩৬০টি শব্দের মধ্যে ৩০টি শব্দের পাঠোদ্ধার করে দেখিয়েছেন, এ সভ্যতার অভিবাসীগণের একটা বড় অংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং অপর অংশ ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর। সিন্ধু সভ্যতায় চিত্রলিপি ছিল এবং এ চিত্রলিপি থেকে ভাবলিপি; পরবর্তী সময়ে বর্ণলিপির উদ্ভব ঘটেছে। যাহোক, সিন্ধু সভ্যতায় প্রথমদিকে লেখার জন্য ৩৬০টি চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। পরবর্তী সময়ে এগুলোর বিলুপ্ত হতে থাকে। বহুজাতি মিশ্রণের ফলে এ চিহ্নগুলো কমে বর্ণলিপিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। সিন্ধু সভ্যতার শেষ সময়ে (হরপ্পার অন্তিম যুগে) চিহ্নের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল ২০টিতে। তবে এ ২০টি চিহ্নের সঙ্গে ১৪টিতেই প্রাচীন ক্যানানীয় অথবা প্যালেস্টাইনীয় এবং ফিনিশীয় চিহ্নের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

ভারতীয় সভ্যতা বিকাশের ধারায় নগর হিসেবে একসময় প্রধান হয়ে ওঠে—তক্ষশীলা, পাঞ্চালা, কোশল, কাশি, পুলিন্দ, বিদর্ভ, মুতাবি, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, দণ্ডক প্রভৃতি। সে সময় ভারত বর্ষের লিখন ধারা নানা নামে পরিচিত থাকলেও দুটো রীতিই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল—ব্রাহ্মী ও খরেষ্ঠী। অঞ্চলভেদে তার নানারূপে বিকাশ ঘটেছিল। সংস্কৃত ভাসের নাটকগুলো পাওয়া গেছে মালোলিয়াম লিপিতে। একই গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন লিপিতে লেখা হতো।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে 'চর্যাপদ' পুঁথিটি আবিষ্কার করে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ে ১৯২৬ ODBL-এ প্রমাণ করেন, এ চর্যাগীতির ভাষা বাংলা। নেপালের রাজদরবারে রয়েল পাঠাগারে প্রাপ্ত এ পাণ্ডুলিপি নেওয়ারী লিপিতে লেখা। ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত 'ললিতবিস্তর' নামক বুদ্ধচরিতে গ্রন্থে ৬৪টি লিপির নাম দৃষ্ট হয়—ব্রাহ্মী লিপি, খরোষ্ঠী, পুষ্করসারী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধ লিপি, মঙ্গোল্য লিপি, মনুষ্য লিপি, অঙ্গুলী লিপি, শকারী লিপি, ব্রহ্মাবল্লী লিপি, দ্রাবিড় লিপি, কিনারী লিপি, দক্ষিণ লিপি, উগ্র লিপি, সংখ্যা লিপি, অনুলোম লিপি, অর্ধ ধনু লিপি, দরদ লিপি, খাস্য লিপি, চীন লিপি, হুন লিপি, মধ্যক্ষর লিপি, পুষ্প লিপি, দেব লিপি, নাগ লিপি, যক্ষ্মা

লিপি, গন্ধর্ব্ব লিপি, কিন্নর লিপি, মহোরগ লিপি, অসুর লিপি, গরুড় লিপি, মৃগচক্র লিপি, চক্র লিপি, বায়ুমুখ লিপি, ভৌমদেব লিপি, অন্তরীক্ষদেব লিপি, উত্তর কুরুদ্বীপ লিপি, অপরগৌড়াদি লিপি, পূর্বাধদেহ লিপি, উৎক্ষেপ লিপি, নিক্ষেপ লিপি, বিক্ষেপ লিপি, প্রক্ষেপ লিপি, সাগর লিপি, বজ্র লিপি, লেখপ্রতিলেখ লিপি, অনুদ্রুত লিপি, গণনাবর্ত লিপি, উৎক্ষপাবর্ত লিপি, অধ্যাহারিণী লিপি, সর্ব্বরুত সংগ্রহণী লিপি, বিদ্যানুলোম লিপি, বিমিশ্রিত লিপি, ঋষীতপস্তপ্তা লিপি, রোচমনা লিপি, ধরণী প্রেক্ষণ লিপি, নিক্ষেপাবর্ত লিপি, সর্ব্বৌষধি নিঃষ্যন্দা লিপি, সর্ব্বসার সংগ্রণী লিপি, গগনপ্রেক্ষণী লিপি, সর্ব্বভূতরুত সংগ্রহণী লিপি, পাদলিখিত লিপি।

জৈনদের 'নন্দীসুত্ত' গ্রন্থে ৩৬ প্রকারের লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়—হংস লিপি, ভূত লিপি, যক্ষ লিপি, রাক্ষসী লিপি, যাবনী লিপি, তুরস্কী লিপি, কীরী লিপি, দ্রাবিড় লিপি, সৈন্ধবী লিপি, মালবী লিপি, নাড় লিপি, নাগরী লিপি, পারসী লিপি, লাটি লিপি, চানক্কী লিপি, অনিমিত্র লিপি, মৌলদেবী লিপি, ল্যাটি লিপি, চৌড়ী লিপি, ডাহলী লিপি, কানড়ী লিপি, গুজরী লিপি, সৌরট্টি লিপি, মরহঠী লিপি, কোক্কনী লিপি, খোড়সানী লিপি, মাগধী লিপি, সৈংহলী লিপি, হাড়ী লিপি, হাম্বিরী লিপি, পরতিরি লিপি, মসী লিপি, মহাযোগী লিপি ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দাবি করতেন ভারতীয় লিপি ইউরোপীয় গ্রিক কিংবা ফিনিশীয় লিপির দান। তার মধ্যে ম্যাক্সমুলার, উইলিয়াম জোনস, সেবিয় অন্যতম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়—আবিষ্কৃত সিন্ধুলিপি ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব সম্পদ। কারো অনুকরণ নয়। অনেকে মনে করেন, সিন্ধুলিপি থেকে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব এবং ভারতীয় লিপিসমূহের বিস্তার। ব্রাহ্মী লিপির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় পিপ্রাবা ও বলী নাম দুটি অভিলেখে, যা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে উৎকীর্ণ। শতকে সম্রাট অশোকের সময়কালে ভারতীয় উপমহাদের পশ্চিমাংশ ছাড়া সর্বত্র ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল। অনেকে এই লিপিকে 'পালি লিপি' বা 'ভারতীয় পালি লিপি', 'অশোক লিপি' বলে থাকেন। জানা যায়, তক্ষশীলায় খরেষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত অশোকের শিলালিপিটি খরেষ্ঠী লিপিতে।

পৃথিবীতে লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি আছে। অনেকের মতে, দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত বলেই এ লিপির নাম ব্রাহ্মী লিপি। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ব্রাহ্মণদের লিপি বলে কিংবা ব্রহ্মা দিয়েছেন বলে এর নাম 'ব্রাহ্মী লিপি'। আবার অনেকে মনে করেন, বাম দিক থেকে ডান দিকে

লেখা হতো বলে এর নাম 'ব্রাহ্মী লিপি'। রোমানদের বিশ্বাস, তাদের লিপি দেবতা 'মার্কারি'র কাছ থেকে তাদের ব্যবহৃত রোমান লিপি প্রাপ্ত। গ্রিকদের মতে, ক্যাডমাস নামক প্রাচ্য দেশীয় এক দেবতা য়ুরূপা নাম্নি রমণীর সন্ধানে গ্রিসে আগমন করেন এবং তিনিই সাথে নিয়ে আসেন বর্ণমালা। মিসরীয়গণ মনে করেন, তাদের লিপির আবির্ভাব ঘটেছে তাদের লিপি দেবতা 'থথ'-এর দানে। অনুরূপভাবে ব্যাবিলনীয়রা বিশ্বাস করে, দেবতা 'নেবো' এর কাছ থেকে তাদের বর্ণমালা প্রাপ্ত। চীনাদের মতে, তাদের লিপি 'সাংচিয়েন' নামক চার চক্ষুবিশিষ্ট ড্রাগনমুখী দেবতার প্রদত্ত।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ব্রাহ্মী লিপি হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের নিজস্ব সম্পদ। অশোকের অনুশাসনের অনেক পূর্ব থেকেই ভারতীয় সভ্যতায় ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল। সম্রাট অশোকের সময় প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তিত রূপ কুটিল লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। মহোমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৭ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 'বাংলার পুরাণ অক্ষর' প্রবন্ধে লিপি বিবর্তনের ছক তুলে ধরে দেখান কালক্রমে কীভাবে ব্রাহ্মী লিপি থেকে পরবর্তীকালে বাংলা লিপির আকার লাভ করল, তাতে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া আছে। তার ছকটির মাধ্যমে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মী লিপি চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে পঞ্চম স্তরে বাংলা অক্ষরে পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তনের ইতিহাসে পরবর্তী দুটি প্রধান স্তরের নাম কুষাণ লিপি (১০০-৩০০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং গুপ্ত লিপি (খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতক)।

মৌর্যোত্তর কালে সম্ভবত মধ্য এশিয়া থেকে ইউচি নামে এক জাতির লোক ভারতবর্ষে এসে আস্তানা ফেলে। এই জাতি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে এই পাঁচ শাখার মধ্যে এক অনুন্নত যাযাবর শাখা মাথা তুলে এশিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত সাম্রাজ্য গড়ে তুলে। এরাই কুষাণ জাতি নামে ইতিহাসে খ্যাত। এ কুষাণ জাতির ব্যবহৃত লিপিই কুষাণ লিপি। খ্রিষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত কুষাণ রাজাদের আমলে কুষাণ লিপি প্রচলিত ছিল। কুষাণ রাজাদের নামানুসারে ব্রাহ্মী লিপি বিবর্তিত হয়ে কুষাণ লিপিতে রূপ নেয়। কুজুল কদফিস (Kadphises) নামে এক দলপতি বাকি চার শাখাকে পরাজিত করে নিজেকে ওয়াং বা রাজা বলে ঘোষণা দেন। এই কুজুল কদফিস (Kadphises) বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধের বাণী চারদিকে ছড়িয়ে দেন। এ কুষাণ জাতি প্রচারিত ও প্রচলিত মুদ্রা ও লেখা নাম

দেন 'কুষাণ মুদ্রা' এবং 'কুষাণ লিপি'। এ লিপিতে 'ক', 'চ', 'ঝ', 'ড', 'দ' ন', 'প', 'য' বর্ণের সংক্ষিপ্ত মাত্রার ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে কুটিল লিপি কোনো রাজবংশের প্রভাব ছাড়াই ষষ্ঠ থেকে নবম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এ লিপির অক্ষর ও স্বরের মাত্রা অনেকটা কুটিলাকৃতির বলে নামকরণ কুটিল লিপি হিসেবে অনেকে উল্লেখ করতে চান।

বুদ্ধচরিত গ্রন্থ 'ললিতবিস্তর'এ 'বঙ্গলিপি' নামে স্বতন্ত্র লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ 'বঙ্গলিপি'ই সম্ভবত বাংলাদেশ অঞ্চলের নিজস্ব লিপি। যেখান থেকেই বাংলা লিপির বিকাশ হয়ে থাকতে পারে। যা হোক, দশম শতকে বিনায়ক পালের তাম্রফলকে প্রথম বাংলা লিপি দেখা যায়। তবে সে বাংলা লিপির বর্ণগুলো আজকের দিনের মতো পরিপক্ব নয়। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দশম শতকের শেষভাগে মূল বাংলা বর্ণমালায় পরিণত হয়। ড. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অচিন্ত্য বিশ্বাস, দীনেশচন্দ্র সেনের প্রবন্ধের ভাষ্য অনুসারে বাংলা বর্ণমালার জন্মক্রম প্রসঙ্গে একটি ছক তৈরি করা যায় এভাবে—অষ্টম শতাব্দী : ধর্মপালের 'খালিশপুর' তাম্রশাসন, নবম শতাব্দী : নারায়ণ পালের 'বাদাল' স্তম্ভলিপি, দশম শতাব্দী : প্রথম মহীপালের 'বাণগড়' তাম্রশাসন, একাদশ শতাব্দী : তৃতীয় বিগ্রহপালের 'আমগাছি' তাম্রশাসন, দ্বাদশ শতাব্দী : বিজয় সেনের 'দেওয়াপাড়া' শিলালিপি।

অনেকে মনে করেন, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে পূর্বাঞ্চলীয় কুটিল লিপির বিবর্তন হতে হতে দশম শতকে এসে পূর্ণাঙ্গ বাংলা বর্ণের আকারে রূপান্তরিত হয়। বাংলা বর্ণমালার সার্থক প্রয়োগ বা নির্দেশন দেখা যায় প্রথম মহীপালের (৯৮০-১০৩৬ খ্রি.) বাণগড় দানপত্রে এবং কম্বোজের রাজা নয়পাল দেবের (১০৩৬-১০৫৩ খ্রি.) ইর্দার দানপত্রে। বিজয় সেনের (১০৯৮-১১৬০ খ্রি.) দেওপাড়ার খোদিত লিপিতে এই মূল বাংলা বর্ণমালার আরো উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চদশ শতকের বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বাংলা লিপির পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। এ সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ১৫-১৬ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকে পূর্ণ বাংলা লিপিতে লেখা বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের লিপিকর ছিলেন কৃষ্ণপঞ্চানন। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামে বৈষ্ণব মহান্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশজাত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধিত পুঁথিটি গোয়ালঘর থেকে অযত্নে রক্ষিত অবস্থায়

আবিষ্কার করেন। অনুমান করা হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা লিপি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই প্রথম সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

চতুর্দশ-ষোড়শ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রভূমি ছিল গৌড়-বঙ্গ। সে সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদ জন্ম নেয়। রাজদরবারের প্রধান ভাষা হয়ে ওঠে বাংলা। সে সময় বাংলা সাহিত্যচর্চা সামাজিক স্তরেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘরে সংরক্ষিত নিদর্শনে দেখা যায়, সে সময় এ অঞ্চলে বাংলা লিপির চর্চা হয়েছে। বাংলা লিপিতে সংস্কৃত ভাষাও লেখা হয়েছে।

মুসলিম শাসক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহম্মদ সগীর অনুবাদ করেন ইউসুফ-জোলেখা, জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস অনুবাদ করেন 'রামায়ণ', রুকনউদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় জৈনুদ্দিন রচনা করেন 'রসুলবিজয়', আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারার বিকাশ ঘটতে থাকে। আরাকান কেন্দ্রিক দৌলত উজির বাহরাম খান 'লাইলী-মজনু', দৌলত কাজীর 'সতী ময়না-লোরচন্দ্রানী,' আলাওলের 'পদ্মাবতী', 'সপ্তপয়কর', কোরেশী মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী' উল্লেখ্যযোগ্য। এ সময় প্রায় সর্বত্র বাংলা লিপির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ষোড়শ শতকের দিকে বাংলায় পালা-কীর্তনসহ প্রভৃতির প্রাধান্য দেখা যায়।

নবম খ্রিষ্টাব্দের দিকে চীনে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হয়। তবে তা আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের মতো ছিল না। একধরনের অক্ষর তৈরি করত পাতকে দীর্ঘক্ষণ গরম করে কোনো বস্তুর ওপর ছেঁকা দিয়ে ছাঁচ তৈরি করে। পরে তাতে রং লাগিয়ে চেপে ধরে ছাপাত। চীনের এ প্রাক-মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় পোড়ামাটির ফলক, ভেলাম, পাথর, ভূর্জপত্র, ধাতুর পাত ইত্যাদির ব্যবহার হতো। কিন্তু ছাপার এ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছিল জার্মানে। অনুমান করা হয়, ১৪৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীর মেঞ্জ শহরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন জোহান গুটেনবার্গ, জোয়ান ফাস্ট নামক এক ধনী স্বর্ণকারের কাছে থেকে অর্থ ঋণ করে ল্যাটিন ভাষায় ভালগেট বাইবেল নামে একটি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। এটিই ছিল ১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।' ভারতীতে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র আমদানি করেছিল পর্তুগিজরা। পর্তুগিজরা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে জেবিয়াতে বসতি

স্থাপন করার পর সেখানে দুটি ছাপাখানাও স্থাপন করেন। গোয়ায় মুদ্রিত প্রথম বইটি পর্তুগিজ ভাষায় রচিত যার নাম 'কনুকসোজ'। ১৮০০ সালে ইংরেজরা যখন আগ্রা দখল করে তখন সেখানে একটি মুদ্রণযন্ত্র পাওয়া যায়। তা থেকে অনুমান করা হয় মুঘল রাজ্য চালনার সঙ্গে ছাপাখানা জড়িত ছিল। আর ভারতীয় রাজ-রাজড়াদের মুদ্রাগুলোও ছিল পাঞ্চ খোদাই বা ছাপা। মেজল ইয়নু নামে জনৈক ইংরেজ সেনাধক্ষ্যের বিবরণীতে জানা যায়, মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম এই ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনাধীন হলে পাশ্চাত্য থেকে সিভিলিয়ানরা এদেশ শাসন করার জন্য আসে। কিন্তু ভাষাগত কারণে শাসন কর্তৃত্ব পর্যুদস্ত না হওয়ায় সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। এ সূত্র ধরেই ব্রাসি ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড রচনা করেন A Grammar of the Bengal Language. এ রচনার বাংলা অংশ ছাপানোর জন্য তার বন্ধু সিভিলিয়ান ও প্রাচ্য তত্ত্ববিদ চার্লস উইকিন্সকে দায়িত্ব দেন বাংলা টাইপ তৈরি করার জন্য। চার্লস উইকিন্স বাংলা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির বর্ণকে অনুসরণ করে বাংলা অক্ষরের নকশা ও তাতে প্রথম পাঞ্চ খোদাই করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণের স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিকেই প্রধান রূপে অবলম্বন করেন। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে লিসবন শহর থেকে প্রকাশিত হয় হ্যালহেডের A Grammar of the Bengal Language. এতেই প্রথম বাংলা বর্ণ ছাপার অক্ষরে বের হয়। তারপর ধীরে ধীরে ভারতীয় উপমহাদেশে বিকাশ ঘটতে থাকে মুদ্রণশিল্পের। পরে শ্রীরামপুর মিশনারি কর্তৃক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলে জাত লিপিকর পঞ্চানন কর্মকার বাংলা অক্ষরকে বিন্যাস ও মুদ্রণ উপযোগী করেন। উইলিয়াম কেরির তত্ত্বাবধানে এ ছাপাখানার মূল লক্ষ্য ছিল যিশুর প্রচারিত বাণীকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, এ পঞ্চানন কর্মকারের পরিবারের মধ্যেই বাংলা হরফ তৈরি তথা ছাপাখানার কাজে প্রায় ৭০ বছর প্রাধান্য ছিল। বংশানুক্রমে পঞ্চাননের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার এবং তার পুত্র রামচন্দ্র কর্মকার বাংলা ছাপাশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটান। ছাপার প্রথম দিকে স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হতো ১৬টি। মদনমোহনের শিশুশিক্ষা বইতে স্বরবর্ণ ১৬টিই ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো হলো—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ. অং, অঃ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষাদানের লক্ষ্যে 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থের মাধ্যমে আজকের বর্ণমালা সন্নিবিষ্ট করেন। বিদ্যাসাগর স্বরবর্ণ কমিয়ে নিয়ে আসেন ১২টিতে। আর ব্যঞ্জন বর্ণে

নতুন কয়েকটি বর্ণ যোগ করেন। অনুস্বর ও বিসর্গকে সর্বত্র স্বরবর্ণ ধরা হলেও বিদ্যাসাগর এ দুটো বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে সন্নিবেশিত করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরীসহ অনেকেই বাংলা বর্ণমালা নিয়ে নানা নিরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অ্যা' যেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, তেমনি '৯', 'অং', 'অঃ'সহ নানা বর্ণ বাদও গেছে। এভাবে নানা নিরীক্ষা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এ সময়ে আমরা ১১টি স্বরধ্বনি ও ৩৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে গঠিত বর্ণবিন্যাসে বাংলা ভাষাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি। আধুনিক মুদ্রণপ্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর সমস্ত লেখ্য শিল্পের শুরু হয় নব পথচলা। প্রাচীন হাতে লিখিত পাণ্ডুলিপি বদলে সর্বত্র বাহন হয়ে ওঠে ছাপার অক্ষর। ফলে বর্ণ একটি নির্দিষ্ট অক্ষয় মাত্রা ধারণ করে।

মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহারের ফলে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় বাংলা লিপির বিবর্তন। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে বাংলা লিপির প্রকৃতরূপ অপরিবর্তিত রেখে ক্রমাগত বিভিন্ন প্রকার শৈল্পিক রূপ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলা বর্ণ অভিন্ন রেখে শৈল্পিকতার দিক থেকে হয়েছে ভিন্ন এবং গঠন হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন লিপিসুষমা। বর্তমানে সুতন্বনি, সেহরী, বিজয়, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, অভ্র প্রভৃতি নামে শৈল্পিক বর্ণধারা তৈরি হচ্ছে। মুদ্রণযন্ত্র ক্রমশ আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে। কিছুদিন আগেও জনপ্রিয় মুদ্রণযন্ত্রগুলো ছিল—কর্ড, হাইডেলবার্গ ইত্যাদি। বর্তমানে ডিজিটাল প্রিন্টিং মুদ্রণ কাজের প্লেট মেকিং, প্রসেসিং ও অফসেট মুদ্রণের ঝামেলা দূর করে দিয়েছে। ইন্টারনেটও বাংলা ভাষা ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করেছে। এখন মানুষ মুখে কথা বলেও সঙ্গে সঙ্গে তা ছাপার অক্ষরে বের করা সম্ভব। প্রযুক্তিগত দিক যত উন্নত হচ্ছে। বাংলা লিপির মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে শৈল্পিক বিকাশের দিকেই ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে।

গ্রন্থাবলি

১. পৃথিবীর ইতিহাস, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/রমাকৃষ্ণ মৈত্র
২. ভাষা বিজ্ঞানের ইতিহাস, অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল হক
৩. লিপির উদ্ভব, ক্রমবিবর্তন ও বাংলা লিপির পরিণত পর্যায়, আবু সাঈদ তুল্লু
৪. বর্ণমালার উদ্ভববিকাশ ও লিপিসভ্যতার ইতিবৃত্ত, দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা
৫. বিশ্ব সভ্যতা, এ কে এম শাহনাওয়াজ
৬. মানুষের ইতিহাস, আবদুল হালিম/নূরুন নাহার বেগম
৭. পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা, মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম
৮. প্রাচীন পৃথিবী, এ কে এম শাহনাওয়াজ
৯. ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) প্রথম খণ্ড, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১০. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম-৭ম খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১১. বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, সিডি ভারসন
১২. বাংলা পুথির কথা, অচিন্ত্য বিশ্বাস

[প্রবন্ধটি 'সাহিত্য বার্তা' ওয়েবজিনে প্রকাশিত। সম্পাদক : আরিফুল ইসলাম]

প্রযুক্তির যুগে সাহিত্যচর্চা

বর্তমান সাহিত্যবিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন 'চ্যাট জিপিটির যুগে আদৌ কি সাহিত্যের প্রয়োজন আছে?' কল্পনা-মনন-সৃজনশীলতা বিকাশমুখী চর্চায় সাহিত্য যে ভূমিকা রাখত সে তো জিপিটিই করে দিচ্ছে। সাহিত্যের মৌল যে উদ্দেশ্য বোধ-বিকাশ, অনুভূতি-সৃজনশীলতা, আত্মনির্মাণ ও জীবনাভিজ্ঞতার বিনিময় তা তো সংকোচিত হয়ে পড়ছে। তাই বর্তমান প্রযুক্তির বিপ্লবে চ্যাট জিপিটি বহমান সাহিত্য ধারার জন্য অনেকটা হুমকির মতোই হয়ে উঠেছে। চ্যাট জিপিটি (Chat Generative Pretrend Transformer) মূলত ওপেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা তৈরি এক ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। যা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা খুব দ্রুত গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ লিখে দিতে সক্ষম। উচ্চমানের টেকস্ট যেমন তৈরি করে তেমনি প্রশ্নকারীর যেকোনো ভাষার কথা সহজে বুঝে দ্রুত তার তথ্য জোগান দিতে পারে। গবেষণাপত্র তৈরি, নিবন্ধ রচনা, সাহিত্য পর্যালোচনাসহ নানা কাজ করতে পারে। এমনকি প্ল্যাজারিজমও ধরতে পারে, পারে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ করতে। অতএব প্রশ্ন জাগে সৃজনশীল সাহিত্যিকের কী প্রয়োজন আছে তাহলে? কিংবা যে উদ্দেশ্যে সাহিত্য পাঠ করব সে পাঠের কী প্রয়োজন আছে? বিশেষ করে জাপানি লেখিকা রি কুদান চ্যাট জিপিটির সহায়তায় লেখা গ্রন্থ 'দ্য টোকিও টাওয়ার অব সিম্প্যাথি' যখন জাপানের সবচেয়ে সম্মানজনক 'আকুতাগাওয়া সাহিত্য পুরস্কার' অর্জন করেছে। এ থেকেই বিশ্বে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

মানবমনের অভিব্যক্তি সাহিত্য। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগের প্রথম মাধ্যমই ছিল ভাষা-সাহিত্য। সাহিত্য জীবনকে যেমন চেনায় তেমনি সাহিত্য জীবনকে জাগায়। 'সাহিত্য' শব্দের মূল হচ্ছে—সহিত+য। যার অর্থে নিহিত আছে সহিত। এক মনের সঙ্গে অন্য মনের সম্পর্ক। অর্থাৎ সাহিত্যিকের অনুভূতির যখন আরেকজনের হৃদয়ের সাথে সহিত বা মিলে যায় কিংবা পাঠক যখন লেখাটিকে নিজের অনুভব বলেই বিবেচনা করেন তখনই তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন বাংলায় এ সুকুমারী শিল্পধারাকে বলা হতো কাব্য। ঊনবিংশ শতকে 'সাহিত্য' শব্দটি ইংরেজি 'লিটারেচার' শব্দের পরিভাষা হিসেবে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। ইংরেজি লিটারেচারকে বলা হতো আর্ট অব রাইটিং। একজন সংবেদনশীল মানুষ যখন জীবন জগৎ প্রকৃতি বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করে নিজের অনুভব-অনুভূতিকে ভাষার শিল্পে প্রকাশ করেন তখনই তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে। শীশচন্দ্র দাশের ভাষায়—'নিজের কথা, বাহ্য জগতের কথা যখন সাহিত্যিকের মনোবীণায় ঝংকৃত হয় তার শিল্পসঙ্গত প্রকাশ সাহিত্য।'

শৈল্পিক অভিব্যক্তিগুলো সাহিত্য হিসেবে পদবাচ্য হলেও তার সঙ্গে নীতি-নৈতিকতার সমর্থন এবং প্রকাশে উঁচুতর ভাষা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। যা সমাজের জন্য মহৎ ও কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারে। ছড়া, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এগুলো প্রকাশের আঙ্গিক মাত্র। এ আঙ্গিককের উপর সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তি নির্ভর করে না। হাজার বছরের বাংলায় সাহিত্য ছিল অভেদাত্মক। গল্প-কবিতা-উপন্যাসের আলাদা বিভাজন ছিল না। সাহিত্যিক যেমন সাহিত্যে জীবন-জগৎকে কল্পনার তুলিতে ভাষার বন্ধনে জীবন্ত করে করে তুলেন, তেমনি পাঠকও ভাষাবিন্যাসের মাঝে খুঁজে নেয় আনন্দ, শিক্ষা ও জীবনের উপলব্ধি। সাহিত্য সামাজিক অবয়বের একটি রূপ।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তার শিক্ষাব্যবস্থায় সাহিত্যকে উপকরণ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ সাহিত্যপাঠ ভাষা, সৃজনশীলতা ও মানবিকতাবোধের বিকাশ ঘটায়। তবে তার আদর্শ রাষ্ট্র কনসেপ্টে অসৎ বা অতিকল্পনাপ্রবণ সাহিত্যিকদের থাকতে দিতে চাননি। কারণ সাহিত্য যেমন সত্যের মায়া তৈরি করতে পারে তেমনি মিথ্যাকেও সত্যের বিভ্রমে উপস্থাপন করতে পারে। সাহিত্যের মূল উৎস মানবজীবন। সমাজ-প্রকৃতি আসে পরে। আর সাহিত্যে থাকে জীবনাভিজ্ঞতা। একজন সাহিত্যিক সারা জীবন ধরে যে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছেন তাই গল্প কবিতা কিংবা প্রবন্ধ

স্মৃতিকথার সুরে লিখে রাখেন পাতায় পাতায়। সে অভিজ্ঞতাই মানুষ পাঠ করে। সে পাঠের মধ্য দিয়ে মানুষ নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় আন্দোলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষায় রচিত সেই চিত্র এবং গানই সাহিত্য।'

সাহিত্যিক-শিল্পীর থাকে অন্তঃপ্রেরণা। ঈশ্বরপ্রেরিত আদেশের মতো। আর তার প্রেরণাসঞ্জাত ভাবনাবীজ কল্পনা ও ইনটুইশনে ফলবান হয়ে ওঠে। ভাষিক নানা অলংকরণে বর্ণ-শব্দ-ছন্দ-বাক্য-ভাষায় প্রকাশ লাভ করে। কখনো কখনো একজন সাহিত্যিক নিজের স্বাধীনতা সৃষ্টির চেয়ে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা তৈরি করতেই ব্যাপ্ত থাকেন। নিজের জীবন বিপন্ন হলেও অপরের কল্যাণকেই বড় করে দেখেন। মানুষের জন্য, মানুষের আনন্দের পথে, বৌদ্ধিক বিকাশের পথেই সাহিত্যিক ক্রমশ অগ্রসর হয়। বিখ্যাত লেখক শোলোকভ তার নোবেল ভাষণে বলেন—শিল্পী-সাহিত্যিকের কাজ পাঠকদের কাছে সততা রেখে কথা বলা, মানুষকে সত্য কথা বলা, কখনো কখনো কঠোরভাবে, কিন্তু সর্বদা স্পষ্ট করে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা জোরদার করা এবং মানুষকে ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষমতায় বিশ্বাসী করে তোলা।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাতেও সাহিত্য ছিল প্রধান অঙ্গ। আত্মবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার শিক্ষা দর্শনে কাব্যপাঠ অত্যন্ত প্রতুজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। তা ছাড়াও ভারতের প্রাচীন প্রতিটি জ্ঞানবিদ্যা ছিল কাব্যাকারে। শুধু ভারত নয় সমকালীন বিশ্বে নানা শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম উপকরণ সাহিত্য। সাহিত্য মানুষের মন বা আত্মাকে বিকশিত করে। সমাজ-জীবনকে দেখার চিন্তন দক্ষতা বাড়ায়। ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলে। ব্যক্তিগত কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করে। নিজের শব্দভাণ্ডারকে সম্পৃদ্ধ করে। ভালো লেখার দক্ষতা তৈরি করে। সমাজে যোগাযোগের ক্ষমতা বাড়ায়। সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয়। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা তৈরি করে। সাহিত্য আমাদের আনন্দ দেয়। প্রকৃত অর্থে সাহিত্যের চেয়ে ভালো শিক্ষা কেউ আমাদের দিতে পারে না।

অ্যারিস্টটল মনে করতেন মানুষের সহজাত প্রবণতা অন্যের অনুকরণ করা। সাহিত্য তাই করে। সমাজ-মানুষ-জীবন ও সভ্যতার বিষয়কে অনুকরণ করে। তাই সমাজকেই অন্যের সামনে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অ্যারিস্টটল ভালো-মন্দ দুই ধরনের চরিত্রের

সন্নিবেশই সাহিত্য রচনায় শিশুকে সঠিক পথ দেখাতে পারে বলে মত পোষণ করতেন। কারণ এর মধ্য দিয়ে একটি শিশু সমাজের নানা রূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। অ্যারিস্টটল মনে করেন, যা ঘটছে ইতিহাস তার বর্ণনা দেয় কিন্তু যা ঘটতে পারত সাহিত্য তার বর্ণনা দেয়। ফলে মানুষের সৃজন বিকাশে সাহিত্য পাঠকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। গ্রিক সামাজ্যের পতনের পর রোম সভ্যতার বিকাশের সময় লুঙিনুস সাহিত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সাবলিমিটি অর্থাৎ মানুষের চেতনার উঁচুতর অবস্থা সৃষ্টিকে গুরুত্ব দিতেন। হোরেসও মানুষের আত্মিক বিকাশ ও ভাষার সমুন্নতির জন্য সাহিত্যকেই অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানবিক জীবনটা কোনখানে? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গলে গিয়ে, মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে।

পৃথিবীর প্রথম কবিতা কবির বেদনাদগ্ধ হৃদয়ের আর্তস্বর। শোকের মাতম হৃদয়ের আন্তর্গত অভিব্যক্তির বিমূর্ত রূপ। সৃষ্টিশীল বেদনা সৃজনের আকুতিতে রক্ত ঘাম শ্রম ও স্বপ্নে একাকার হয়ে ওঠে। কবি বাল্মীকির বিখ্যাত সেই উক্তি—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগত শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতুম।' তখন আমরা টের পাই এক বেদনাঘন হৃদয়ের উপলব্ধি। তখনই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই তো কাব্য; এই তো সাহিত্য। তবে কী কবিতার মূলে থাকে প্রাণসংকটপূর্ণ মানবিকতা। তাইতো গিলগামেসে শুনতে পাই জীবনের অবিনশ্বর সত্য। কিংবা স্যাফোর বাণীগুলো আবেগের দোলাচলে হৃদয়ের তন্ত্রীতে আঘাত হানে বারবার।

ইমানুয়েল কান্ট সাহিত্যকে বিনোদনের উপকরণ মনে করতেন। যদিও তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টিকে বড় মনে করে দেখতেন। তিনি মনে করতেন সাহিত্য-শিল্প হলো মানুষের পরমভাব প্রকাশের প্রথম ধাপ। দার্শনিক হেগেল অবশ্য বিশুদ্ধ ধারণা, ধর্মকে কল্পনা এবং শিল্পকে অনুভবের বিষয় বলে মনে করতেন। অনুভবই তার সত্য। মনের বিকাশের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া হতে পারে সাহিত্যে। মার্কসবাদ সাহিত্যকে সমাজ চেতনার একটি রূপ হিসেবেই বিবেচনা করে। যে সমাজ অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টল সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও সমাজের অগ্রগতি সাধনের ধারণাকে বড় করে তোলেন। তিনি শিল্পকে আনন্দের উপকরণ ও মানবজীবনের যেকোনো অবস্থা চিহ্নিত করার প্রবণতা থেকে দূরে

থাকার পরামর্শ দেন। লিও টলস্টয়ের সাহিত্যচিন্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অভিজ্ঞতার বিনিময়। সাহিত্য মূলত পাঠকের কাছে তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকে। তাই টলস্টয়ের কাছে সাহিত্য-শিল্প মানেই তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ। সার্তে মনে করে লেখনের মনোসত্তা স্বাধীন। তাই লেখা তার স্বাধীন লীলাক্ষেত্র। তাই সৃজনশীল লেখায় স্বাধীন চিন্তারই প্রকাশ করে। লেখক কখনো সরাসরি কাউকে কোনো মতাদর্শে দীক্ষিত করেন না। অনুভব-অনুভূতি সৃষ্টিতে সাহায্য করেন।

বেনেদত্ত ক্রোচে সাহিত্য-শিল্পের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বাহ্যিক রূপগত দিকের চেয়ে উৎপাদিত মানসিক ক্রিয়া বা স্বজ্ঞামূলক বা ইনটুইশনাল অনুভবকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সাহিত্য জীবন বাস্তবতার অনুষঙ্গে তার মানসপটে যে রূপকল্প সৃষ্টি করেন তাই সাহিত্য। কিন্তু এই রূপকল্প যেন নিছক ফ্যান্টাসি না হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। তাই তার সাহিত্য প্রবণতার মূলে ছিল অন্যের আবেগকে স্পর্শ করা। অন্যের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারিত করা। অনেক সাহিত্যতাত্ত্বিক মনে করেন পাখি যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকও তেমনি নিজের আনন্দে ভাষার সৌন্দর্যে অবগাহন করেন। পাঠক সেখানে আড়ি পেতে শুনে ফেলে মাত্র। মানবমনের গভীর বেদনা কিংবা উচ্ছ্বল আনন্দ প্রকাশের খেলা সাহিত্য। মোটকথা সাহিত্য মানবমনের স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক অনুভূতি।

সাহিত্য যদি মানবিক অনুভূতিই হয় তবে চ্যাট জিপিটি কী তা পূরণ করতে পারবে? এর উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। তবু অনেকেই চ্যাট জিপিটির পেছনে ছুটছে? চ্যাট জিপিটি কী করতে পারে? চ্যাট জিপিটি গল্প-কবিতা-উপন্যাস অনেকটা লিখে দিতে পারে। চ্যাট জিপিটি ভাষায় শব্দের বুনন তৈরি করে দিতে পারে। কল্পনায় গড়া বাক্যবিন্যাস তৈরি করে দিতে পারে কিন্তু হৃদয়ের অনুভব দিতে পারে না। সমকালে প্রচলিত আঙ্গিকের বাইরে কোনো আঙ্গিক-মাত্রা দেখাতে পারে না। অতএব সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপের সঙ্গে মেলালে দেখা যায় চ্যাট জিপিটি সাহিত্যের মৌল উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না। জিপিটি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেও কথার প্রসঙ্গ বোঝে না। প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। চ্যাট জিপিটির সমস্ত জ্ঞান ইনপুটের ওপর নির্ভর করে। আবেগ খেলা করে না। চ্যাট জিপিটি হৃদয়ের ওপর নয়, তথ্যের ওপর নির্ভর করে। বাস্তব মানবজগৎ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা থাকে না। এটা

দানব বা যন্ত্র। আর দানব দিয়ে মানবীয় কাজ হয় কী। চ্যাট জিপিটি অলংকারসমৃদ্ধ বাক্য তৈরি করলেও মানবীয় গুণ সেখানে থাকে না। ফলে সাহিত্যের যে মূল উদ্দেশ্য পাঠকের হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ঘটানো, কল্পনার সম্প্রসারণ ও জীবনাভিজ্ঞতার বিনিময় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে সাম্প্রতিক বিশ্বে অনেকেই সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে চ্যাট জিপিটির সাহায্য নিচ্ছেন সত্য। তবে সেটা লেখকের নিজের চিন্তার সম্প্রসারণেই কিছুটা ব্যবহার করছেন। চ্যাট জিপিটির ওপর নির্ভরশীল নয়। জাপানি লেখিকা রি কুদান তার 'দ্য টোকিও টাওয়ার অব সিম্প্যাথি' গ্রন্থটি লেখায় মাত্র দশভাগ চ্যাট জিপিটির সাহায্য নিয়েছেন। মূল ভাবনা লেখিকার, চিন্তার বিন্যাসও লেখিকার। শুধু প্যারাগুলো লেখায় কিছুটা সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি অনেকেই চ্যাট জিপিটির ওপরই লেখাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে চাইছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ সাহিত্য জীবনের শ্বাশত উপলব্ধি। তা সাহিত্যিকের উপলব্ধিজাত মানবমন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই সাহিত্য আত্মউপলব্ধি জাগায়। মনের স্বাস্থ্য বিধান করে। নব নব সভ্যতার বিকাশে সাহিত্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষের জীবন গঠনে, মানবিক হবার জন্য, বিকশিত হবার জন্য প্রকৃত সাহিত্য পাঠ অত্যন্ত জরুরি। সাহিত্যে মানব মন খেলা করে। মানব মন যতক্ষণ থাকবে, মানব জীবন যত দিন থাকবে সাহিত্য তত দিন থাকবে।

[প্রবন্ধটি 'সাহিত্য বার্তা' ওয়েবজিনে প্রকাশিত। সম্পাদক : আরিফুল ইসলাম]

বিউপনিবেশায়ন : বাঙালির ভয়টা কোথায়?

'বাংলাদেশ'-এর রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস। ভাষার নামকে ভিত্তি করে গঠিত জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ। আর জাতিরাষ্ট্রের আত্মপরিচয়ে প্রয়োজন তার নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কিন্তু এ জনপদ আজ অতীতচ্যুত শিকড়হীন বিচ্ছিন্ন এক জনপদ। যা ইউরোপীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ধর্মীয় বাস্তবতানির্ভর। বাংলাদেশের বর্তমান এ বাস্তব রূপের পেছনে কারণ কী? এককথায় উত্তর ইউরোপীয় উপনিবেশ শক্তি। কারণ উপনিবেশী শক্তিই শোষণ-শাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি আধিপত্য দিয়ে বাঙালিকে ঐতিহ্যহীন করেছে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা বিশ্বের উপনিবেশমুক্ত বা পরিত্যক্ত দেশগুলোতে প্রায় একই ধরনের অবস্থা দেখা গেছে। তাহলে করণীয় কী? উপনিবেশের জারিত প্রকল্পগুলো পরিত্যাগ করে হাজার বছরের বহমান ঐতিহ্যবাহী ধারার বিকাশ না হলে জাতীয় আত্মপরিচয় সৃষ্টি সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ থেকে উপনিবেশ শাসন বিলুপ্ত হয়েছে দীর্ঘদিন। কিন্তু উপনিবেশের রূপ-রীতি, করণকৌশল, পরম্পরা বা কার্যপ্রণালি এখনো সমভাবেই জারিত বা কার্যকর। সেজন্য 'উপনিবেশ' ধারণাটি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। 'বসতি স্থাপন' অর্থে 'উপনিবেশ' শব্দটি অর্থ নির্দেশ করলেও এ প্রত্যয়টি শাসন-শোষণ, আধিপত্য, মানস-সংস্কৃতি কিংবা অনুকৃতিমূলক বিষয়াদির সঙ্গে জড়িত। যা স্থায়ী বসতিদের পরিপন্থি। 'উপনিবেশ' ও

'সাম্রাজ্য' এক নয়। উপনিবেশের সঙ্গে শাসন-শোষণ, আধিপত্যবাদ, ভিন্ন সংস্কৃতিকরণ, মানস পরিবর্তন, লুণ্ঠন, পাচার প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পর্কযুক্ত।

কার্যকরণের ধারায় 'উপনিবেশ'কে দুভাবে দেখা যেতে পারে। প্রথমত-বস্তুগত উপনিবেশ এবং অন্যটি অবস্তুগত বা দৃশ্যগ্রাহ্যহীন উপনিবেশ। সরাসরি শাসন-শোষণকে বস্তুগত উপনিবেশ এবং স্থানীয় বসতিদের মানস দখল, মানস পরিবর্তনকে অবস্তুগত বা দৃশ্যগ্রাহ্যহীন উপনিবেশ বলা যায়। বস্তুগত উপনিবেশের সঙ্গে 'শাসন', 'শোষণ' শব্দটির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকলেও অবস্তুগত উপনিবেশের সঙ্গে 'অনুকৃতি', 'মানস সংস্কৃতি' ও 'পরনির্ভরশীলতা'র সম্পর্ক। অবস্তুগত উপনিবেশে জ্ঞানতাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক, মানস পরিবর্তন, অনুকৃতি ইত্যাদি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল। সেজন্য অবস্তুগত উপনিবেশ অত্যন্ত ভয়ংকর ও সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশিত অঞ্চলগুলো স্বাধীন হতে শুরু করে। ফলে উপনিবেশ-উত্তর জ্ঞানকাণ্ডের বিকাশ লাভ করে। 'উপনিবেশ-উত্তর' জ্ঞানকাণ্ড বা ভাবনা বলতে উপনিবেশবিরোধী জাতীয় সংস্কৃতির জাগরণমূলক কার্যক্রমকে নির্দেশ করেন। বিশ্বে উত্তর-উপনিবেশবাদকে Counter Discourse হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয়দের সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতার মূল কারণ ছিল দুটো—এক, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যটি ধর্মান্তরকরণ। যারা ইউরোপ-বর্হিগামী হতো তাদের বেশির ভাগই ছিল ইউরোপের দাগি আসামি এবং সাথে থাকত মিশনারি পাদরি বা ধর্মযাজকগণ। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠন করত। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে যাজক টমাস রো নানা কৌশলে সন্তুষ্ট করিয়ে প্রথম স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলো। শুরুর দিকে উপনিবেশের বসবাসের ঘাঁটি ছিল গোয়া, হুগলি, পরে কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর, কলকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। এদের অত্যাচারে বাংলার শাসনগণও তটস্থ থাকতেন। বাংলায় পর্তুগিজ জলদস্যুদের হার্মাদ বলে অভিহিত করা হতো। ১৬৬৬ সালের দিকে ইউরোপীয় বণিকদের অত্যাচারে সম্রাট শাহজাহান যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তখন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক জে কাবরালের মন্তব্য ছিল তাচ্ছিল্যের ও

রহস্যজনক। জে কারবালের কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যটি ছিল–'সম্রাট নিশ্চয় ভয় পাচ্ছেন ভারতবর্ষ না জানি বেদখলেই চলে যায়।'[১]

যা হোক, প্রাচীন কাল থেকেই এদেশ ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ।[২] পর্যটক হিউয়েন সাঙের মন্তব্যে ভারতবর্ষ ছিল প্রচুর সমৃদ্ধিশালী, লোকজন বিদ্যানুরাগী, স্বভাব ভদ্র, উন্নত রুচিশীল। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের বাংলাকে মিশরের চেয়েও সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী বলে উল্লেখ করেছেন। ১৬২৮ বা ১৬২৯ সালে খ্রিষ্টান ধর্মযাজক সেবাস্টিন মানরিকের বক্তব্যের মধ্যেও ভারতবর্ষ স্বনির্ভর, স্বাস্থ্যকর, প্রচুর ফলনশীল ও পোশাকশিল্পসহ নানাদিকে সমৃদ্ধের তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশ ইউরোপীয়দের হস্তগত হওয়ার পর পরবর্তী উপস্থাপনা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। তা ছিল ইতিহাস-ঐতিহ্যহীন, দরিদ্র, অসভ্য ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের।[৩]

১৭৫৭ সালে মীর জাফর আলী খানকে পুতুল নবাব বানালেও ১৭৬৫ সালে বক্সারের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাকে হস্তগত করে। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন গভর্নর হন ওয়ারেন হেস্টিং (১৭৭২-১৭৮৫ কালপর্ব)। এর আমলেই শুরু হয় নতুন ইতিহাস, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, ইউরোপীয়করণ। মুসলমানদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের নেতৃত্বে চালু হয় কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা। এ সময় সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে বাংলা অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ লোক না খেয়ে মারা যায়। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এ সময় জ্ঞানচর্চার জন্য উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বের এশিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়। ১৭৮৬-১৭৯৩ লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় নানাভাবে মুসলমানদের অবদমন করা হয়। খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত করা হয়। ১৭৯৮-১৮০৫ পর্বে লর্ড ওয়েলেসসি ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণের রাখতে এবং ব্রিটিশদের সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার পদ্ধতি গড়ে তোলেন। এ সময় চালু হয় ফোর্ড উইলিয়াম কলেজ। এ সবই এদেশীয় মানুষের ঐতিহ্যবাহী বোধ-বিশ্বাস-

---

[৭১] এমাজউদ্দীন আহমদ, হারুন অর রশীদ সম্পাদিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি* খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৫৯।

[৭২] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০, পৃষ্ঠা-১০৯

[৭৩] শহীদুল ইসলাম, *বৃটিশ উপনিবেশবাদ : মিথ ও বাস্তবতা*, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬

ইতিহাসকে অবদমন করে সৃষ্টি হতে থাকে ইউরোপীয়দের আধিপত্যনির্ভর ইতিহাস, তাদের মতো সংস্কৃতি ও তাদের গোলাম বানানোর শিক্ষাপদ্ধতি। ধীরে ধীরে সুসমৃদ্ধ শিল্পোন্নত বাঙালি জাতি পরিণত হয় ইতিহাস-ঐতিহ্যহীন হীনম্মন্য ভুখা নাঙ্গা অসভ্য বর্বর জাতি হিসেবে। সে সময়ের মুর্শিদাবাদ কেমন সমৃদ্ধ ছিল? ক্লাইভ কেমন দেখেছিলেন? তা নানা বইয়ে উল্লেখ আছে। আমরা সে প্রসঙ্গে না যাই।

বাংলা ব্রিটিশদের হস্তগত হওয়ার পর তৎকালে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদ আলবিরুনি, সদরউদ্দীন হাসান নিজামী, মিনহাজ-ই-সিরাজ, জিয়াউদ্দিন বারানী, খাজা নিজামুদ্দিন, মুহাম্মদ কাসিমের তথ্যগুলোকে পরিত্যাজ্য মনে করেন। ইতিহাসকারদের কারো তথ্য না নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিং সিরাজউদ্দৌলার কর্মচারী গোলাম হোসনকে নিয়ে প্রথম ইতিহাস তৈরি করান। এই ইতিহাসেই প্রথম সিরাজউদ্দৌলাকে কলঙ্কিত করা হয়। এরপর ইতিহাস তৈরিতে এগিয়ে আসেন ইংরেজ লেখক। কিন্তু এসব তথ্যে মুসমানরা ঐতিহ্যহীন। ১৮১৭ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ 'দ্য ব্রিফ হিস্টি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' নামে যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন তা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ফরমেটে যুগবিভাজন ও কন্টেন্ট বিশ্লেষণ। বাংলাদেশের সামাজিক পরবর্তনকে তথ্যবদ্ধ করেন ইউরোপীয় সময় ও টুলস দিয়ে। ফলে অন্ধকারযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক খ্যাত অধ্যায় কল্পনার সৌধ ছাড়া কিছুই ভাবা যায় না। ব্রিটিশরা কখনো পর্যালোচনা করেনি ঠিক ওই সময়টাকে আমাদের এখানে অন্ধকার যুগ বা আধুনিক যুগ বলা যায় কি না? আর সদরউদ্দীন হাসান নিজামী থেকে শুরু করে প্রায় শতাধিক আরবি-ফারসি-বাংলায় লেখা ইতিহাস তথ্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে সে গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে মাসুদ ইমরান তার গবেষণায় দেখান যে, উপনিবেশরা কৌশলে এ উপনিবেশিত বাঙালি জাতিকে বর্বর, ইতিহাসহীন বা সংস্কৃতিহীন পরিচয়ের হীনমানসিকতা তৈরি করে। উপনিবেশিত বাঙালি জাতিকে নিশ্চিত করে যে, যদিও কিছুটা ইতিহাস আছে তবু সেটা পশ্চাৎপদ, অনুপযোগী, অর্থহীন কিংবা বর্বর।[৪] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আফসোস করতেন—'এ দেশের ইতিহাস নাই, ইতিহাস লিখিতে হইবে' সে কারণটা ছিল কী। আর লিখিত ইতিহাসটাই কী। তা মূলত হিন্দু ঐতিহ্যের জাগরণবাদী

---

[৭৪] মাসউদ ইমরান 'সেলিম আল দীনের নাটকে বি-উপনিবেশিকরণ এবং এথনিক থিয়েটার হেজিমনি' প্রবন্ধ, *বনপাংশুল*, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২৬।

ইতিহাস। সে সময় ধুয়া উঠত, 'মুসলমানের লেখা ইতিহাস যে মানিবে সে বাঙালি না।' তাহলে বাঙালির আত্মপরিচয়ে কী লিখিত ছিল? বাঙালি মানে হিন্দু ঐতিহ্যবাদী কল্পিত সত্তা। নিখিলচন্দ্র নাথ তার বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন—'মুসলমানদের পরাজয়ের কথা লিখিতে পারিতেছি বলিয়া গৌরববোধ করিতেছি।' একজন ইতিহাসকারের কী ভয়ংকর কথা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, নিখিলনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু এমনকি অধুনা আর সি মজুমদার প্রমুখ ইতিহাসকার পূর্বোক্ত মুসলিম শাসনকালীন ইতিহাসকারদের গ্রন্থ থেকে কোনো তথ্য-উপাত্ত না নিয়ে নিজেরা তৈরি করেছেন পুরাণের কল্পিত তথ্যনির্ভর সাম্প্রদায়িক ইতিহাস।[৫] যা এখনো আমাদের পড়ানো হয়।

ধীরে ধীরে অতীতের সুসমৃদ্ধ বাংলাকে বিশ্বে পরিচিত করে তুলে 'দুর্ভিক্ষপীড়িত, 'ভুখা-নাঙ্গা', 'ভিক্ষুকের দেশ' হিসেবে। ইংরেজরা বাংলার লাভজনক ঐতিহ্যবাহী শিল্পসমূহকে ধ্বংস করে দিয়ে পাশ্চাত্যের কাঁচামালের আড়তে পরিণত করেছিল। এখান থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিলাতে পাঠাত আর বিলাতে থেকে সেসব পণ্য প্রস্তুত করে এ দেশে এনে এদেশীয়দের কাছেই চড়া দামে বিক্রি করত। এভাবে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলা হয়ে ওঠে কৃষিনির্ভির।[৬] ঔপনিবেশিক শোষণের সুবিধার্থে ইংরেজরা গড়ে তুলেছিল নগর এবং নগরকেন্দ্রিক এক নতুন ভারতীয় সমাজ। সেই সমাজের অঙ্গ ছিল ব্যবসাদার, ঠিকাদার, দালাল, মহাজন, কেরানি প্রভৃতি পরজীবী শ্রেণি। সে সময় শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহে নিজেদের বিলাস-ব্যসনের জন্য গড়ে তুলছিল 'বাবু' কালচার।[৭] উপনিবেশের শিক্ষাবিদ মেকলে ভারতের সমস্ত মানুষকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার স্বপ্ন দেখতেন।[৮] হাজার বছরের ভারতীয় শিক্ষাচিন্তাকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করে যাজক এডাম স্মিথের শিক্ষা জরিপকে

---

[৫] ফয়েজ আলম, *বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা*, সংবেদ, ঢাকা, ২০২৪

[৬] ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৩

[৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩

[৮] কামালউদ্দিন কবির, 'মৌলিক নাটকের সংকট ও রূপান্তরিত নাটকের সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সেমিকার কক্ষে ১৬ নভেম্বর, ২০১২ সালে পঠিত।

কেন্দ্র করে ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ আদলে ভারতের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। ম্যাকাওল বা মেকলের শিক্ষাতত্ত্বের মূল সুরটি ছিল—ভারতীয়রা দেহে হবে ভারতীয় কিন্তু আত্মায় হবে ইউরোপীয়।[৯] ওই সময় উপনিবেশ অনুকৃত বুদ্ধিজীবীরা পূর্বাপর চিন্তা না করেই এটাকে উচ্চতর আদর্শ হিসেবে যৌক্তিকতা দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আধিপত্য ও ক্ষমতার সুযোগে বাংলার অসংখ্য জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে ইউরোপীয়রা আত্মস্থ করে সেগুলো এ দেশেই ইউরোপীয় তত্ত্ব হিসেবে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলায় রাজনীতি, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পেছনে ব্রিটিশদের অবদানই বেশি। সম্ভবত ইতিহাস লুকানোর পরিপ্রেক্ষিতেই ওই সময়ের খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের 'যাজক' উপাধি অনেক ক্ষেত্রেই অনুল্লিখিত।

নাটকের প্রচলিত ইতিহাসে বলা হয়—১৭৯৫ সালে কলকাতায় ডোমতলায় লেবেদেফের ডিসগাইস নাটক অনুবাদ ও মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের শুরু।[১০] কিন্তু তা সেলিম আল দীনসহ অনেকেই উপনিবেশের মিথ্যাচার বলে প্রমাণ করেন। নাটকের মতো একটি জননন্দিত শিল্পমাধ্যমের এমন আকস্মিক উদ্ভব হতে পারে না। বাংলা নাটক হাজার বছর ধরেই ছিল। তা এ জনপদে নানা নামে, নানা রূপে ও নানা রীতিতে প্রচলিত ছিল।[১১] ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রে 'ওড্রমাগধী' নামে যে আঞ্চলিক নাট্যরীতির উল্লেখ পাওয়া যায় তা বাংলা অঞ্চলের নাট্যরীতি। এমনকি বৌদ্ধসাধন সংগীত 'চর্যাপদ'-এর মধ্যেও নাট্য প্রয়োগের উল্লেখ আছে—'নাচন্তি বাজিল গান্তী দেবী, বৌদ্ধ নাটকও বিষমা হই।' মধ্যযুগ খ্যাত সময়ে বাংলা অঞ্চলের প্রধানতম শিল্পমাধ্যমই প্রচলিত নাটক। যা তখন নাটক শব্দে পরিচিত ছিল না। পালা, জারি, যাত্রা, কীর্তন, পাঁচালি, কথকতা এগুলোই বাংলা অঞ্চলের নাটক। এগুলো একটি স্থানিক আয়তনে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হতো। কিন্তু উপনিবেশ শাসন ইতিহাস করণে আমাদেরকে ঐতিহ্যহীন হিসেবে চিহ্নিত করে ইউরোপীয়দের দাসে পরিণত করেছে।

---

[৯] ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*, বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৫

[১০] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৯৭

[১১] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, ভূমিকা অংশ।

ইতিহাস নাই ইতিহাস লিখিতে হইবে—এমন আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রামগতি ন্যায়রত্ন প্রথম প্রস্তাবনামূলক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ লেখেন। এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ সনাতন ধর্মীয় বাংলা ভাষায় লেখা পুস্তকের বর্ণনা। যাকে অনুকরণ করে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি করেন। দীনেশচন্দ্র সেন তার ইতিহাসের গ্রন্থের জন্য যে তথ্য-উপাত্ত নিয়েছেন তা ওই সময়ের খ্রিষ্টান ধর্মযাজক জে লঙ-এর বই থেকে। সে সময়ে দুধরনের বইয়ের তালিকা ছিল—একটি ছিল মোহামেডান বুকস বা মুসলমানদের বাংলা বইয়ের তালিকা। অন্যটি ছিল সনাতন ধর্মীয় বা হিন্দুদের বাংলা বইয়ের তালিকা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন ইতিহাস তৈরিতে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করেছিলেন সনাতনী ধর্মের বাংলা বইয়ের তালিকা থেকে। ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমানদের গ্রন্থ পুরো বাদ পড়ে। এমনও শোনা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংগ্রহের নামে মুসলমানদের গ্রন্থ নিয়ে ধ্বংস করেও দিত। দীনেশচন্দ্র সেন J. Long-এর যে বইয়ের তালিকা থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তৈরি করেছেন তার ভূমিকায় লেখা আছে—The Object of this works is to be a guide to those who wish to procure Bengali books, either for educational purpose or for gaining an acquaintances with the Hindu manners, customs of modes of thought, popular literature is an index to the state of the popular mind.[12]

সাহিত্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অনেকেই দীনেশচন্দ্র সেনকে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু বিতর্ক ছিল তুঙ্গে। দীনেশচন্দ্র সেন পরবর্তী এডিশনে আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ নামটি যোগ করেছিলেন। যদিও পরে ‘মুসলমানি সাহিত্য’ নামে আলাদা একটি গ্রন্থ রচনা করে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। কিন্তু মূল ইতিহাসের স্রোত সনাতনী ১৪০০ বইয়ের তালিকার ঘরানায়ই রয়ে গেছে। ইতিহাস তত্ত্ব-বিশ্লেষণে মুসলমানদের সাহিত্য ইতিহাসের মূল প্রবাহের সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্যগুণে কোনো অংশে কম নয়। সোনারগাঁয়ের সাহিত্যধারার নাম আজ বিলুপ্ত। আরাকান রাজ্যের রোমান্টিক প্রণয়নির্ভর সাহিত্যধারার তথ্য পাওয়া যায়। যার রিপ্রেজেন্টেশন মূলত তুচ্ছ বা অবজ্ঞার চিহ্নই বহন করে। উল্লেখ আছে—শাহ মুহম্মদ সগীরের বিখ্যাত রচনা ইউসুফ জুলেখা গৌড়াধিপতি সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০)

---

[১২] উদ্ধৃত, দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭

তত্ত্বাবধিত। কিন্তু গিয়াসউদ্দীনের সভাকবি হিসেবে খুব সম্ভবত শাহ মুহম্মদ সগীর আরাকানে বসবাস করতেন না। অর্থাৎ ইতিহাসে তাকে আরাকানে পুরো ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তার মানে ওই সময়ে বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের সাহিত্যচর্চা হতো না এমনটা বোঝানো। আরো বিস্মিত হতে হয় ইসলামি শাসনের স্বর্ণযুগে ইসলামি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবধারার চর্চা হয়েছে সেখানে মুসলিম সাহিত্যচর্চার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

'আধুনিকতা' শব্দের ধুয়া তুলেই ইউরোপীয়রা বাঙালিকে করেছে বিভ্রান্ত। 'আধুনিকতা' আঠারো শতকে ইউরোপে গড়ে ওঠা একটি প্রপঞ্চ বা ফেনোমেনা। এ দর্শনের মূলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-যুক্তি-বিজ্ঞান-ধর্মীয় গোঁড়ামিহীন ইত্যাদি নানা চিন্তানির্ভর থাকলেও বাংলাদেশে অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষ মনে করে ইউরোপীয়দের মতো করা। অর্থাৎ ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-নাটকের রীতি-আঙ্গিকের অনুকরণ করাই আধুনিকতা। এ ভুল চেতনায় বাংলাদেশিরা যুগ যুগ ধরে তার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। পশ্চিমা কাঠামোর নীতিকে অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে দেখা হয় নাই আমাদের নিজস্ব রূপ-রীতি। বিদেশি চোখ দিয়ে খুঁজতে গিয়ে হারিয়েছি নিজেকে। আঠারো শতক ছিল এদেশে ইউরোপীয় শাসন, শোষণ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্যে উপনিবেশের মানদণ্ড ও আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করা। ইউরোপীয় আধিপত্যবাদী 'ডকুমেন্ট' পাকাপোক্ত করা এবং এদেশীয় প্রতিনিধি তৈরি করা। পূর্বেই বলা হয়েছে—১৭৮০ সালে ওরায়েন হেস্টিং এ সময় কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হতেন খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণ। যাজকগণ মুসলিম ধর্মবেত্তাগণকে শিক্ষা দিতেন। বিষয় কত হাস্যকর। ইতিহাসে পাওয়া যায় হ্যালহ্যাড প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছেন। অথচ হ্যালহেডে বাংলা ভাষা জানতেন না বলেই নানা তথ্যে উল্লেখ আছে।[১৩] সামগ্রিক পর্যালোচনায় স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় শাসন-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ভেতরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয়। এতে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক উইলিয়াম কেরি। যিনি একসময় ব্রিটেনে মুচির কাজ করতেন। খ্রিষ্টান

---

[১৩] *বাংলা পিডিয়া*, সম্পাদনা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৮, ডিজিটাল ভারসন, হ্যালহেড অন্তর্ভুক্তি।

ধর্মযাজক হয়ে বাংলায় ধর্মান্তরণের জন্য এসেছিলেন। এ কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পাশ্চত্যের অল্প বয়সী যুবকদের এনে শাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ ও ধর্মান্তরকরণের ভিত পাকাপোক্ত করে নেয়। সাথে সৃষ্টি করতে থাকেন এদেশীয় বুদ্ধিজীবী মহলে ইউরোপীয়দের সহযোগী শ্রেণি। ধীরে ধীরে এদেশীয় বুদ্ধিজীবীরা উপনিবেশের আত্মিক দাসে পরিণত হয়। শুরুর দিকে খ্রিষ্টান মিশনারিগণ এ দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম সৃষ্টি করেছিল।[১৪] বইপত্রও মিশনারিরাই ছাপিয়ে বিতরণ করেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক আধিপত্য বিস্তারের আরেক কেন্দ্র ছিল শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন। যা হোক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলতেন, 'উইলিয়াম যাজক কেরি হলেন বাংলা ভাষার দর্জি।' কেরি দর্জির মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেটেছেঁটে তাদের ইউরোপীয় আধিপত্যনির্ভর নানা বিভাজনে বিভক্ত করেছেন। সেলিম আল দীন উপনিবেশসৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি প্রথাগত বিভাজন মানতেন না। এমনকি ইউরোপীয় বিরামচিহ্নগুলোকেও তিনি বর্জন করেছিলেন।[১৫] মঙ্গলকাব্য ধারার গ্রন্থসমূহকে তিনি মহাকাব্য বলায় বেশি আগ্রহী ছিলেন। কারণ বাংলার এক-একটি সাহিত্যের মধ্যেই ছিল সমস্ত গুণ। উপনিবেশসৃষ্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বাংলার এক-একটি সাহিত্য নির্দশনের মধ্যেই লভ্য। কেরি প্রজেক্টের শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে ইসলাম ধর্মাশ্রিত ভাষাগত শব্দকে পুরোপুরি বর্জন করেন। ধর্মান্তরকরণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া হিসেবে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। উইলিয়াম কেরি 'কথোপকথন'-এর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রান্তিক সমাজজীবনের যে ভাষা তুলে ধরেছেন নব্য শাসকদের সামনে, যা অত্যন্ত ভয়ংকর। এ ভাষার নমুনায় বাঙালিকে ইতর বা অসভ্য ভাবতে কুণ্ঠিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। অথচ ওই সময়ে রচিত পুঁথিগুলোতে বাংলার চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি যাজকদেরই 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এ বিধৃত চিত্রে বাঙালির উঁচুতর রুচিরোধ ও মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বলতে অত্যুক্তি হবে না কেরি ঢাকা অঞ্চলের সে সময়ের সমৃদ্ধ বাংলা চোখেই দেখেননি। ষোড়শ শতকেই বাংলা ভারতের রাজকীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছিল। অনেকে কেরিকে বাংলা গদ্যের জনক বলে থাকেন এবং বাংলা

---

[১৪] প্রাগুক্ত, 'শিক্ষা' অন্তর্ভুক্তি।

[১৫] আবু সাঈদ তুলু, *সেলিম আল দীনের সাহিত্য ভাবনা*, মাওলাব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃষ্ঠা-১১১

গদ্য তৈরির ক্রেডিট দেন আঠারো শতকের উপনিবেশ-মিশনারিদের। অথচ পঞ্চদশ শতকের 'রসুলবিজয়' গ্রন্থে সমৃদ্ধ বাংলা পাওয়া যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবীয় বাংলা গ্রন্থ 'কারিকা', 'অষ্টসখীর গণনির্ণয়'সহ নানা গ্রন্থেই বাংলা গদ্য আছে।[১৬] এমনকি এ অঞ্চলে চম্পুকাব্য নামে প্রচলিত সাহিত্য ধারাটিও ছিল গদ্য-পদ্যে লিখিত।

উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' রচনায় বাঙালির ঐতিহ্যচিন্তা ও আচার প্রথা বোঝাতে যেভাবে 'বাঁদরতত্ত্ব'র আরোপ করেছেন তা বাঙালি ও সিভিলিয়নের মধ্যে সাংঘর্ষিক। বাঁদরকে মাথায় উঠতে দেওয়া যাবে না, পাছায় ঘা লাগাতে হবে। রূপকাশ্রিত বাঁদরটিই ছিল বাঙালি। ইতিহাসমালায় প্রায় দেড়শটি গল্প রয়েছে। তার মধ্যে পঞ্চতন্ত্র থেকে ১৪টি, বেতাল পঞ্চবিংশতি থেকে ২টি, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা থেকে ১টি, কথাকোষ, পুরুষ পরীক্ষা, বসুদবহিন্দি থেকে ২৯টি, ঈশপ থেকে ৪টি, প্রচলিত ফারসি গল্প থেকে ৮টি, ইউরোপীয় ৮টি, নীতিকথা ও রূপক গল্প হচ্ছে ২৫টি। এগুলো উপস্থাপনের মনস্তত্ত্বে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ইউরোপীয় আধিপত্যবাদই লক্ষ করা যায়। সে সময় ভাষার উপনিবেশকরণে রামরাম বসুকে সহযোগিতায় এগিয়েও খ্রিষ্টান যাজকগণ তাকেই নৈতিক স্খলনজনিত কারণ দেখিয়ে চাকরিচ্যুত করে। এর ভেতরেও কত না রহস্য আছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশ সরকার এ দেশের শাসনক্ষমতা দখলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল মুসলমানদের। মুসলমানদের অবদমিত করে ক্ষমতায়ন করেছিল হিন্দুদের। চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত নামে কৌশলে অনেকাংশেই নিঃস্ব করেছিল মুসলমানদের। সে সময় মুসলমানদের লিখিত গ্রন্থকে চরমভাবে অবহেলা করা হয়। আরবি-ফারসি-বাংলা ভাষায় লিখিত মুসলমানদের গ্রন্থের কোনো তথ্যই ইতিহাসকরণে স্থান পায়নি। যে সময় দেড়শো মুসলিম সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যায় অথচ সে সময়কে বলে সাহিত্যহীন বন্ধ্যা যুগ। উপনিবেশ সময় মুসলমানদের গ্রন্থকে তুচ্ছার্থে বলা হতো পুঁথি (প্রকৃত শব্দে পুস্তক)। ব্রিটিশদের ছাপাখানা ছিল বিধায় পরবর্তী প্রায় ১০০ বছর মুসলমানদের কোনো গ্রন্থ ছাপা হয়নি। এমনকি যে সময় হিন্দুদের বই ছাপা হতো সে সময়ও মুসলমানদের বই ছাপা হতো না। ১৮০০-১৯০০ পর্যন্ত ছাপা বইয়ের তালিকা দেখলেই তা দেখতে পাবেন। অনেক মুসলিম তার বই প্রকাশের জন্য নামের প্রথমে শ্রী

---

[১৬] ফয়েজ আলম, *বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা*, ঘাসফুল, ঢাকা, ২০২৪, পৃষ্ঠা-৪৬

লিখতেন। আর মুসলমানদের বইয়ের আরেকটি তকমা লাগিয়েছিল তা হচ্ছে বটতলার পুঁথি।

ম্যাক্সমুলার ব্যাঙ্গ করে বলতেন, 'ভারতের সাহিত্য ব্রিটিশ লাইব্রেরির একটি তাকের সমান'। অথচ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাঙালি জাতি ছিল বিশ্বের ষষ্ঠ সমৃদ্ধ জাতি। জ্ঞান-সাহিত্যচর্চায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এভাবেই তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য ও উপনিবেশ কৌশলে পিছিয়ে পড়তে থাকে মুসলমানরা। সতেরো শতকে সৃষ্ট কলকাতা নগরীর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল উপনিবেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক আধিপত্য নির্মাণ করে দেওয়ার প্রচ্ছন্ন ফ্যাক্টরি। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঊনবিংশ শতকের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগৃহীত ও সম্পাদিত এদেশীয় কোনো গ্রন্থই আজ অকৃত্রিমরূপে নেই। মঙ্গল সাহিত্য ধারাগুলো মূলত নাট্যপালা, সেগুলো হয়ে উঠেছে কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত নাটগীত, হয়ে উঠেছে কাব্যমালা। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীদেবীর পালা হয়ে উঠেছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখা মুসলমানদের এ পালানাট্যগুলো হয়ে উঠেছে ছন্দে ছন্দে গীত ব্যালেট। অর্থাৎ মূল পরিচয় থেকে কতটা সরিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ উপনিবেশের সঙ্গে তুলনা করে ঐতিহ্যপ্রীতির তকমা লাগাতে গিয়েও এমন কাজ করেছেন অনেকে। প্রকৃত অর্থে তা ছিল এদেশীয়দের জন্য প্রকৃত ক্ষতি।

মুসলমানদের কাছ থেকে সংগৃহীত কোনো গ্রন্থের তথ্যই ইতিহাসকরণে নেই। এটা নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি গল্প হলো—একবার বিশিষ্ট মনীষী আহমেদ শরীফের কাকা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছে মুসলমানিয় গ্রন্থ (পুঁথি) সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিনিধিদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ এসব বুদ্ধিজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করে মুসলমানদের পুঁথিগুলো নিয়ে তা নষ্ট করে ফেলেন। পরে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছিলেন নিজের ভাতিজাকে পুঁথির দায়িত্ব বা পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়ার শর্তে। এ গল্প থেকেই অনুমান করা যায়, কীভাবে মুসলমানদের চর্চিত সাহিত্যগুলো বাদ পড়েছিল বা বাদ দেওয়া হয়েছিল। যে সময় বাংলার প্রত্যেকটা মুসলমানের ঘরে ঘরে ছিল ইউসুফ-জুলেখা, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল কিংবা হানিফার জঙ্গনামা, সেখানে ইতিহাসে এগুলো চট্টগ্রামের ছোট্ট রোমান্টিক কাহিনির চর্চা। অথচ হিন্দুবাড়ির গোয়ালঘরে কিছু পেলেও তা ইতিহাসের মূল উপাত্ত। যার দ্বিতীয়

কোনো কপি নেই। একটি ডকুমেন্ট দিয়েই ইতিহাসের যুগ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নির্দশন চর্যাপদ বলার মধ্যে উপনিবেশ রাজনীতি জড়িত আছে।

ইউরোপীয় উপনিবেশ বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপদ্ধতিকে সমূলে ধ্বংস করে উপনিবেশ তাদের মতো খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্নমুখী শিক্ষা কাযক্রম চালু করেছিল। বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত জ্ঞান দিয়ে ইতিহাস, সমাজের কোনো ঘটনা বা বিষয়ের প্রকৃত সত্য উপলব্ধি সম্ভব নয়। বাংলা অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষায় উপনয়ন হতো। প্রতিদিনের পাঠ হতো প্রকৃতির সান্নিধ্যে ও একজন গুরুর কাছে। একজন গুরুর অধীনে গুরুকূল, মক্তব, মাদ্রাসা, টোল বা চতুষ্পাঠীতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দক্ষতা লাভ করত। এক গুরুর কাছে পড়া শেষ হলে অন্য গুরুর কাছে যেত। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন প্রায়োগিক বস্তুবিদ্যায় দক্ষ হতেন তেমনি আত্মিক-তাত্ত্বিক-বৌদ্ধিক জ্ঞানেও পরিপূর্ণ হতেন। প্রাচীন বাংলার শিক্ষাকার্যক্রমের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল—জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষা, সমাজের প্রতি কর্তব্য, মানবমুক্তি, ধর্মনিষ্ঠার শিক্ষা ও চরিত্র নির্মাণের শিক্ষা। পরিব্রাজক স্ট্যাবো মন্তব্য করেছিলেন—এরা (বাংলা-ভারতীয়) এতটাই সৎ ছিলেন যে তারা নিজেদের ঘরবাড়ি তালাবদ্ধ করতেন না বা লিখিত কোনো চুক্তিপত্রের প্রয়োজনও বোধ করতেন না। অথচ বাঙালি আজ নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ে বিরাজমান।

সেলিম আল দীন বলতেন, ব্রিটিশরা এসে ক্লাসরুম বানিয়েছে—গির্জার ডায়াস ও প্রার্থনাকারীর মঞ্চের আদলে।[১৭] বিভিন্ন স্পেশালিস্টরা তাতে যাজকদের মতো উপদেশ বা বক্তব্য প্রদান করে। বর্তমানের উপনিবেশের খণ্ডিত জ্ঞানপদ্ধতি দ্বারা প্রকৃত সত্য কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব নয়। যদি কোনো ঘটনার বাস্তবসত্য বুঝতে চায় তবে তার কমপক্ষে ছয়-সাতটি সাবজেক্টের বা বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হয়। সেলিম আল দীন বলতেন, ছয়শত খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে সমস্ত পৃথিবীতে মোট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাদের ৯টিই ছিল ভারত-বাংলায়। বাকি ২টি গ্রিসে। অথচ আজ আমরা ভিখারির জাতি। উপনিবেশ আমাদেরকে তাদের দোসর ও কেরানি বানাতে চেয়েছে। তাই এদেশীয় প্রযুক্তির যেন বিকাশ না ঘটে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেছে।

[১৭] সরকার আবদুল মান্নান, 'আমার শিক্ষক সেলিম আল দীন', '*থিয়েটার*' পত্রিকা, সেলিম আল দীন স্মরণ সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৮৯

বস্ত্রশিল্পের তাঁতিদের আঙুল পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন। প্রাচীন বাংলা ছিল অত্যন্ত শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল।

প্রাচীনকাল থেকেই আরবে-ইউরোপে নানা শিল্প রপ্তানি হতো। মসলিন, রেশমের নাম আমরা সবাই জানি। প্রযুক্তিবিদ্যা এমনকি জাহাজ তৈরি বিদ্যায় অন্যতম ছিল প্রাচীন বাংলা। অথচ আজ বাঙালি হীনম্মন্য, দাস কিংবা ভিখারির জাতিতে পরিণত হয়েছে। উদ্ভট এক মনোবিকৃতিতে ভরে গেছে। বর্তমানে কেউ সত্য বললে তা যদি মুসলমানদের পক্ষে যায় তবে 'আরবীয়', 'মরুভূমির মানুষ' ট্যাগ পেতে হয়। আর হিন্দুদের পক্ষে গেলে ভারতীয় ট্যাগ। কিন্তু যারা বলছে তারা কারা? তারা নিজেরা যে ইউরোপীয়, খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতির তাই তারা জানে না। তারা নিজেরা বাংলাদেশি হয়নি এখনো। নিজেরা কী নিজেরাই বোঝে না। কী হাস্যকার। ফ্রান্স ফানোর 'ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক' গ্রন্থটি যখন পড়েছিলাম তখন আশ্চর্য হয়েছিলাম আফ্রিকান কালো নিগ্রোদের অদ্ভুত মনোজগত দেখে। কালোরা মনে মনে বিশ্বাস করে তারা সাদা। কী অদ্ভুত মনোবৈকল্য। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা তেমন মনোবৈকল্যই তৈরি করে যাচ্ছে।

পরিবেশে বলা যায় 'বাংলা' ভাষাভিত্তিক গঠিত দেশ 'বাংলাদেশ'। এ দেশের আত্মপরিচয়ে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জাগরণ প্রয়োজন। এ জাতীয় জাগরণের জন্য প্রথমে প্রয়োজন উপনিবেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক আধিপত্য কাঠামো বর্জন। কিন্তু একধরনের কাল্পনিক ভয় আমাদেরকে আড়ষ্ট করে রাখে। উপনিবেশ শাসন চলে গেছে দীর্ঘদিন কিন্তু আজও এ ভয় কেন? এই ভয়টা কীসের? উপনিবেশ চলে যাওয়ার পরও মনোজগতে কীভাবে টিকে থাকে উপনিবেশ! কারা প্রতিনিধিত্ব করে উপনিবেশ শক্তির। আমরা জাতীয় মুক্তি চাই কিন্তু অদৃশ্য আতঙ্কে আমরা কথা বলতে পারি না; সত্য উচ্চারণ করতে পারি না। কী এক অজানা কাল্পনিক ভয় আমাদেরকে তাড়া করে ফেরে। সে ভয় দূর করা প্রয়োজন। ঐতিহ্যের জাগরণ ছাড়া আত্মমর্যাদাশীল ও সমৃদ্ধ 'বাংলাদেশ' গড়া সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র

১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ-১৪২০
২. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১
৩. শহীদুল ইসলাম, বৃটিশ উপনিবেশবাদ : মিথ ও বাস্তবতা, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা, ২০০৯
৪. সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৫. ফয়েজ আলম, বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা, ঘাসফুল, ঢাকা, ২০২৪
৬. বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি খণ্ড, সম্পাদনা- এমাজউদ্দীন আহমদ, হারুন অর রশীদ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭
৭. মাসউদ ইমরান 'সেলিম আল দীনের নাটকে বি-উপনিবেশিকরণ এবং এথনিক থিয়েটার হেজিমনি' প্রবন্ধ, বনপাংশুল, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৯
৮. ফয়জুল আজিম, বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব, বাংলা একাডেমি, ২০০০
৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং, কলকাতা।
১০. বাংলা পিডিয়া, সম্পাদনা-এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, 'শিক্ষা' অন্তর্ভুক্তি, ২০০৮, ডিজিটাল ভার্সন।

[প্রবন্ধটি শিল্পস্বর আয়োজিত সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ হিসেবে পঠিত এবং ০৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক ওয়েবজিন 'প্রতিধ্বনি'তে প্রকাশিত]

শিল্প-সাহিত্যে নন্দনভাবনা ও নৈতিকতা

পাঠক বা দর্শকের হৃদয়কে স্পর্শ করতে সাহিত্যে নন্দনতাত্ত্বিক উপাদান খুব জরুরি। এটা শুধু বাহ্য উপকরণ হিসেবে নয়; শিল্পের অন্তঃক্রিয়াশীল গতি ছন্দেও। হাজার বছরের সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাহিত্য নন্দিত কিংবা নিন্দিত হয়েছে ভালো লাগা-মন্দ লাগাকে ঘিরে। সাহিত্য এমন এক শিল্পধারা যেখানে মানুষের অনুভূতিই প্রধানরূপে বিবেচ্য। আর নন্দনভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি বিষয় হিসেবে নৈতিকতা জড়িত থাকলেও তাকে প্রশ্রয় দিতে খুব কম দেখা যায়। মানুষের বিশ্বাস যেমন উৎপন্ন হয় জ্ঞান-অভিজ্ঞতা থেকে, তেমনি কর্মপ্রেষণা সৃষ্টি হয় নৈতিকবোধ থেকে। আবার অনুভব-অনুভূতি সৃষ্টি হয় নিজস্ব সৌন্দর্যবোধকে ঘিরে। সে জন্য শিল্পের জন্য নন্দন ও নৈতিকতার যুগপৎ পরিমিত সম্মিলন দরকার। সাহিত্য-শিল্পের মূল্যবোধ নানা মাত্রায় নির্ভরশীল। এমনকি অলীক আনন্দেও এর অনুভব তুঙ্গে। বাঙালির হাজার বছরের যে নিজস্ব মূল্যবোধ ছিল তা ইউরোপীয় উপনিবেশ শাসনে পাল্টে যেতে শুরু করেছিল অষ্টাদশ শতক থেকে। ইউরোপীয় কূটনীতির জালে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে ওঠেছে ইউরোপীয়। আমরা আমাদের চোখ দিয়ে আমাদের শিল্পকে দেখি না; আমরা দেখি ইউরোপীয় চোখ দিয়ে। দৃষ্টিভঙ্গির এমন বিপরীতকরণে আমাদের শিল্প-সাহিত্য সার্থক মূল্যায়নে আমরা ব্যর্থ হয়ে ওঠেছি। আমরা এ প্রবন্ধে সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী নন্দনভাবনার সঙ্গে নৈতিকতার স্বরূপ অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত থাকব। এর দার্শনিকভিত্তি কেমন? মূল্যবোধের রূপরেখাগুলো কেমন হওয়া উচিত কিংবা গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটকের নান্দনিক টুলসগুলোতে কী থাকে, পাশ্চাত্য নন্দনভাবনার সঙ্গে

আমাদের প্রাচ্যের নন্দনভাবনার তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে সাহিত্যের প্রায়োগিক রূপ-রেখা নিয়ে এ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনায় ব্যাপ্ত থাকব।

সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায়—ইতিহাসকে আশ্রয় করে নতুন আরেক শিল্পসত্য তৈরি হতে। যা কখনো কখনো ইতিহাস বিকৃতি কিংবা ভিন্ন ইতিহাস সৃষ্টির পর্যায়ের পড়ে। তাহলে এ ধরনের নতুন ইতিহাস নির্মিতিকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলে অভিহিত করব কি না। এখানেই প্রশ্ন তৈরি হয়। অ্যারিস্টটলের কাব্যসত্যে শিল্পীর সীমা কতটুকু? দর্শনে নন্দনতত্ত্ব ও নৈতিকতা আলাদা শাখা হিসেবে বিবেচিত হলেও কল্যাণমুখী সাহিত্য মূল্যায়নে দুটো জ্ঞানকাণ্ডের সম্মিলন প্রয়োজন। যদিও সম্প্রতি এ ধরনের আলোচনাকে মূল্যবোধচর্চা হিসেবে দেখা হচ্ছে। সাহিত্য-শিল্পের উৎকর্ষ কিংবা মানবজীবনমুখী সাহিত্য-শিল্পের জন্য এ সাহিত্যবিদ্যার সঙ্গে এ দুটোর একত্র বিচার খুব জরুরি। 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় শব্দমূল 'নন্দ'। 'নন্দ' ক্রিয়াপদ। এর অর্থ হচ্ছে আনন্দ। নন্দ-এর সাথে অন (ল্যুট) প্রত্যয় যোগে নন্দন শব্দটি গঠিত। 'নন্দন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—আনন্দ পাওয়া বা আনন্দ দেওয়া। আবার অনেকে ভিন্নভাবেও ব্যাখ্যা করে থাকেন। নন্দি+ইন। এখানেও অর্থ দাঁড়ায় 'আনন্দ'। তাহলে বোঝা যায় সাহিত্যে আনন্দ উপভোগের উপাদান বা সৌন্দর্যরূপই নন্দন। এ সংক্রান্ত আলোচনাই নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব। নন্দনতত্ত্ব মানে সৌন্দর্যবিদ্যা। নন্দনতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ Aesthetics, Esthetics। এথিকসের মূল গ্রিক শব্দ Aisthetikos। যার অর্থ হলো অনুভব করা। জার্মান ভাষায় *Æsthetik* সৌন্দর্যবিদ্যা অর্থে এর প্রথম সার্থক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ফরাসি ভাষায়ও esthétique শব্দটি নন্দনবিদ্যা বা সৌন্দর্য বিদ্যাকেই বোঝায়।

মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অতীন্দ্রিয় যেসব অনুভব-অনুভূতি মানুষের আবেগে, মস্তিষ্কে যে অনুভবের জন্ম দেয় নন্দনবিদ্যা তা নিয়ে কথা বলে। নন্দনবোধ ভালো লাগা তৈরি করে। এ ভালো লাগা, ভালো-মন্দ, কল্যাণকর-অকল্যাণকর অনুভূতি শুধুই নিছক আবেগের উপর নির্ভর করে না। অপরদিকে নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকবোধ জন্ম দেয় যুক্তিনিষ্ঠতা। করণীয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। মানুষ নিজের কাজগুলো কীভাবে সম্পন্ন করবে তার কী উচিত বা কী অনুচিত নীতিশাস্ত্র সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। সঠিক সিদ্ধান্ত কোনটি তার রূপরেখা তুলে ধরে। প্রাচীন পৃথিবীর গ্রিসের দার্শনিক এবং ভারতের মুণি-ঋষিদের মধ্যে নীতিশাস্ত্রচর্চা করতে দেখা যায়। মানুষ যেটিকে সঠিক

বলে জানে তাকেই নৈতিক আদর্শ বলে মনে করে। তাই জ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধ জরুরি। সক্রেটিস আত্মজ্ঞান বা আত্মচেতনা লাভকে নৈতিকবোধ জন্মের প্রথম করণীয় বলে মনে করতেন। অন্যের জন্য ভালো করা এবং উপযোগবাদের ধারণা নীতিশাস্ত্রকে আরো বিকশিত করেছে। যেটি অন্যের ভালো করবে, অন্যকে বিপদে ফেলবে না, অন্যকে মহৎবোধ দেবে তা হলো নৈতিক। নন্দনতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র দু-এ তৈরি করে মূল্যবোধ বিষয়ক জ্ঞান। সাহিত্য-শিল্পের জন্য যার চর্চা অবশ্যম্ভাবী।

নন্দনভাবনা ভালো মন্দের অনুভূতি দেয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্র তাতে কী করা উচিত তার বোধ দেয়। শিল্প-সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক, চিত্রকলায় এমনকি পোশাক-আশাকে, বাচনভঙ্গি, আচরণে তার প্রকাশ ঘটে। নন্দন ও নৈতিকতায় দুটো দিক থাকে—একটি অভ্যন্তরীণ দিক—যেখানে সৌন্দর্য, রুচি, আনন্দ, বিচার, করণীয় ইত্যাদি। অন্যটি বহিরাঙ্গিক দিক—যেখানে রূপ-রীতির প্রকাশ ঘটায়। কবিতা হলে তার ভাবটা কেমন হবে, তার প্রকাশে ভাষা-ছন্দ-অলংকারে কী রূপ প্রতিফলিত হবে। আবার সংগীত হলে বাণী-সুর-কণ্ঠ, নাটক হলে—আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ, উপন্যাস হলেখ—গল্পের বর্ণনা, চরিত্র, ভাষা ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতে নন্দনতাত্ত্বিক ভিত্তির যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার অন্যতম ছিল আনন্দ দান। প্রাচীন ভারতে কাব্য বা শিল্পের নান্দনিকতার উপাদান হিসেবে নানা তাত্ত্বিক নানা অভিমত পোষণ করতেন। তার মধ্যে প্রধানতম মতবাদ ছিল অলংকারবাদী। অলংকারবাদীরা মনে করতেন অলংকারের গুণেই বাক্য কাব্য পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু রীতিবাদীরা বলতেন ভিন্ন কথা। তারা মনে করতেন কাব্যের সৌন্দর্য নির্ভর করে রীতির ওপর। অনেকে মনে করতেন, সাহিত্য-শিল্পে থাকতে হয় কাব্যবস্তু বা বিষয়বস্তু। কিন্তু ধ্বনিবাদীরা তা মেনে নিতেন না। কারণ ধ্বনিবাদীরা মনে করতেন, বাক্য যখন অতিরিক্ত কিছু বলবে তখন তা কাব্য হয়ে উঠবে। তাই তাদের মতে, কাব্যের নান্দনিক গুণ হচ্ছে ধ্বনি। তবে শিল্প-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল রসবিচার। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আটটি ভাবের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে একটিসহ মোট ৯টি ভাব ও রসের পরিচয় পাওয়া যায়। রসবাদীরা মনে করেন, শিল্প সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাঠকের মনে রস সৃষ্টি করা। শাস্ত্রমতে ভাব ও রসগুলো হলো—রতি থেকে আদিরস বা শৃঙ্গাররস, হাস ভাব থেকে হাস্যরস, শোক ভাব থেকে করুণ রস, উৎসাহ ভাব থেকে বীররস, বিস্ময়ভাব থেকে

অদ্ভুতরস, ভয় ভাব থেকে ভয়ানক রস, জুগুপ্সা ভাব থেকে বীভৎস রস, ক্রোধ ভাব থেকে রৌদ্ররস এবং শম ভাব থেকে শান্ত রসের উৎপত্তি ঘটে। কাব্য সৌন্দর্যের মানদণ্ড হিসেবে নন্দনতাত্ত্বিক দণ্ডী অলংকারকে প্রধানরূপে বিবেচনা করেছেন। তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, অলংকারের গুণেই কাব্য হয়ে উঠতে পারে। অলংকারই সুন্দরের মূল উপকরণ। তিনি স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি নামে বাক্য বিন্যাসের দুই রকমের অলংকারের কথা বলেছেন। তা ছাড়াও তার গ্রন্থে আরো ৩৬টি অলংকারের কথা উল্লেখ আছে। দণ্ডী মনে করতেন, রসহীন, অলংকারবিহীন কিংবা বক্রোক্তি বাদ দিয়ে কোনো রচনা কাব্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তবে সে সময়ের অধিকাংশ আলংকারিকগণ মনে করতেন শব্দ, অর্থ, রস, ধ্বনি, অলংকারের মতো গুণই একটি কাব্যোপকরণ। বাণভট্ট, দণ্ডী ও ভামহের তথ্যে সে সময়ে গৌড়ীয় রীতিতে অর্থ ব্যঞ্জনা, অলংকার, অনুপ্রাস ও রচনায় ভাবের গভীরতা প্রধান রূপে বিবেচিত হতো।

নন্দনতাত্ত্বিক আচার্য ভামহের 'কাব্যালংকার' গ্রন্থটিতে কাব্য সৌন্দর্যের প্রধান আলোচ্য বিষয় কাব্যশরীর, অলংকৃতি, দোষ, ন্যায় নির্ণয় ও শব্দশুদ্ধি। ভামহ তার গ্রন্থে ৩২টি অর্থালংকার ও তিনটি শব্দালংকারের উল্লেখ করেছেন। শান্ত রসকে তিনি মোক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ভামহ রসকে গুরুত্ব দেননি। বরং কাব্যে তিনি রসবিরোধী ছিলেন। আচার্য বামনের 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'র দুটো সূত্র—'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারৎ', 'সৌন্দর্যম অলংকারঃ'। অলংকারের জন্যই কাব্য উপাদেয় হয় এবং সৌন্দর্যই অলংকার। অনেকে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' অলংকার নয়, রীতিকেই অনেকে কাব্যের আত্মা বলে অভিমত পোষণ করেছেন। আচার্য কুন্তক বক্রোক্তিবাদ নামে কাব্যসৌন্দর্য বিবেচনার নতুন তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। তার মতে শব্দার্থের বক্রতাই কাব্যত্ব বা কাব্যের সৌন্দর্য তৈরি করে।

সাহিত্যের সৌন্দর্য নির্ধারণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাশ্চাত্যরীতি অবলম্বন করেছেন। ভারতের প্রাচীন রস-অলংকার-বক্রোক্তিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের নিবেদন' প্রবন্ধে বলেন, 'সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠকে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য চিন্তায় রসকে প্রধান করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্পসৃষ্টিকে 'নির্মিতি' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য সম্পূর্ণই আলাদা। সাহিত্য শিল্পের প্রকৃত

লক্ষ্য হলো আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে সাহিত্যে কাব্যসত্য বা শিল্পসত্য বড় রূপে বিবেচনা করেছেন। ইতিহাসের তথ্যসত্যের ওপর নির্ভর করে না। এ হলো শিল্প বাস্তবতার সত্য। 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি/ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি/রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

সাহিত্যে আনন্দ মূখ্য বলে নীতিহীন বিষয় আশ্রয় করে আনন্দ দেওয়া যাবে কি না? ইতিহাস-ঐতিহ্যের ঘটমান সত্যের সঙ্গে মিথ্যা ঘটনা যোগ করে বা মিথ্যা গল্প সাজিয়ে শিল্প তৈরি করা যাবে কি না? ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র অনুসারে নাট্যক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল পঞ্চমবেদ হিসেবে। যাতে ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্যবস্তু বা বিষয়, যজুর্বেদ থেকে অভিনয়, সামবেদ থেকে গান বা সংগীত ও অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে গঠিত হয়েছিল। যার উদ্দেশ্যও ছিল-ধর্ম-মোক্ষ। শাস্ত্রে উল্লেখ—'পূর্বনং কৃতযুগে বি প্রাঃ বৃত্তে স্বায়ম্ভুবেহন্তরে; ত্রেতাযুগে হথ সংপ্রাপ্তে মনোবৈবস্তুবেহন্তরে।' অর্থাৎ পূরাকালে স্বয়ম্ভুর মন্বন্তরে যখন সত্যযুগ অতিক্রান্ত হলো এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হয়। এবং মানুষগণ ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে যায় তখন ব্রহ্মার আদেশে এ শাস্ত্রের সৃষ্টি।

ভরত মুনি নাট্য উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বলেন যে, যারা অধর্মে প্রবৃত্ত তাদেরকে ধর্ম, যারা কামাসক্ত, যারা উদ্ধত তাদেরকে শাসন, যারা বিনীত তাদের মধ্যে আত্মসংযম, নিস্তেজ ব্যক্তিকে সাহস, বীর ও মানী ব্যক্তিকে উৎসাহ, মূর্খদের জ্ঞান এবং পণ্ডিতদের প্রজ্ঞা দেওয়াই হবে নাট্যের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে আরো উল্লেখ—সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিলাস, দুঃখার্তদের স্থৈর্য, অর্থোপজীবীদের অর্থ এবং উদ্বিগ্ন চিত্ত ব্যক্তিদেরকে ধৈর্য সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া নাট্যের কাজ। নাট্য হবে বিবিধ ভাবযুক্ত, নানা অবস্থার ও মানুষের কর্মের অনুকৃতিমূলক, উত্তম, মধ্যম ও অর্ধম লোকের কর্মাশ্রিত, মঙ্গলকরণ, উপদেশাত্মক। পরিবেশিত থাকবে ধৈর্য, ক্রীড়া ও সুখাদিকারক। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে ধর্ম-সত্য-কল্যাণ-আনন্দের উপায় হিসেবে নাট্যকে চিহ্নিত করেছেন বলে ইতিহাস বিকৃতি হয়- এমন প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প নির্মাণ সঠিক নয়। ভরত মুনি নাট্য বিষয়, রীতিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

সাহিত্যে প্রতারণার প্রবণতা শিল্প-সৌন্দর্য ও নৈতিকতাকে ক্ষুণ্ন করে। প্রতারণা নানা প্রকার, নানা রূপ-রীতির হতে পারে। প্লেটো তার রিপাবলিকের দশম পুস্তকে কবি-নাট্যকাররা সত্যকে মিথ্যায় কিংবা মিথ্যাকে ভাববাদী মায়ায় সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে বিভ্রান্ত করতে পারেন বলে আদর্শ রাষ্ট্রে কবি-নাট্যকারদের পরিত্যাজ্য বলে মনে করেছেন। প্লেটো বেখেয়ালি কল্পনার

আধিক্যের চেয়ে জ্ঞান-সত্যদর্শনের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য ভারতবর্ষের প্রাচীন কবি কালিদাসের অধিক কল্পনা প্রবণতার মধ্যেও জীবনের সত্য ও সৌন্দর্য ভাষার গাঁথুনিতে অনবদ্যভাবে ফুটে ওঠেছে। কিন্তু কালিদাস সত্য বিকৃতের পথে হাঁটেননি।

গ্রিসের অ্যারিস্টটল মানুষ, সমাজ, জীবন ও সভ্যতার শৈল্পিক অনুকরণকে প্রধান মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, যা ঘটেছে ইতিহাস তার বর্ণনা দেয় আর শিল্প যা ঘটতে পারত তার অনুভব জানায়। যা ঘটতে পারত বলতে মিথ্যা ইতিহাস তৈরি কথা বোঝাননি। বরং ইতিহাসের ভেতরের শৃঙ্খলা, নতুন আবিষ্কার, নতুন ব্যাখ্যা, অনুভবের কাল্পনিক বাস্তবতা চেয়েছেন। ইতিহাস বা সত্য বিকৃতি কুৎসিত কাজ। অধুনা দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন মানে ইতিহাসকে বিকৃতি করা নয়; মূল সত্যকে স্বীকার করে তার উপকরণ নিয়ে নতুন আরেক শিল্প-কল্পনার সৌধ নির্মাণ। ভারতের দণ্ডী, ভামহ প্রমুখের মতে, শিল্পের কাজ সৌন্দর্য সৃষ্টি হলেও সত্য-কল্যাণ-আনন্দ প্রধান। গ্রিক সামাজ্যের পতনের পর লুঙ্গিনুস শিল্পের প্রধান গুণ হিসেবে মানুষের চেতনার বিকাশের উঁচুতর অবস্থা হিসেবে লাবলিমিটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হোরেসও মানুষের আত্মিক বিকাশ ও ভাষার সমুন্নতিকে বড় করে দেখেছেন। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের সাহিত্য শিল্পকে কলাকৈবল্যবাদী হিসেবে সমর্থন করলেও মানবকল্যাণমুখী আদর্শকেই বড় করে দেখেছেন। ধনের জন্য ধন কিংবা বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান কী হতে পারে কখনো! তাই চেনিসেভস্কি শিল্পকে মানুষের জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত বলে মনেকরেন। অন্যদিকে দার্শনিক হেগেল মানুষের পরমভাব প্রকাশের ধাপ হিসেবে শিল্পকে অনুভবের বিষয় বলে মনে করতেন। সে জন্য শিল্পের উদ্দেশ্য মহৎতর হওয়া আবশ্যক বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মার্কসবাদী শিল্পতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, শিল্প-সাহিত্য সমাজ চেতনার একটি রূপ। যে সমাজ অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রাচীন বাংলায় ন্যায়শাস্ত্রের যে বিকাশ ঘটেছিল তা নৈতিকবোধের দীক্ষাই দেয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে সাহিত্য-শিল্প সুন্দরের ধারণা ব্যক্তিনিরপেক্ষ। নীতিজ্ঞানী মানুষ নৈতিকতাকেই সুন্দর বলে মনে করে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুন্দর সম্পর্কে কয়েকটি ট্যাগ লাইন দিয়েছেন—১. যা সুখদ তাই সুন্দর, ২. কাজের বলেই তা সুন্দর, ৩. অপরিমিত বলেই তা সুন্দর, ৪. সুশৃঙ্খল বলেই তা সুন্দর, ৫. উদ্দেশ্য ও উপায় এই দুয়ের সংগতি

আছে বলেই তা সুন্দর, ৬. সুসংহত বলেই তা সুন্দর, ৭. বিচিত্র-অবিচিত্র সম বিষয় দুই দিক দিয়েই তা সুন্দর।

বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নাট শ মনে করতেন, সাহিত্য শিল্পের উদ্দেশ্য হবে মহৎ ও মানবতার কল্যাণমুখী। কারণ শিল্পের যেমন সত্যকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা আছে তেমনি মিথ্যাকেও ফুটিয়ে তুলতে পারে। তাই মিথ্যাচারের মাধ্যমে পাঠকের মন হতে পারে বিকৃত ও বিপথগামী। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টল সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও সমাজের অগ্রগতি সাধনের ধারণাকে বড় করে তোলেন। শিল্প যেহেতু অনুভূতি সাপেক্ষ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ তাই শিল্পসমালোচনাকেও অপ্রাসঙ্গিক ও নিস্প্রয়োজন মনে করতেন তিনি। তবে শিল্পে প্রতারণাকে কখনো স্থান দেননি। বিশ্বখ্যাত দার্শনিক-সাহিত্যিক জ্যঁ পল সার্ত্রে শিল্পে আনন্দের অন্বেষণ ও সৌন্দর্যচেতনাকে জীবনের সত্য অনুভবের পন্থা হিসেবে ভেবেছেন বলে জীবনসত্যই মুখ্য। বেনেদত্ত ক্রোচে সাহিত্যশিল্পের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বাহ্যিক রূপগত দিকের চেয়ে উৎপাদিত মানসিক ক্রিয়া বা স্বজ্ঞামূলক বা ইনটুইশনাল অনুভবকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নিটশে নান্দনিক অস্তিত্ববাদের দিকে হেঁটেছেন। ইউরোপে স্লানিস্লাভস্কি মনোবৈজ্ঞানিক ধারায় হলেও জীবনের সত্যকেই অবশ্যম্ভাবী মনে করেছেন। আর ব্রেখট অলীক কল্পনার মোহ ভেঙে মানুষকে দাঁড় করিয়েছেন জীবনসত্যে। নাটক দেখার ইলিউশনকে পুরো ভেঙে দিয়েছেন। আমাদের দেশের পালাকাররা দর্শকের মায়া ভাঙা-গড়ার খেলা করেন। কিন্তু সত্যকে মিথ্যায় কিংবা মিথ্যাকে সত্যতে দাঁড় করাননি কেউ। ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব মার্কসবাদী ধারায় সমস্ত থিয়েটাররীতি হয়ে ওঠেছে মানুষের চারদিকের সত্য বাস্তবতা। এমনকি রাজা-বাদশাহর কাহিনিও হয়ে উঠছে যাপিত জীবনের রূপ-রেখা যৌক্তিকতায়। ব্রেখট যে জাদুমন্ত্রের মায়াজাল ভেঙে দর্শককে সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করাতে চেয়েছেন—সে ধারায় গ্রোটস্কি, পাউলো ফ্রেইর, অগাস্তো বোয়াল পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের কাছাকাছি সত্য উপলব্ধিতে। জন রুলস ন্যায্যতার ধারণাকে সর্বস্তরে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিকল্পনায় যে সৌধ তৈরির কথা বলেন, তাতে আরো জীবনের গভীর সত্য নিহিত। শিল্পসত্য তৈরি করলেও বাস্তবসত্যের মিথ্যা প্রতিরূপ নির্মাণ করে নয়। বরং বাস্তবসত্যকেই প্রধান করে। শিল্প-সাহিত্য জীবন-সমাজ কিংবা সামাজিক রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবে ঠিক, কিন্তু

ইতিহাসের সত্যকে মিথ্যার মায়ায় বাঁধতে নয়। হাজার বছরের শিল্পধারায় যে শিল্পনৈতিকতা, তা যেন এ সময়ে এসে সমকালীন নান্দনিক যৌক্তিক মূল্যবোধে আরো বিকশিত। বাংলাদেশের সংযাত্রায় পালাকাররা ইতিহাসের ঘটনা, সমকালীন নানা বিষয়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বটে কিন্তু কখনোই তা মিথ্যা দিয়ে নয়। বরং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে, নতুন সুন্দরে।

তাহলে সাহিত্য-শিল্পের কাজ কী? নানা জনের নানা মত থাকলেও আর্নস্ট ফিশারের একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ করতে চাই, "শিল্পের কাজ সর্বদা সমগ্র মানুষটিকে ধরে নাড়া নেওয়া। 'আমি'টিকে অন্যের জীবনের সাথে নিজেকে একাত্মবোধে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে, নিজে যা নয় কিন্তু যা হতে সক্ষম তাকে যেভাবে তেরি করার ক্ষেত্রে সমর্থ করে তোলাই শিল্পের কাজ। ...বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে ইতিহাস নির্ধারিত শ্রেণির জন্য শিল্পের আবশ্যকীয় করণীয় তাকে মোহাবিষ্ট করা নয়; এ ক্ষেত্রে শিল্পের কাজ হবে তাকে আলোকপ্রাপ্ত ও উদ্দীপ্ত করা। ...শিল্প এই কারণে আবশ্যকে যে, বিশ্বকে বুঝতে, শিখতে এবং পরিবর্তন করতে মানুষকে সমর্থ হতে হবে। আবার শিল্পের অন্তর্গত সহজাত জাদুগুণের জন্যও শিল্প প্রয়োজন।" মনে রাখতে হবে—শিল্প মানুষকে সুন্দর করে; তাই শিল্প যেন মানুষকে বিভ্রান্ত না করে। শিল্পের পথেই মানুষের মুক্তি সম্ভব।

[প্রবন্ধটি 'নান্দিক' সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত। সম্পাদক : ইসমত শিল্পী]

আবু সাঈদ তুলু

গবেষক, কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষক। নাট্য সমালোচক হিসেবে সমধিক পরিচিত। জন্ম ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জামালপুর জেলায়। পিতা- আলহাজ আব্দুর রহমান মাস্টার ও মাতা-সারা বেগম। তিনি শৈশব থেকেই সাহিত্য-শিল্পের প্রতি অনুরাগী। দীর্ঘদিন ধরে নাটক, শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা প্রবন্ধ লিখে আসছেন। লেখকের মনোভঙ্গিতে ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রাধান্য পায়। লেখক বর্তমানে একটি বেসরকারি কলেজে বাংলা বিষয়ে শিক্ষকতা করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ–লিপির উদ্ভব, ক্রমবিবর্তন ও বাংলা লিপির পরিণত পর্যায় [গবেষণা, ২০০৭], বিপ্রলব্ধ (উপন্যাস, ২০০৮], অনন্তপথের যাত্রী [নাটক, ২০১৪], জলের আয়না [কবিতা, ২০১৫], পাতার বাঁশি [গল্প, ২০১৭], সেলিম আল দীনের সাহিত্য ভাবনা [গবেষণা, ২০১৮], নাট্য ঐতিহ্য ও বাংলাদেশের নাটক [প্রবন্ধ, ২০২০], অনুভূতির খসড়া [কবিতা, ২০২২], বাংলাদেশের সমকালীন থিয়েটার [সমালোচনা প্রবন্ধ, ২০২৩], নাট্য সমালোচনার কথকতা [প্রবন্ধ, ২০২৪], বাংলাদেশের নাটকে বিউপনিবেশায়ন [প্রবন্ধ, ২০২৫]

ই-মেইল : tuluart@yahoo.com

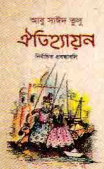

Oitijjayon
by Abu Sayed Tulu
Published by **Ayan Prakashan**
e-mail: ayanprokashhan@gmail.com
web: www.rokomari.com/ayanprokashhan
Call : 01818005219 or 16297

Bdt. 500 US $ 10

978-984-3912-28-2